শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

চরিত-সুধা

অর্থাৎ

শ্রীল শ্রীমদ্ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের

জীবন-চরিত

—ঃ—

চতুর্থ খণ্ড

(পঞ্চম সংস্করণ)

—ঃ—

প্রকাশক ঃ—

শ্রীরামদাস বাবাজী।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

"শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ"।

চৈতন্যাব্দ—৪৯৮

ভিক্ষা—৫.০০ টাকা মাত্র।

॥ মুদ্রক ॥
শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সার্ভিস্ প্রিন্টার্স । ৫৫/৬৪ কালিচরণ ঘোষ রোড । কলিকাতা-৫০

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

নিবেদন

পরম মঙ্গলময়, করুণাসাগর, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-রাধারমণ দেবের করুণায় এবং সাধু-বৈষ্ণবগণের অনুগ্রহে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য **চরিত-সুধার** চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ শেষ হইয়া যাওয়ায় পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রণ করতঃ সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। আশা করি, সহৃদয় মহানুভব পাঠকবর্গ নিজ উদারতাগুণে ভাষার অসংলগ্নতা বা অশুদ্ধি সংশোধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুদেবের পুণ্য **চরিত-সুধা** আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ ও উৎসাহিত করিবেন। অলমিতি।

সন ১৩৯০ সাল,
৪ঠা কার্ত্তিক।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা।

বিনীত
প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

বন্দনা ।

শ্রীগুরুং কৃষ্ণচৈতন্যং নিত্যানন্দং সহানুগম্ ।
শ্রীগোবিন্দং পরানন্দং রাধিকালী-সমাবৃতম্ ॥

—o—

জয় গণপতি, দেবী সরস্বতী,
শঙ্করশঙ্করী আর ।
করি যোড়পাণি, নিবেদন বাণী,
শ্রীচরণে সবাকার ॥
শ্রীগুরু-চরণ, করিয়ে বন্দন,
অযাচিত কৃপাকারী ।
যাঁহার প্রসাদে, সকল বিপদে,
অনায়াসে যাই তরি ॥
তাপ বিনাশন, পাপ বিমোচন,
পরম করুণাময় ।
মোর প্রাণ মন, যেন অনুক্ষণ,
তুয়াপদে রত হয় ॥
জাহ্নবা নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই,
শ্রীবাস অদ্বৈত আদি ।
সহ পরিজন, বন্দি অনুক্ষণ,
ভাব ভরে নিরবধি ॥

সঙ্গে সখীগণ, শ্রীরাধারমণ,
ভানুসুতা শোভে বামে ।
কালিন্দীর কূলে, নীপতরুমূলে,
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গঠামে ॥
জয় জগন্নাথ, শ্রীরামাদি সাথ,
যত দেবদেবীগণে ।
করি প্রণিপাত, কর দৃষ্টিপাত,
অকৃতি অধম জনে ॥
গ্রহ্ অত্যাচারে, তুয়া সেবা তরে,
প্রভু শ্রীরাধারমণ ।
কত দুঃখ ভোগ, কত অনুযোগ,
সহিলেন অনুক্ষণ ॥
করি গ্রহ শান্তি, নাশিয়া অশান্তি,
তুষিলেন জগজনে ।
তাহার আভাস, করিতে প্রকাশ,
বড় সাধ হয় মনে ॥
ছোট বড় যত, গুরু-অনুগত,
সবারে করি প্রণতি ।
না করিহ ঘৃণা, করহ করুণা,
(যেন) গুরুপদে থাকে মতি ॥

—০—

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়			পত্রাঙ্ক
সদলে কলিকাতায় গমন	...	...	১
রায় বাহাদুরের বাগানে অবস্থিতি	...	...	৭
অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি	...	...	১০
গণেশের সর্পাঘাত	...	...	১৩
রায় বাহাদুরের মন্ত্রগ্রহণ	...	...	১৭
কাব্যতীর্থের মন্ত্রপ্রাপ্তি	...	...	২২
কাব্যতীর্থের সংশয়চ্ছেদন	...	...	৩১
সদলে দর্জ্জিপাড়ায় গমন ও অবস্থিতি	...	...	৩৮
শিশিরবাবুর সহিত মিলন	...	...	৪৩
অতীনবাবুর সহিত মিলন	...	...	৪৬
গিরীনবাবুর সহিত মিলন	...	...	৪৮
নবদ্বীপদাদার বিদায়	...	...	৫৪
অমৃতবাবুর কাহিনী	...	...	৬৩
প্রভুপাদ নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামীর দর্শন	...	...	৭০
সদলে শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন	...	...	৭৬
কুঞ্জদাসের জীবনদান	...	...	৭৮
রসকীর্ত্তন শ্রবণ	...	...	৮৩
শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা	...	...	৮৯
কলিকাতার আখড়ায় অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন	...	...	১০৫
ঘটকবাড়ী কীর্ত্তন	...	...	১১৫
পুরী প্রত্যাবর্ত্তন	...	...	১১৯

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়			পত্রাঙ্ক
বিবিধ ঘটনা	...	...	১২৬
গুণসিন্ধু	...	...	১৬৭
ফণীর নবজীবন লাভ	...	...	১৭৮
গণেশের কলেরা	...	...	১৯১
বিশ্বনাথের উদ্ধার	...	...	১৯৪
ললিতাদাসীর পুনর্জ্জন্ম	...	...	২০৩
শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ-জন্মোৎসব	...	...	২১৪
মহাভাবাবেশ বা দিব্যোন্মাদ	...	...	২১৭
কলিকাতা গমন ও কেদারবাবুর বাগানে অবস্থিতি	...	...	২৪৩

চরিত-সুধা

——

চতুর্থ খণ্ড

——

সদলে কলিকাতায় গমন।

দিনের পর দিন যায়, একদিন হালিসহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণযুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানি না পূর্ব্বে কখনও ইঁহাদের উভয়ের পরিচয় ছিল কি না ; কিন্তু সাক্ষাৎ হইবামাত্রই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইলেন। উভয়কে বুকে ধরিয়া উভয় স্তম্ভিত— উভয়ের চোখে জল, অঙ্গে পুলক, মুখে হাসি। সেই মধুময় অপূর্ব্ব সম্মিলন দর্শনে আশ্রমবাসী সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া পরস্পর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উভয়েই উভয়কে দাদা সম্বোধন করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় বলেন, "আপনি একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ; আপনি আমার দাদা, আমি আপনার ভাই।" নিত্যসখা বাবু বলেন, "আপনি একে বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহাতে ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব, আপনার সহিত আমার তুলনাই হয় না ; অতএব আপনি আমাকে ছোট ভাই বুদ্ধি না করিলে আমার মনে দুঃখ

হইবে।" ইত্যাদি নানারূপ কথা বলায় বাবাজী মহাশয় আর কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অগত্যা পরাজয় মানিলেন ; সুতরাং বাবাজী মহাশয় দাদা এবং নিত্যসখাবাবু ছোট ভাই হইলেন। কিন্তু উভয়ের ব্যবহারে কে ছোট কে বড় বুঝা কঠিন— যেন একাত্মা। নিত্যসখাবাবুকে রাধারমণ-কুঞ্জের বৈঠকখানা-ঘরে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু মহাপ্রসাদ পাওয়া এক সঙ্গে না হইলে হয় না।

এইরূপ পরমানন্দে দিন যাইতে লাগিল। একদিন দুই ভাইয়ের পরামর্শ হইল যে একবার সদলবলে বালেশ্বর হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে যাইবেন। পরামর্শ হইতে না হইতেই বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে হঠাৎ আদেশ করিলেন,— "কেবল মাত্র সেবার উপযোগী লোক মঠে রাখিয়া যাহার ইচ্ছা আগামী কল্য আমার সহিত যাইতে পার।" শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইলেন এবং সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরদিবস প্রাতে বাবাজী মহাশয় সদলে নাম করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে গমন করিয়া কিছুক্ষণ মন্দিরে সংকীর্ত্তন করতঃ সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। পথে যাহার সহিত দেখা হইতেছে, তাহার নিকটই বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বেলা অনুমান 'দশটার সময় ঝাঁজপিটা মঠে পঁহুছিলেন। এদিকে সকলেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া সেবার উপযুক্ত যাহাকে যাহাকে রাখা মনোনীত করিলেন, মধুর বাক্যে এবং নানারূপ উপদেশ দ্বারা তাহাদের চিত্ত সান্ত্বনা করতঃ অপরাহ্নে নাম করিতে করিতে ষ্টেশনে রওনা হইয়া যথাসময়ে ট্রেণে উঠিলেন। গাড়ীতে নিত্যসখাবাবুর সহিত পরামর্শ করিলেন যে, এবার একটু স্বাধীনভাবে কোনও স্থানে থাকিতে হইবে ; কারণ কাহারও বাড়ীতে গেলে তাহারা ইচ্ছামত কোনও স্থানে গমনাগমন করিতে দেয় না। ইতিপূর্ব্বে আনন্দ মিত্রের বাড়ী আসিয়াছিলাম। প্রায় মাসাবধি কাল সে আর অন্যত্র যাইতেই দেয় নাই। তাই মনে হয় সহরের বাহিরে কোনও নিরপেক্ষ স্থানে থাকিলে ভাল

হইবে। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। যথাসময়ে যেমন কটক ষ্টেশনে নামিলেন, অমনি কয়েকটী কটকবাসী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা কোথায় থাকা হইবে জিজ্ঞাসা করায় বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। উঁহাদের মধ্যে একটী ভদ্রলোক বলিলেন, "দেখুন, একটী স্থান আছে বটে; কিন্তু সহরে যাতায়াত করিতে একটু দূর হইবে।"

বাবাজী। বাবা! আমি এবার তাহাই চাই; কারণ সাধারণ জায়গায় থাকাই বিশেষ সুখকর বলিয়া বোধ হয়। সে স্থানটী কি তোমাদের জানা আছে?

বাবু। আজ্ঞে স্থানটী নিকটবর্ত্তী। এই শ্মশানমাঠের উপর শ্যাম-বাবুদের একটী খুব বড় পুরাতন বাড়ী আছে। ভূতের বাড়ী বলিয়া প্রবাদ থাকায় উহাতে কেহই বাস করে না; কেবল মাত্র একটী দ্বারবান আছে।

বাবাজীমহাশয় "আচ্ছা চল বাবা! সকলে সেই স্থানেই যাওয়া যাক্!" বলিয়া নাম ধরিলেন। বাবুকয়টী অগ্রে অগ্রে চলিলেন। ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র বাবুকয়টী দ্বারবানকে ডাকিয়া দিলেন। বাবাজীমহাশয়কে দেখিবামাত্র সে যেন কিরূপ হইয়া গেল এবং করযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে কি চাই?" বাবাজীমহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমার বাড়ীতে আমরা অতিথি, একটু স্থান দিতে হইবে।"

দ্বারবান। বাবা! এ ত আপনারই বাড়ী— আমি ত আপনার নিযুক্ত ভৃত্য।

এই বলিয়া সকলকে ভিতরে লইয়া গেল। বড় দোতলা চকমিলান বাড়ী, তবে কোন কোন ঘর ভগ্ন। বাবাজী মহাশয় স্থানটী দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ইঁহার সঙ্গিগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিন চারিখানি গৃহ বাসের উপযোগী করিয়া লইলেন। বাবু কয়েকটী বিশেষ

অনুরোধ করিলেও সে রাত্রে ইঁহারা কিছুই আহার করিলেন না। যথাসময়ে বাবাজী মহাশয়ের আদেশে বাবু কয়টী চলিয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় পরদিবস অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ নিত্যকৃত্য সমাপন-পূর্ব্বক সদলে নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। কটকবাসিগণ বাবাজী মহাশয়ের মুখে নামকীর্ত্তন শুনিয়া অতিশয় আনন্দ সহকারে আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বপরিচিতগণ সকলেই আশা করিতেছেন যে তাঁহাদের মধ্যে কোন না কোন বাড়ীতে অবশ্য ইঁহাদের থাকা হইবে। সুযোগ পাইয়া সঙ্গিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এবার সহরের বাহিরে শ্যামবাবুর কোঠায় বাসা হইয়াছে। ক্রমে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কি যে ঠাকুরের ভোগ হইবে বা সঙ্গিগণের আহার হইবে, কাহারই সে খেয়াল নাই, সকলেই কীর্ত্তনানন্দে বিভোর। ইতিমধ্যে গত রাত্রের বাবুরা প্রায় পঞ্চাশ জনের পরিমিত চা'ল, ডা'ল তরিতরকারী, তৈল, ঘি, এমন কি হাঁড়ী ও কাঠ পর্য্যন্ত মুটের মাথায় দিয়া লইয়া আসিলেন। বাবাজী মহাশয় কেবল কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া বসিয়া আছেন, এই সময় উঁহারা আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক আগ্রহাতিশয্যে ভোগের দ্রব্যসকল যাহাতে বৈষ্ণবদের সেবায় লাগিতে পারে, সেই অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আদেশে সঙ্গিগণ রান্নার যোগাড় করিতে লাগিলেন। ইঁহার আদেশ "যেদিন যে বস্তু উপস্থিত হইবে, সমস্ত ভোগ লাগাইয়া দেওয়া চাই। ভোগান্তে সকলের প্রসাদ গ্রহণের পর যাহা অতিরিক্ত হইবে, দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে বাঁটিয়া দেওয়া হইবে।" সেইরূপই হইতে লাগিল। শ্মশানের উপর নির্জ্জন স্থান আজ আনন্দকানন হইল। এবার স্কুল কলেজের ছেলেরাই অধিক আসিতে লাগিল। সর্ব্বদার তরে দলে দলে ছেলেরা আসিয়া তাহাদের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী প্রশ্ন করিতে লাগিল। ইনিও হাসিমুখে তাহাদের মানসিক সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে

সঙ্গিগণের উপর মুষ্টিভিক্ষার আদেশ দিলেন। ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা পরমানন্দে সেবা চলিতে লাগিল।

কয়েক দিন যায় একদিন শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মদনমোহন দত্ত তাহাদের বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে কয়েকটী সঙ্গিসহ খেলা করিতেছে, এই সময় হঠাৎ একটী বজ্রপাত হইল। সঙ্গী ছেলেদের সামান্য আঘাত লাগিল; কিন্তু মদন একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। শিবনেত্র, দাঁতে দাঁত লাগা এবং গায়ের রং নীলবর্ণ হইয়া গেল। অপর বালকগণ ভীত হইয়া উহার পিতা মাতাকে সংবাদ দিল। তাঁহারা আসিয়া বালকের অবস্থা দর্শনে হতাশ হইলেন। সকলেরই ধারণা বালকের জীবন নাই। বহুলোক সমবেত হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, ভাল ডাক্তার আন, কেহ কেহ বলিতেছেন, কোনও ওঝা আন, আবার কেহ বা বলিতেছেন, ও কি আর বাঁচে! ইত্যাদি সমালোচনার মধ্যে উক্ত প্যারীবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ দুর্গাপ্রসাদ বলিল, "দেখ, তোমরা কেহই কিছু করিও না, আমি একবার দাদার নিকট সংবাদ দিয়া আসি।" বলিয়া দ্রুতগতি একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে বাবাজী মহাশয় উক্ত গাড়ীতে উঠিয়াই তথায় গমন করিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সকলেই শোকাকুল। ইঁহাকে দেখিবামাত্র প্যারীবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে মদনকে ইঁহার চরণে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই নেও বাবা! তোমার বস্তু তোমায় সমর্পণ করিলাম, এখন তোমার যা ইচ্ছা কর।"

বাবাজী মহাশয় নয়ন মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন তিনিই জানেন, কম্পিতকলেবরে মদনকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জয় নিত্যানন্দ রাম বলিয়া এক হুঙ্কার করিলেন। মদনের চৈতন্য হইল,— চোখে জল আসিল — দেহ পূর্ব্ববৎ গৌরবর্ণ হইল। তখন বাবাজী মহাশয় মদনকে বলিলেন, "মা ও বাবাকে প্রণাম কর।" দুর্গাপ্রসাদ উহাকে বাবাজী মহাশয়ের

চরণতলে পড়িতে বলায় সে তাহাই করিল। বাবাজী মহাশয় দয়ার্দ্রহৃদয়ে পুনর্ব্বার উহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। দর্শকবৃন্দ দেখিলেন, যেন ইনি চিরজীবনের মত বালককে আত্মসাৎ করিয়া তাহার মায়াবন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় মায়ের চরণে প্রণাম করিলে বাৎসল্যময়ী মা সন্তানকে কোলে করিয়া নয়নজলে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যাপারে দর্শকবৃন্দ কেহ বা অলৌকিক শক্তি প্রভাব দর্শনে বিস্মিত, কেহ বা বালকের সৌভাগ্য দর্শনে রোদনপরায়ণ, কেহ বা সগোষ্ঠী প্যারীবাবুর অকৃত্রিম দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অত্যন্ত দুঃখের পর আনন্দটা বড়ই মধুর। সকলে যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। উঁহাদের ইচ্ছা বাবাজীমহাশয় সেদিন ঐস্থানেই থাকেন; কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের তাহা মত হইল না। কাজে কাজেই মায়ের অনুরোধে গোবিন্দের কিছু বাল্যভোগ প্রসাদ পাইয়া দুর্গাপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এইরূপ নানাবিধ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়ী লীলা খেলায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন নিত্যসখাবাবুর সহিত কি পরামর্শ হইল। পরদিবস কটক হইতে বালেশ্বর রওনা হইলেন। বালেশ্বরে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র মহাশয়ের বাড়ীতে তিন দিন অবস্থান করিলেন। একদিন নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে রেমুনায় গোপীনাথ জীউর দর্শন করিতে গেলেন। গোপীনাথ জীউর সেবকগণ অতিশয় আগ্রহের সহিত ইঁহাদিগকে সেদিন সেই স্থানে রাখিয়া মহাপ্রসাদ পাওয়াইলেন। ক্রমে অন্যান্য স্থানাদি দর্শন করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। নিত্যসখাবাবু কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ বালেশ্বরে নিজবাড়ীতেই রহিলেন। ইঁহারা যথাসময়ে হাবড়া পঁহুছিয়া সে স্থান হইতে জগন্নাথ ঘাটে গঙ্গা স্নান করতঃ কলুটোলা কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুঞ্জবাবু, পুলিনবাবু প্রভৃতি অনেকদিন পরে বাবাজী মহাশয়কে পাইয়া পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন

হইলেন। কুঞ্জবাবুর মাতাঠাকুরাণী বাবাজী মহাশয়কে বাৎসল্য ভাবে ভালবাসিয়া থাকেন। ইনিও মা'র কাছে গিয়া নানারূপ আব্‌দার করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধান করিতে লাগিলেন।

রায় বাহাদুরের বাগানে অবস্থিতি

বাবাজী মহাশয়ের এ যাত্রায় পুরী হইতে বাহির হইবার সময় হইতেই মনের ভাব যে, কাহারও নিজ বাসায় না থাকিয়া কোন নিরপেক্ষ স্থানে থাকিবেন। তাই আজ কুঞ্জবাবু ও পুলিনবাবুর অত আদর যত্নও ভাল লাগিতেছে না। এক দিন যায়, দুই দিন যায়, তিন দিনের দিন বলিলেন, "পুলিন! বটুমামার বাগানবাড়ী গেলে ভাল হইত না?—আমার মন যেন একটু নিরপেক্ষ স্থান চাহিতেছে।" শুনিয়া পুলিনবাবু একটু সশঙ্কিত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে কোনও রূপ কষ্ট বা অসুবিধা হইতেছে কি?"

বাবাজী। অসুবিধা কিছুই নাই, এ ত আমার নিজ স্থান, তবে একটু নিরপেক্ষ স্থানে থাকিবার বড়ই ইচ্ছা। অতএব তুমি আর কোন আপত্তি না করিয়া আমাদিগকে বটুমামার বাগানে লইয়া চল।

পুলিনবাবু, কুঞ্জবাবুর নিকট বলিয়া ইঁহাদিগকে বাগানবাড়ী লইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় বাগানে গিয়াই নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আজ নির্জ্জন উদ্যান যেন আনন্দকানন হইল।

বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন এবং বটুবাবুর বাগানে আছেন শুনিয়া বহুলোক সমাগত হইতে লাগিল। সর্ব্বদা লোকে লোকারণ্য দেখিয়া একজন বলিল, "আজ্ঞে যে নির্জ্জনের জন্য এখানে আসা হইল, সে নির্জ্জন ত রহিল না!"

বাবাজী। বাবা! আমি নিতাইচাঁদের নিকট নির্জ্জন প্রার্থনা করি না। তিনি যেন আমাকে সর্ব্বদার তরে লোকজনের সঙ্গে রাখেন। লোক কখনই লোকের অনিষ্ট করিতে আসে না। লোক লোকের হিত-

কর। যতই নিত্য নূতন লোকের সমাগম হয়, ততই নিত্য নূতন উপদেশ পাওয়া যায়। আমি নিতাইচাঁদের নিকট কেবল নিরপেক্ষ স্থান চাই; কারণ অন্যাপেক্ষা হইলে হৃদয়ে ভগবৎ-লীলার স্ফূর্ত্তি হওয়া কঠিন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত পন্থায় নির্জ্জন বাসই যে খুব উপযোগী বা উপকারী তাহা নয় তবে নিরপেক্ষ প্রয়োজন। আমিও তাহাই চাই।

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্ণে বরাহনগর নিবাসী কামাখ্যা নাথ দাস বাবাজী এবং এঁড়েদহ নিবাসী বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কামাখ্যাদাস বাবাজী, বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "আজ্ঞে ইঁহার নাম প্রসন্নকুমার রায় বাহাদুর। ইনি একজন লাটসাহেবের বিশেষ প্রিয় পাত্র। ইনি কয়েকদিন হইতে রামদাদার মুখে নামকীর্ত্তন শুনিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং আরও হইবার ইচ্ছা করেন। আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া আজ আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন "আমার পরম সৌভাগ্য যে উঁহাদের ন্যায় ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়াছেন।" প্রসন্নবাবু প্রেম গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, আমি ঘোর পাষণ্ড, আমি এত বৃদ্ধ হইয়াছি, আজ পর্য্যন্ত আমার চৈতন্য হইল না। আমি সম্পূর্ণ বিধর্ম্মী। যখন আপনাদের কৃপায় ধর্ম্ম আছে বলিয়া একটু মনে হইয়াছে, তখন যাহাতে সেইটীর একটু বুদ্ধি হয় তাহা করিতে হইবে।"

বাবাজী। বাবা! পতিতপাবন নিতাইচাঁদ করুণা করিয়া কলির জীবকে অযাচিত ভাবে যেচে যেচে যে নাম প্রেমদান করিয়াছেন, তাহাতে কেহই বাকী থাকিবে না।

প্রসন্ন। বাবা! কে নিতাই, কাহাকে বা প্রেম বলে, কিরূপে বা প্রেম বিতরণ করিলেন, আমি এ সমস্ত কিছুই জানি না। বাল্যকাল হইতে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া সেই জাতীয় আচার ব্যবহার দ্বারা দিন কাটাইয়াছি।

আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। করিলে চলিবে না। আমি একটী বালক হইতেও হীন। আমাকে উদ্ধার করিতে হইলে হাতে ধরিয়া তুলিতে হইবে এবং সেইভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। আমার আর একটী প্রার্থনা অনুগ্রহ করিয়া পূরণ করিতে হইবে।

বাবাজী। বাবা! আমার দ্বারা যতদূর হইতে পারে, আমি অকুণ্ঠিত-ভাবে সে সমস্ত করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রসন্ন। বাবা! এই স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী বাগানবাড়ী আছে। আমার ইচ্ছা ঐ বাগানে আপনি সগণে কিছুদিন বাস করিয়া এ পাষণ্ড বহির্ম্মুখের চিত্তশোধন করেন।

বাবাজী। বাবা! আমার কোনই আপত্তি নাই। নিতাইচাঁদ যে স্থানে রাখিয়া সুখ পান তাতেই আমার সুখ।

প্রসন্ন। তবে আজই সেই স্থানে চলুন।

বাবাজী মহাশয় পুলিনবাবুকে বলিলেন, "দেখ পুলিন! তুমি বাবাজীদিগকে লইয়া সেই বাগানবাড়ী যাইবে। আমি ইঁহার সঙ্গেই চলিলাম।" পুলিনবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।" বলিয়া সকলকে বলায় তাহারাও সকলে প্রস্তুত হইল। বাবাজী মহাশয় নাম ধরিলেন, আর সকলে খোল করতাল যোগে সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতে করিতে রায় বাহাদুরের বাগানবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানের শোভা দর্শনে বাবাজী মহাশয় পরম প্রীত হইলেন। বাগানটী অতি বৃহৎ ও মনোরম। বাগানের পশ্চিম দিকে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা, দক্ষিণ পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী; রান্নাবাড়ী পৃথক। নানাবিধ সুগন্ধি ফুলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। যে ঘরে ইঁহার থাকিবার কথা হইল, সে ঘরের মেজে কাঠের পাটাতন করা। কর্ম্মচারিগণ বলিল, "আজ্ঞে এই ঘরে ভাল ভাল নর্ত্তকী মেমগণ নৃত্য করিয়াছে। আজ ভগবদনুগ্রহে সেই ঘরে হরিনাম করিয়া সাধু বৈষ্ণবগণ নৃত্য করিবেন। এই বাগানে বাঙ্গালী আসিতে ভীত

হইত, সর্ব্বদারতরে সাহেবগণ হাওয়া খাইতে আসিত।”

প্রসন্নবাবু সমস্ত বাবাজীগণকে বলিলেন, “বাবা! এ বাগান আপনাদের, ফুলফল যাহার যাহা দরকার অকাতরে ব্যবহার করিবেন, ইহাতে কোনরূপ সঙ্কোচ করিবেন না।” মালীগণকে বলিয়া দিলেন, “দেখ, এই বাবাজী মহাশয় যখন যাহা হুকুম করিবেন, অবিচারে পালন করিবে। যদি কাহারও কোনরূপ ত্রুটি হয় তবে সেই দিন তাহাকে বরখাস্ত করিব।” ইঁহাদেয় আবশ্যকীয় দ্রব্য আনিয়া দিবার জন্য একটী সরকার নিযুক্ত করিয়া তাহাকে বলিলেন, “ইঁহাদের কোনওরূপ কষ্ট না হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে এবং ইঁহারা যখন যাহা চাহিবেন আনিয়া দিবে। টাকার জন্য কোনও চিন্তা করিবে না।” ইত্যাদি ভাবে সকলকে বলিয়া দিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, “আজ্ঞে— বাগান আপনার এবং আমিও আপনার। কৃপা করিয়া যেন যখন যাহা প্রয়োজন একবার হুকুম করা হয়; কারণ আমি সর্ব্বদা নিকটে থাকিতে পারিব না। ইহারা চাকর, ইহাদের না বলিলে কিছুই করিবে না। আর আপনারা যদি না বলেন তবে আমি বড়ই দুঃখ পাইব।” বাবাজী মহাশয় বলিলেন, “বাবা! কোনই চিন্তা নাই, যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, নিতাইর ইচ্ছায় ইহাদিগকে বলা যাইবে।” এই ভাবে নানারূপ ইষ্টালাপে অনেক সময় কাটিয়া গেল। বাবাজী মহাশয়ের নিকট আজ্ঞা লইয়া প্রসন্নবাবু বাড়ী চলিয়া গেলেন। এদিকে ভোগ রান্না হইলে ঠাকুরের ভোগ দিয়া সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণানন্তর বিশ্রাম করিলেন।

অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি

পরদিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া বাবাজী মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক একজন মালীকে ডাকিয়া বলিলেন, “বাবা! এ স্থান হইতে গঙ্গা কত দূর?”

মালী। আজ্ঞে প্রায় একমাইল হইবে। গঙ্গাস্নানে যাইবার ইচ্ছা

হইলে চলুন, আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।

বাবাজী মহাশয় তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া নাম করিতে করিতে রওনা হইলে মালী অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করাইয়া চলিল। গঙ্গার ঘাটে পঁহুছিবামাত্র মালীকে বিদায় দিয়া কিছুক্ষণ তীরে উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন করতঃ স্নান করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সে স্থানে কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তন করতঃ যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্নে রামদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ রাম! প্রত্যহ রাত্রি চারিটার সময় সকলকে সঙ্গে লইয়া "নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর" এই পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করতঃ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তিলক আহ্নিক শেষ করিয়া "নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ" কীর্ত্তন করিবে। আবার সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা-আরতি হইতে অভিসার-মিলন কীর্ত্তন করিবে। এই ত্রিসন্ধ্যা সংকীর্ত্তন বাদ না হয়।" রামদাদাও ইঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রি অনুমান দুইটা এমন সময় বাবাজী মহাশয় রামদাদাকে এবং অন্যান্য সকলকে ডাকিয়া গঙ্গাস্নানে পাঠাইয়া দিলেন। ইঁহারাও "নিতাই-গৌরাঙ্গ" পদ ধরিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে যাইয়া অনেকে বলিতে লাগিলেন, "বোধ হয় রাত্র আছে, কারণ চারিদিক নিস্তব্ধ, লোকের গতাগতি নাই, নৌকায় মাঝিগণ বিভোর ভাবে নিদ্রা যাইতেছে। পক্ষিগণ নীরব, চারিদিকের মৃদু মন্দ পবন নিশার গভীরতার পরিচয় দিতেছে। বাবাজী মহাশয় এতরাত্রে আমাদিগকে এই গঙ্গার তীরে পাঠাইয়া দিলেন! আমরা এখন বসিয়াই বা কি করি, এত রাত্রে স্নান করিয়াই বা কি করি!" তখন অনুভবী রামদাদা বলিলেন, "দেখ ভাই! যখন মঙ্গলময় গুরুদেব আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার কোনরূপ অভিপ্রায় আছে। এস আমরা এইখানে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করি।" বলিয়া কীর্ত্তন

আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইতে লাগিল। রামদাদার কণ্ঠে যেন অমৃত বর্ষণ হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব আখর স্ফূর্ত্তি! একমাত্র "জয় শচীনন্দন, জগজীব তারণ, কলি কলুষনাশন অবতার" এই পদে চারঘণ্টা কাটিয়া গেল। তবুও যেন ফুরায় না। বেলা সাতটার সময় স্নান করিয়া বাগানে পঁহুছিবামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "রাম! আজ অনেক রাত্র থাকিতে তোমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছি, বড়ই কষ্ট হইয়াছে?" রামদাদা প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আজ যত আনন্দ পাইয়াছি বা প্রত্যক্ষ কৃপা অনুভব করিয়াছি, জীবনে এরূপ কখনও করি নাই। সংকীর্ত্তনে আমি যে সমস্ত আখর কখনও শুনি নাই বা ধারণায় আনিতে পারি নাই, আজ আপনার কৃপায় সেই সমস্ত স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। একমাত্র "জয় শচীনন্দন" এই পদে চারঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। সংকীর্ত্তনের পর আমার বোধ হইল যেন আধঘণ্টা সময় হইয়াছে কি না সন্দেহ।"

বাবাজী। মঙ্গলময় যখন যাহা করেন মঙ্গলের জন্য, ইহা অনুভব করিও। মা গঙ্গা কৃপা করিয়া যে সমস্ত অমূল্য রত্ন দিয়াছেন, হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখ; নিজে সুখী হইবে ও অপরকে সুখী করিতে পারিবে। একদিন আমাকে শুনাইবে না?

রাম। আপনারই দত্ত বস্তু আপনি যখন ইচ্ছা করিবেন, স্ফূর্ত্তি করাইয়া শুনিলে আমরা কৃতার্থ। যন্ত্র নিশ্চল নিষ্ক্রিয়, যন্ত্রী যে সুরে যে সময় যে রাগিণী বাজাইতে ইচ্ছা করেন, বাজাইলে সাধারণের আনন্দপ্রদ এবং যন্ত্রের সৌভাগ্য জানিতে হইবে।

এইরূপে দুই তিন দিন যায় একদিন রামদাদাকে প্রভাতী সুরে "নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর।" এই পদটী গান করিতে বলিলেন। রামদাদাও প্রাণে প্রাণে শ্রীগুরুদেবকে জানাইয়া কীর্ত্তন ধরিলেন। ছয়টা হইতে অনুমান দশটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। প্রেমের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় ভাবে বিভোর হইয়া

রামদাদাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদানে ধন্য করিলেন এবং আদেশ করিলেন যে প্রত্যহ প্রভাতে এই কীর্ত্তন করা চাই। প্রসন্নবাবু প্রভৃতি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রভাতে এই কীর্ত্তন হইতে লাগিল।

গণেশের সর্পাঘাত

রায় বাহাদুর প্রসন্নবাবুর বাগানবাড়ীতে এইরূপ পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধারমণের চিত্রপট সেবা রহিয়াছে। রান্নাবাড়ী হইতে বসতবাড়ী পৃথক। কাজেই ভোগ রান্না হইলে ঠাকুরের উপযোগী পারশ ঠাকুরের সম্মুখে আনা হয়। অবশিষ্ট সেই রান্নাবাড়ীতে ভোগ হইয়া পঙ্গত হয়। একদিন সন্ধ্যার সময় খিদিরপুর হইতে নানারূপ ভোগের দ্রব্য আসিয়াছে। তন্মধ্যে অপূর্ব্ব ক্ষীরের ছাঁচ আসিয়াছে। কোনও ছাঁচে মহামন্ত্র, কোনও ছাঁচে "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" নাম, কোনও ছাঁচে বা অন্যান্য লতা পাতা প্রভৃতি চিত্র আঁকা হইয়াছে। সন্ধ্যা-আরতির পর সেই সমস্ত ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইল। আরতিকীর্ত্তনান্তে বাবাজী মহাশয় নিজহস্তে একখানি ছুরি লইয়া ঐ সমস্ত ছাঁচ এক এক খানি বেশ কায়দা করিয়া অর্থাৎ নাম রাখিয়া রাখিয়া এক একজনকে প্রসাদ দিতে লাগিলেন। রান্নাবাড়ীতে যাহারা রহিয়াছে, তাহাদিগকেও ডাকা হইল। গণেশচন্দ্র সাউ নামক অনুমান ষোল সতের বৎসর বয়স্ক একটী উড়িষ্যাবাসী ময়রার ছেলে রান্নাবাড়ী হইতে দ্রুতপদে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিতেছিল, হঠাৎ একটী ভয়ানক বিষধর সর্প উহার দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল শিরাটীর উপর দংশন করিল। ছেলেটী অতি ব্যাকুলভাবে সেই স্থান হইতে সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলিলে, তাহারা সকলেই উহাকে ধরাধরি করিয়া বৈঠকখানা ঘরে লইয়া আসিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈঠকখানা ঘরটী কাঠের পাটাতন করা এবং অতি বৃহৎ ঘর।

সম্প্রতি প্রসন্নবাবুর মতি ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার দরুণ ঐ গৃহখানি নানারূপ দেবদেবীর চিত্রপট দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ, নিতাইগৌর, পঞ্চতত্ত্ব এবং মহাদেব প্রভৃতি এক একখানি চিত্রপট এতই মনোমুগ্ধকর যে, একবার দেখিলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। গণেশকে ঐ স্থানে শয়ন করাইয়া একজন গিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিল, "আজ্ঞে গণেশের পায়ে একটী সাপে কেটেছে, সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া তথায় গমন করতঃ যাহা দেখিলেন, তাহা অতি হৃদয়-বিদারক। গণেশের হস্তপদের গ্রন্থিসকল শ্লথ। যদিও ছেলেটী শ্যামবর্ণ কিন্তু নীল রং হইয়া গিয়াছে। প্রায় ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা অবধৌত জ্ঞানানন্দ স্বামীর শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও গোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে নাম করিতে বলিয়া কৃষ্ণানন্দ স্বামিজীকে বলিলেন, "দেখ ভায়া! তুমি এই ছেলেটীকে দাঁড় করাইয়া সংকীর্ত্তনের মধ্যস্থলে লইয়া যাও ত!" তিনি ছেলেটীকে উঠাইতে গিয়া দেখেন, উহার সর্ব্বশরীর অসাড় এবং বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, হস্তপদের সন্ধি-সকল শ্লথ। তখন তিনি অতি কাতরভাবে অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা! ইহার যে প্রাণ নাই, শরীর সমস্ত হিম হইয়া গিয়াছে।" বাবাজী মহাশয় একটু রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমার কার্য্য তুমি কর না ভাই! বিচারকর্ত্তা নিতাইচাঁদ যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।" কৃষ্ণানন্দ স্বামিজী অগত্যা ছেলেটীকে অতিকষ্টে উঠাইয়া উহার মস্তকটী নিজ স্কন্ধদেশে স্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে বক্ষে ধারণ করতঃ নামের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নবদ্বীপ দাদা সঙ্গিগণ সহ উন্মত্তভাবে নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় ঘরের দরজার সার্সিগুলি সমস্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে সংকীর্ত্তনধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান অধিকার করিল। প্রসন্নবাবু নিজ বাড়ী হইতে নামের ধ্বনি শুনিয়া দ্রুতপদে সেই স্থানে আসিলেন; কিন্তু

ঘরের মধ্যে প্রবেশের শক্তি নাই ; কারণ দরজা বন্ধ। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলেই বিভোর—কাহারই দেহস্মৃতি নাই। স্বামিজী ছেলেটীকে আর দাঁড় করিয়া রাখিতে না পারায় অগত্যা শয়ন করাইয়া দিলেন এবং নিজে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনমণ্ডলী এতই দ্রুতগতি পরিভ্রমণ করিতেছে যে বিশেষ নিপুণভাবে লক্ষ্য না করিলে ব্যক্তিগত লক্ষ্য করা সুকঠিন। প্রায় একঘণ্টা এইরূপ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় চমকিত হইয়া বাম পদে গণেশের মস্তকোপরি সজোরে এক পদাঘাত করিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ইঁহার পাদস্পর্শমাত্র গণেশের হস্তপদের সন্ধিসকল দৃঢ় হইল। জিহ্বা যথাস্থানে প্রবেশ করিল, গায়ের বর্ণ পূর্ব্ববৎ হইল কিন্তু চৈতন্য হইল না। অনুমান দশমিনিট পরে বাবাজী মহাশয় আবার পূর্ব্ববৎ পদাঘাত করিলেন। এবার গণেশ চক্ষু মেলিয়া ইতস্ততঃ তাকাইতে লাগিল। তাহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে মনে হইতে লাগিল যেন সে কোন অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন স্পর্শ পাইয়াছিল, ব্যাকুল ভাবে তাহারই অন্বেষণ করিতেছে। সংকীর্ত্তন পূর্ব্ববৎই চলিতেছে। বাবাজী মহাশয় উহাকে বলিলেন, "ঐ যে পঞ্চতত্ত্ব রহিয়াছেন, উঁহারা তোমার রক্ষাকর্ত্তা, উঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর, অভীষ্ট লাভ হইবে।" সে কথা কে শোনে? গণেশ যেমন বাবাজী মহাশয়কে দেখিল, অমনি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ইঁহার দুইখানি চরণ জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! আমার উদ্ধারকর্ত্তা ত আপনি, আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, আপনি আমায় সেই বিকটাকার দুইটী লোকের হাত হইতে ছাড়াইয়া আনিলেন। তাহাদের মূর্ত্তি মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। প্রভো! আমি ঘোর পাষণ্ড, আপনি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই। আমায় চরণ ছাড়া করিবেন না।" বলিয়া ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। উহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে উপস্থিত সকলেই

অতিশয় ব্যাকুলভাবে উচ্চকণ্ঠে 'হা নিতাই' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের রোল বন্ধ হইয়া কেবল কান্নার রোল শুনা যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে একজন প্রসন্নবাবুর আর্ত্তি দেখিয়া একটী দরজা খুলিয়া দিলে প্রসন্নবাবু এবং আগন্তুক লোকসকল প্রাণ ভরিয়া এই বিস্ময়জনক ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! হাতীর বোঝা পিপীলিকার উপরে কেন? পরম দয়াল করুণাময় নিতাইচাঁদ কাহারও দুঃখ দেখিতে পারেন না। অন্যান্য যুগে ডাকিবার বা বলিবার অপেক্ষা ছিল। ধন্য কলিযুগে পরম দয়াল প্রভু আমার অযাচিত ভাবে কৃপা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাকে ভজি চাই নাই ভজি, তিনি পরম দয়াল প্রভু, এইটী বিশ্বাস থাকিলেই হইল।" এইরূপে বাবাজী মহাশয় যতই প্রবোধ দিতেছেন, বালক গণেশচন্দ্র কিছুতেই সে কথা মানিতেছে না। সে বলে, "আমি আপনার ও সমস্ত কথা শুনিতে চাই না। আমার নিতাই গৌর আপনি, আপনার কেহ থাকে থাক্। আপনি আমাকে বলুন, আমায় চরণ ছাড়া করিবেন না!"

বাবাজী। ভয় কি? করুণাময় অবতার।

এই বলিয়া উহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। উপস্থিত সকলেই গণেশের ভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বহুদিন হইতে একটী কামাখ্যাদেশবাসী জটাধারী ব্রাহ্মণ ইঁহাদের সঙ্গে আছেন। বাবাজী মহাশয় প্রতিষ্ঠার ভয়ে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! আপনি ত সাপের মন্ত্র জানেন, এই ছেলেটীকে একটু ঝাড়িয়া দিন ত!" বৃদ্ধ আনন্দিতচিত্তে গণেশকে ঝাড়িয়া দিবামাত্র বাবাজী মহাশয় সকলকে বলিলেন, "এই দেখ, বাবার মন্ত্রের বলে ইহার বিষ দূর হইল।" গণেশকে বলিলেন, "ইনি তোমার জীবনদাতা।" প্রসন্নবাবু বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি ত জন্মাবধি অসদাচার, বিধর্ম্মী, ঘোর পাষণ্ড; আমার এমন কি সুকৃতি ছিল যে, আমার সম্পর্কিত

স্থানে আপনার আগমন হইল? আমার ন্যায় হীন জীবের পক্ষে ত আপনার দর্শনই দুর্ল্লভ।

বাবাজী। নিতাই নিতাই বলুন বাবা! আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনারা যাহাই হউন না কেন আমাদের গুরু।

প্রসন্ন। বাবা! ঐ সমস্ত বলিয়া আর আমায় প্রতারণা করিবেন না। আমি ব্রাহ্মণ কি ম্লেচ্ছ সে কথা আমি জানি। আপনার চরণে আমার এই প্রার্থনা যেন আপনি পতিত বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না। বয়স কাটাইয়াছি ভোগ বিলাসাদিতে, এখন সমস্ত বিষয়েই অশক্ত। এতদিন বেশ ছিলাম। ধর্ম্মকর্ম্ম বা পাপ-পুণ্য বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, একথা মনে ধারণা ছিল না। বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে পয়সা উপার্জ্জন করা খাওয়া দাওয়া ও ফূর্ত্তি করা এইমাত্র মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য এই বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখি এতদিন বৃথা কাটাইয়াছি এবং এত জঞ্জালে জড়িত হইয়াছি যে, ইচ্ছা করিলেও পাশ কাটাইতে পারিতেছি না। তাই আপনার চরণে প্রার্থনা করি যেন কৃপা হইতে বঞ্চিত না করেন।

ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলে বাবাজী মহাশয়ের আদেশে প্রসন্ন বাবু বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এদিকে রাত্র অধিক হওয়ায় সকলেই মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

রায় বাহাদুরের মন্ত্রগ্রহণ

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু প্রসন্ন বাবুর আর অন্য কোনও কার্য্য ভাল লাগে না। সর্ব্বদার তরে বাগানে আসিয়া হয়ত বাবাজী মহাশয়ের মুখে দুইটী তত্ত্বকথা শুনা, না হয় সংকীর্ত্তনশ্রবণ এই কাজ॥ হয়ত কোনও দিন নানারূপ গোলাপ ফুলের তোড়া প্রস্তুত হইয়াছে। প্রসন্ন বাবু গড়ের মাঠে যাইবেন। বাড়ী হইতে গাড়ী আসিয়াছে। মালী বলিতেছে, "আজ্ঞে সমস্ত প্রস্তুত, গাড়ীতে উঠুন।" প্রসন্নবাবু বলিলেন, "দেখ, গোলাপ ফুল-

গুলি এই ঠাকুরকে আনিয়া দে, আমার আজ আর যাওয়া হইবে না।” সকলে অবাক্ ! মালী ঝুড়ি ঝুড়ি ফুলের তোড়া আনিতে লাগিল। দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, “এত ফুল কোথায় যাইতেছিল ?”

প্রসন্ন। বাবা! এ সমস্ত গড়ের মাঠে লইয়া গেলে সাহেবরা এবং বাবু ভায়াগণ কিনিয়া নেন।

বাবাজী। আজ যাওয়া হইল না কেন ?

প্রসন্ন। আপনি জানেন। আমার কোথাও যাইতে মন হইতেছে না।

বাবাজী। বাবা! অনেক টাকা ত নষ্ট হইল !

প্রসন্ন। বাবা! টাকা ত জীবনে অনেক উপার্জ্জন হইয়াছে। অভাব ত কিছুই নাই। সে ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; কিন্তু যে বস্তু দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, আর ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না, কৈ সে বস্তুর জন্য ত প্রাণ কাঁদিতেছে না ? যত আত্মীয় স্বজন কেহই ত আমার সে হিসাবের নিকাশ জিজ্ঞাসা করিতেছে না। আমি যে আমার মূলধন পর্য্যন্ত হারাইয়াছি, কৈ তাহার জন্য ত কেহ দুঃখ করিতেছে না ? গুরুদেব ! অনেক হইয়াছে, অনেক জন্ম কাটাইয়াছি, এইবার আমায় কৃপা করুন। আমি বয়সে বৃদ্ধ হইলে কি হইবে ? আমি আচারে পশুতুল্য। আমায় আপনার দীক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আপনি ভিন্ন আমার উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহই নাই। বলুন, আপনি কোন্ সময় আমায় কৃপা করিবেন ?

বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং নানাবিধ আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। অনুরাগের প্রাণ আশ্বাস মানে না। অনুতাপের জ্বালা সহজে মিটিতে চায় না। অভীষ্ট লাভের উৎকণ্ঠা যাহার হৃদয়ে জন্মিয়াছে, সে সেই বস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ প্রবোধ-বাক্যে পরিতৃপ্ত হইতে পারে কি ? আজ প্রসন্নবাবুও

কিছুতেই স্থির হইতেছেন না। কেবলই বলিতেছেন, "গুরো! আর ত সময় নাই, এই মুহূর্ত্তেই যদি জীবনযাত্রা সাঙ্গ হইয়া যায়, তবে ত আর পশুত্ব ঘুচিল না— কর্ম্মফলও টুটিল না! কি হইবে? কোথায় যাইব? প্রভো! আর ত এ নরাধমের আশ্রয়-দাতা কেহই নাই!" বাবাজী মহাশয় এবার নিরুত্তর হইলেন। হৃদয় দ্রবিল— বিধির বাঁধ ভাঙ্গিল। বলিলেন, "বাবা! তোমার যখন ইচ্ছা, নিতাইকে বল। তিনি যদি এ পুতুলের দ্বারা তোমার কোনও উপকার সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, করিবেন।"

প্রসন্ন। আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই। যদি অনুগ্রহ করিলেন, তবে আদেশ করুন, কালই সমস্ত প্রস্তুত করা যাক্।

বাবাজী। ভাল, প্রভুর ইচ্ছা।

প্রসন্ন। আমি ত সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কি কি প্রয়োজন হইবে, সে সমস্ত প্রস্তুত করা ত দরকার! অতএব একটা ফর্দ্দ করিয়া দিলে ভাল হইত না কি?

বাবাজী। বাবা! তোমায় কৃপা করিবেন নিতাই, তাঁহার কি প্রয়োজন হইবে তিনিই জানেন এবং তুমি জান। আমায় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তবে আমি এইমাত্র বুঝি, ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য একমাত্র মনপ্রাণটীই চাই। তবে তাহার আনুকূল্যে যাহা প্রয়োজন, তাহা নিজের কাছে; তাহা অন্য কেহ বলিয়া দিতে পারে না।

প্রসন্নবাবু আর কোনই কথা না বলিয়া হৃষ্টচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের আদেশে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। ইঁহারাও যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই রায় বাহাদুর প্রসন্নবাবু বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া ইঁহাদিগকে উঁহার বাড়ীতে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য বলিয়া গেলেন। বাড়ীতে গিয়া সকলকে সমস্ত যোগাড় করিবার কথা বলিয়া নিজেও গঙ্গাস্নান করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

বেলা অনুমান দশটার সময় বাবাজী মহাশয় সদলে নাম করিতে করিতে প্রসন্নবাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুক্ষণ উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের পর বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে নাম করিতে বলিয়া নিজে প্রসন্নবাবুর নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন। প্রসন্নবাবু নানারূপ পূজাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; সুতরাং সে সমস্ত যথাবিহিতরূপে সম্পন্ন করিয়া প্রসন্নবাবুকে মন্ত্রপ্রদান করিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক ও কম্প হইতে লাগিল। প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "গুরুদেব ! আমার ন্যায় মহা-পাপী পতিত জগতে আর দ্বিতীয় নাই। আমার বিশ্বাস, আমাকে উদ্ধার করা জগাই মাধাই উদ্ধার অপেক্ষা কষ্টকর। প্রভো! এখন এই কৃপা করুন, যেন আবার সেই ঘোর নরকে পতিত না হই। আর যেন আপনার কৃপাপ্রদত্ত বস্তু বিস্মৃত না হই। আবার যেন সেই সমস্ত কদাচার বা অসদালোচনা করিতে প্রবৃত্তি না জন্মে।" বাবাজী মহাশয় প্রেমবিহ্বলভাবে প্রসন্নবাবুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবা! সর্ব্বদা নাম করিবে ; নামভিন্ন কলিযুগে অন্য কোন গতি নাই।"

প্রসন্ন। বাবা! আমি ত সর্ব্বদা অপবিত্র। আমি কি করিয়া নাম করিব ?

বাবাজী। বাবা! নামের নিকট পবিত্র, অপবিত্র, দেশ, কাল, পাত্র, অপাত্র বিচার নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন— "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥" ইত্যাদি। অতএব বাবা! ভালই হউক আর মন্দই হউক, লোহা আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেমন লাল হয় এবং যাবতীয় ময়লা দূর হইয়া যায়, তেমনি যে যে অবস্থা সম্পন্ন হউক না কেন, নামাগ্নিতে প্রবেশ করিবামাত্রই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

এইরূপ নানাবিধ উপদেশবাক্যে প্রসন্নবাবুর মন স্থির করতঃ আবার আসিয়া নামে যোগ দিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইবার পর নাম সমাপ্তি

করিয়া সকলে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। এদিকে অদ্বৈতদাস এবং রাধাবিনোদ দাস এই দুইজনকে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ, তোমরা দুইজন শেষে মহাপ্রসাদ পাইবে। তোমরা একজন গৌরগুণ এবং একজন নিতাইগুণ ধ্বনি দাও। যে যার নিকট পরাস্ত হইবে, সে তাহাকে কাঁধে করিয়া এস্থান হইতে বাগানে লইয়া যাইবে।" উভয়েই উৎসাহ সহকারে ধ্বনি দিতে আরম্ভ করিল। অদ্বৈতদাস গৌরগুণসূচক এবং রাধাবিনোদদাস নিতাইগুণসূচক পদ বলিতে লাগিল। আনন্দময়ের কি মধুময় লীলা! যখন যেটী আরম্ভ করেন, সেইটীতেই যেন আনন্দের পাথার বহিয়া যায়। চারিদিকে লোকসকল উৎকণ্ঠিতভাবে নিতাইগৌরের গুণগান শুনিতেছে। প্রসন্ন বাবু করযোড়ে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অঝোরে ঝুরিতেছেন, আর নিজেকে যেন কোন এক অপ্রাকৃত পথের পথিক মনে করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় দুই এক গ্রাস মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া হাত তুলিলেন। ইঁহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল— মুখে কথা নাই— অঙ্গসকল পুলকিত হইতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে বা কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপভাবে কিছুক্ষণ যায় হঠাৎ যেমন রাধাবিনোদ "নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসা'ল অবনী॥" এই পদ বলিতে লাগিল, অমনি বাবাজী মহাশয় একেবারে অধৈর্য্য হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নিকটস্থ প্রায় পাঁচ সাতখানা পাতার মহাপ্রসাদ সকল ছড়াছড়ি হইয়া পড়িল। ইঁনি সেই মহাপ্রসাদের উপরেই গড়াগড়ি দিতেছেন। সকলেই ব্যতিব্যস্ত— কিরূপে বাবাজী মহাশয়কে স্থির করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। নবদ্বীপদাদা, রাধাবিনোদ এবং অন্যান্য বালক দ্বারা ঐ পদটী পুনঃ পুনঃ বলাইতে লাগিলেন। বেগতিক দেখিয়া অবশেষে খোলকরতালযোগে ঐ পদ গান করিতে লাগিলেন। প্রায় দেড় ঘন্টা পরে বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন। সর্ব্বাঙ্গে মহাপ্রসাদ মাখান। তখন প্রসন্ন বাবু করযোগে বলিলেন, "বাবা! একে ত আমার

ভাগ্যে হয়ই না ; তাহাতে যদিও আজ আরম্ভ হইল, কিন্তু কিছুই খাওয়া হইল না। আমার কি দুর্ভাগ্য ! এখন কি উপায় করা যাইবে ?”

বাবাজী। বাবা ! তোমার পরম সৌভাগ্য, পরম দয়াল নিতাইচাঁদ তোমাদ্বারা আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিলেন এবং দিবেন। কোনই চিন্তা নাই, আমি ত অনেক মহাপ্রসাদ পাইয়াছি। তবে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, বেশ ! পুনর্ব্বার মহাপ্রসাদ আনিতে বল, আমি এবং অন্যান্য যদি কাহারও পাওয়া না হইয়া থাকে সেও পাইবে।

শুনিয়া প্রসন্নবাবু হৃষ্টচিত্তে পূজারীকে মহাপ্রসাদ আনিতে বলিলেন এবং সেই স্থান পরিষ্কার করিবার কথা বলায় বাবাজী মহাশয় বলিলেন, “কোনই প্রয়োজন নাই, এইস্থানেই হইবে।” এই বলিয়া সেই সমস্ত পাতা হইতে মহাপ্রসাদ কুড়াইয়া নিজে পাইতে লাগিলেন। এদিকে পূজারী পরিবেশন করিতে লাগিলে আবার সমস্তে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে নাম করিতে করিতে বাগানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাব্যতীর্থের মন্ত্রপ্রাপ্তি

এইরূপ পরমানন্দে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্ণ আন্দাজ চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনা হইতেছে, এই সময় অনুমান ত্রিশ বৎসর বয়স্ক একটী গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণযুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটীর সুদীর্ঘ নয়ন, উন্নত নাসিকা এবং প্রফুল্ল মুখ-কমল দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। উঁহার নাম দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন। জাতিতে বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণ। ইনি একজন ধর্ম্মপ্রচারক। ইতিপূর্ব্বে একবার শ্রীধামপুরী গিয়াছিলেন, তাই বাবাজী মহাশয়ের সহিত পরিচিত ; সুতরাং দর্শন মাত্রেই বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিশেষ সম্মান-সহকারে নিজপার্শ্বে বসাইয়া নানারূপ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন। তিনিও হাসিমুখে উত্তর দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্প্রতি কি কোনও কার্য্য-উপলক্ষে আসা হইয়াছে, না বেড়াইতে।"

কাব্যতীর্থ। আজ্ঞে "কার্য্য-উপলক্ষেও নহে, বেড়াইতেও নহে।"

বাবাজী। সে কিরূপ? জীবমাত্রই যে কোন কার্য্য করে, তাহার কোন না কোনও উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। বিশেষতঃ আপনারা পণ্ডিত; আপনাদের ত কথাই নাই।

কাব্যতীর্থ। আজ্ঞে যথার্থ কথা। আজ আমার এস্থানে আসিবার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না; কারণ আমি একস্থানে যাইতেছিলাম, সে স্থানে বক্তৃতার আহ্বান আছে। কিন্তু কে যেন অলক্ষিত-ভাবে বলপূর্ব্বক আমাকে এই স্থানে আকর্ষণ করিল। জানি না মঙ্গলময়ের কি অভিপ্রায়!

বাবাজী। বোধ হয় প্রভু আমাদের সংশোধনের জন্যই আপনাকে এস্থানে আনিয়াছেন।

কাব্যতীর্থ। সংশোধনের জন্য আনিয়াছেন একথা ঠিকই, তবে কাহার সংশোধন তিনিই জানেন।

বাবাজী। সে কি কথা! আপনারা বিশুদ্ধ বস্তু, আপনাদের কৃপা-কটাক্ষ হইলে আমাদের ন্যায় শত শত জীব উদ্ধার হইতে পারে।

কাব্যতীর্থ। জীব উদ্ধারের ভারটা প্রভু আপনাদের উপরই দিয়াছেন। আমরা সংসারবদ্ধ জীব, আমরা আবার অপরকে উদ্ধার করিব কিরূপে? স্বয়মসিদ্ধঃ কথমপরান্ সাধয়তি?

বাবাজী। সেটী ত আমাদের কথা, আপনারা নিত্যমুক্ত।

কাব্যতীর্থ। যাক্ ও সব কথায় প্রয়োজন নাই; আমার একটী প্রশ্ন — গুরুপদবাচ্য কে?

বাবাজী। আপনি পণ্ডিত, আপনি ত সমস্তই জানেন; আমাকে

জিজ্ঞাসা করা অতিরিক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন,— আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রবাক্য রহিয়াছে। গুরুতত্ত্ব এবং ভগবত্তত্ত্ব এক।

কাব্যতীর্থ। তবে আর পৃথক গুরু করিবার প্রয়োজন কি?

বাবাজী। আচার্যরূপী যে ভগবান্ এ কথা আপনি কোথায় পাইলেন?

কাব্যতীর্থ। কেন? শাস্ত্রবাক্য রহিয়াছে।

বাবাজী। শাস্ত্রবাক্য আপনি কিরূপে জানিলেন?

কাব্যতীর্থ। লোকপরম্পরায় প্রকাশ।

বাবাজী। তবেই লোকপরম্পরা আপনার গুরু নয় কি? বিশেষতঃ ভাবিয়া দেখুন, জন্মমাত্র ধাত্রী-মারূপে যদি আপনাকে মাতৃস্তন-পান না শিক্ষা দিতেন, আপনি জীবন ধারণ করিতে পারিতেন কি? তৎপর মাতৃরূপে, পিতৃরূপে, ভ্রাতৃ-ভগিনীরূপে প্রতিমুহূর্ত্তে যদি গুরুদেব আপনাকে শিক্ষা না দিতেন, তবে আপনি অন্ধ ও বধির প্রায় হইয়া থাকিতেন না কি? আবার হাত ধরিয়া ক খ শিক্ষা না দিলে আপনি আজ শাস্ত্রশিক্ষা কিরূপে পাইতেন? তাই বলি, প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদের গুরুর প্রয়োজন।

কাব্যতীর্থ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু বলেন কেন? এক গুরু হইলেই ত চলিতে পারে।

বাবাজী। কেবল বৈষ্ণবশাস্ত্রেই বলেন, অন্যশাস্ত্রে বলেন না কি? তন্ত্রমতে গুরু এবং উপগুরু বলিয়া যে বিধান আছে সেও যে কথা, দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুও সেই কথা। দীক্ষাগুরু এক ভিন্ন বহু হইতে পারে না, আর শিক্ষাগুরু অনন্ত। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—একাক্ষরং গুরুং মন্যেত ইত্যাদি।

কাব্যতীর্থ। আচ্ছা যাঁহার নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা হইল, তাঁহাকে যখন গুরু বলিয়া মানিলাম, তখন আবার মন্ত্র নিবার দরকার কি?

বাবাজী। "অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং", "বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"

কাব্যতীর্থ। বেশ কথা! পূর্ব্বমহাজনগণ যে পথে চলিলেন, সেই পথেই ত আমাদের চলিলে হইল! আবার নির্দ্দিষ্ট গুরু করিবার দরকার কি?

বাবাজী। দক্ষ, পরাশর, ব্যাস, নারদ, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু প্রভৃতি সকলেই মহাজন— সকলেরই ত মত পৃথক পৃথক। আপনি কাহার মতে চলিবেন? কাজেই নির্দ্দিষ্ট একজনকে আশ্রয় করা চাই। কর্ণে মন্ত্র-প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য— যাহাতে অপরের শ্রুতিগোচর না হয়। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ কর্ণ সর্ব্বদা পবিত্র। দেহ কোনওরূপ স্পর্শদোষে দুষ্ট হইলেও দক্ষিণ কর্ণ সর্ব্বদা শুচি। দক্ষিণ কর্ণে গঙ্গার বাস। পবিত্র বস্তু রাখিতে হইলে পবিত্র ক্ষেত্র চাই; কাজেই দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র দিবার বিধান করিয়াছেন।

এইরূপ নানা কথোপকথনে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিলেন, "একটু গঙ্গাজল পাওয়া যাইবে কি? কারণ সন্ধ্যা করা প্রয়োজন।" বাবাজী মহাশয় একজনকে আদেশ করিলেন, "ইঁহাকে লইয়া যাও, নির্জ্জন স্থানে আসন করিয়া গঙ্গাজল পঞ্চপাত্র প্রভৃতি দিয়া দাও।" তাহাই হইল। এদিকে সকলে সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের আহারের জন্য লুচি মোহনভোগ ও মিষ্টির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। বাবাজী মহাশয় সেদিন আর কীর্ত্তনে না গিয়া ঘরে বসিয়া আছেন। কাব্যতীর্থ মহাশয় সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া বসিলেন। নানারূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে ললিতাদাসী বলিল, "আজ্ঞে, ভোগ হইয়া গিয়াছে। রাত্রও অধিক হইয়াছে।"

বাবাজী। বেশ ত! আগে পণ্ডিত মহাশয়ের আহারের যোগাড় করিয়া দাও।

ললিতা। উনি কিরূপ আহার করিবেন? আমাদের হাঁতে প্রস্তুত হইলে চলিবে কি?

বাবাজী। তোমাদের কি যোগাড় আছে?

ললিতা। আলাদা করিয়া পুরি মোহনভোগ তৈয়ারী করা হইয়াছে। আর ঘৃতান্ন এবং আলুর ডাল্না ও ভাজা ইত্যাদি আছে।

বাবাজী মহাশয় কাব্যতীর্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, পুরি মোহনভোগ প্রসাদ পাইতে আপত্তি আছে কি?"

কাব্যতীর্থ। আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, আমার কোনই আপত্তি নাই।

শুনিয়া ললিতাদাসী এক পার্শ্বে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের আসন, এক পার্শ্বে বাবাজী মহাশয়ের আসন করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রসাদ আনিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় বসুন।"

কাব্যতীর্থ মহাশয় 'আজ্ঞে হ্যাঁ এই আসছি' বলিয়া যে ঘরে এতক্ষণ সংকীর্ত্তন হইতেছিল, সেই ঘরে গেলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে— ঘরখানি অতীব মনোরম ভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। চারিদিকে নানাবিধ চিত্রপট রহিয়াছে। চিত্রপটগুলি এতই মনোমুগ্ধকর যে, দেখিবামাত্রই মনে হয় যেন কথা বলিবে বলিবে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের মনে কি ভাব উদয় হইল, অন্তর্য্যামী প্রভুই জানেন। পঞ্চতত্ত্ব চিত্রপটখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার নিজকৃত একটী গান ধরিলেন। গানটী এই :—

ওহে দীন দয়াময় বিপদ বারণ দীন দুঃখহারী।
এই অকূল সাগরে আমার নাই অন্য কাণ্ডারী।
বড় ভয় অন্তরে, প'ড়েছে ফাপরে,
তুমি দয়া ক'রে দাও আমারে অভয় পদতরী।

তনু পাপে ভারী, তাই ভয়ে মরি,
দেখে অকাল বাতাস হচ্ছে হুতাশ বুঝি ডুবে মরি ॥
আমার সাধে বাদী, রিপু ছয় জন বাদী,
তাহে পদে পদে বিপদ বাধে সে ভয় মনে করি।
আর ভাবাও না, ভবের কু ভাবনা,
(আমি) ভেবে ভেবে হ'লাম সারা তোমায় পরিহরি ॥

একবার সহজ ভাবে গানটী গাহিলেন, দ্বিতীয়বার আবার অতি বিকল ভাবে গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাবাজীমহাশয় কিন্তু সেই আসনের উপরেই বসিয়া আছেন। কেবল এক একবার চমকিয়া উঠিতেছেন। এদিকে কাব্যতীর্থ মহাশয় ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন, আর গানে নানারূপ আখর দিতেছেন। তাঁহার প্রতি আখরের ভাব এইরূপ যে "প্রভু আমায় এতদিন বৃথা ভবে ঘুরাইয়াছ, আজ গুরুরূপে কৃপা করিয়া হৃদয়ের সংশয় দূর করিয়া দাও।" ইত্যাদি। ক্রমে এতই বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন যে, এক একবার ভূমে গড়াগড়ি দিতেছেন। বাবাজী মহাশয় উঁহার ভাবগতিক দেখিয়া শুনিয়া উঁহাকে স্থির করিবার মানসে একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য সকলে আসিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে দোহারকী করিতেছেন। হঠাৎ তিনি একেবারে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় গিয়া উঁহার বুকের উপর হাত দিলেন। যেমন ইঁহার স্পর্শ পাইলেন, অমনি হুঙ্কার করিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ দুইটি ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উঁহার বুলির মধ্যে কেবল 'গুরো কৃপা করুন, দিন ত গেল, আমি বড়ই অভিমানী' এই কথা। অত্যন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া বাবাজী মহাশয় উঁহাকে উঠাইয়া কোল দিলেন। তবুও স্থির না হইয়া বলিতে লাগিলে, "প্রভো! আমার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আমি আপনার চরণে বিক্রীত হইলাম; আজ হইতে আপনার হইলাম। আপনি যাহা ইচ্ছা করুন।"

বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কান্না, সেই প্রেমবিহ্বলতা, সেই আত্মসমর্পণ দেখিয়া শুনিয়া সকলেই বিহ্বল হইলেন। নবদ্বীপদাদা একেবারে বালকের ন্যায় **"হা নিতাই, হা নিতাই"** বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় পুনর্ব্বার উঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। এক একটি মন্ত্রাত্মক বর্ণ যেমন উঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, অমনি সর্ব্বাঙ্গে পুলক এবং কম্প হইতেছে। অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মন্ত্র প্রদান করিয়া যেমন ছাড়িয়া দিলেন, অমনি তিনি একেবারে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। স্থির নেত্র, নিশ্চল নিস্পন্দ শরীর। ঠিক যেন দারুমূর্ত্তির ন্যায় ভূমিতে পতিত। এদিকে বাবাজী মহাশয়ও ভাবাবিষ্ট; কাজেই সকলে ধরাধরি করিয়া ইঁহাকে বারান্দায় লইয়া গেলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট ভিতরে পাঁচ সাত জন নাম করিতেছে, অপর সকলে বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিয়া নাম করিতেছে। বাবাজী মহাশয়ের শরীরে যখন কম্প হইতেছে, তখন কাহার সাধ্য ইঁহাকে ধরিয়া রাখে। দাঁতগুলি এরূপভাবে কাঁপিতেছে যে, সঙ্গিগণ মনে করিতেছেন, এই মুহূর্ত্তে সমস্ত দাঁত নীচে খসিয়া পড়িবে। অঙ্গে যখন পুলক হইতেছে, তখন মনে হয় যেন শিমুল বৃক্ষ বসিয়া আছে। মুদ্রিত-নেত্রে গদগদকণ্ঠে বিকম্পিত স্বরে "গোপী গোপী" এই শব্দ প্রায় পাঁচ সাত মিনিট বসিয়া "আমি গোপী আমি গোপী" এইরূপ বলিতে লাগিলেন। কিছুতেই কম্প নিবারণ হয় না, বা স্থিরতা লাভ করিতেছেন না। সকলেই বড় চিন্তিত। রাত্রও অধিক হইতে চলিল দেখিয়া ললিতাদাসী কাঁদিতে কাঁদিতে নবদ্বীপদাদাকে বলিলেন, "দাদা! এইবার বাবাজী মহাশয়কে আপনি স্থির করিয়া দিন। আর কিছুক্ষণ এইরূপভাবে থাকিলে দাঁতগুলি পড়িয়া যাইবে।" তখন সকলের ব্যাকুলতা দেখিয়া নবদ্বীপ দাদা নয়ন মুদ্রিত করতঃ ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া যেমন বাবাজী মহাশয়ের পিঠের উপর হাত দিলেন, অমনি বাবাজী মহাশয় **"জয় নিতাই, জয় নিতাই"**

বলিয়া যেন চকিতের ন্যায় কোথায় আসিয়াছেন, এতক্ষণ কি ব্যাপার হইল এই সমস্ত ভাবিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। এদিকে নবদ্বীপদাদা ঘরের ভিতরে গিয়া দেখেন কাব্যতীর্থ মহাশয় তেমনি ভাবেই রহিয়াছেন। চারিদিকে নাম হইতেছে; কিন্তু উঁহার দেহ নিশ্চল নিস্পন্দভাবেই অবস্থিত। তখন একজনকে বলিলেন; "দাদাকে একবার ডাকিয়া দাও ত!" সেও বাবাজী মহাশয়কে ডাকিয়া আনিল। ইনি আসিবামাত্র নবদ্বীপদাদা ইঁহার দক্ষিণ চরণখানি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বুকের উপর দিয়া দিলেন। চরণ স্পর্শমাত্র উঁহার দেহ স্পন্দিত হইল—চোখে জল আসিল। চরণ ধারণপূর্ব্বক নানারূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় তখন উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদানে সুস্থ করিলেন। তখন নবদ্বীপদাদা বলিলেন, "রাত্র অধিক হইয়াছে, মহাপ্রসাদ পাইয়া পরে অন্য কথাবার্ত্তা হইবে।"

কাব্যতীর্থ। ভাই! প্রসাদস্ত প্রসন্নতা। তোমরা শ্রীগুরুদেবের সেই মহাপ্রসাদ বহুদিন হইতে পাইয়া সেই মহাপ্রসাদের মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছ। তোমরা পরম সৌভাগ্যবান্। তোমাদের কৃপায় আজ আমি গুরুদেবের মহাপ্রসাদ পাইলাম। দেখিও যেন চিরদিন এইরূপ কৃপা থাকে। আমি ত ঘোর অভিমানী, আমি ত পর মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যাইব; কিন্তু তোমরা যেন ভুলিও না, এই প্রার্থনা।

এইরূপ বলিতে বলিতে মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য গমন করিলেন। পূর্ব্বেই দুই জনের জন্য পৃথক পৃথক স্থান করিয়া রাখা হইয়াছিল। যথানির্দ্দিষ্টস্থানে উভয়ে উপবেশন করিলেন। তখন কাব্যতীর্থ মহাশয় কাতরস্বরে বলিলেন, "গুরুদেব! আমাকে ঐ প্রসাদে বঞ্চিত করিলেন কেন?"

বাবাজী। এটা অন্নমহাপ্রসাদ, আপনি ব্রাহ্মণ, তাই আপনাকে দিতে সাহস হয় নাই।

কাব্যতীর্থ। তাহা হইলে এখন পর্য্যন্তও আমাকে আপনি অঙ্গীকার

করেন নাই? আরও কি আমাকে জাতিকুলের গৌরব দিয়া ভুলাইতে চান?

বাবাজী। আমি আর কি বলিব? আপনার বিশ্বাস।

এই বলিয়া পাতা হইতে ঘৃতান্ন এবং অন্যান্য তরকারী প্রভৃতি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তুলিয়া দিলেন। উভয়েই পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস প্রাতে উঠিয়া যেমন কাব্যতীর্থ মহাশয় বিদায় লইতে গিয়াছেন, অমনি বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখুন, আপনাকে নিতাই কৃপা করিয়াছেন, কিন্তু আমার একটী অনুরোধ এই যে, আপাতত এই ঘটনাটী প্রকাশ না করিয়া একটু গোপনে রাখা ভাল।" কাব্যতীর্থ মহাশয় 'যে আজ্ঞা' বলিয়া শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। ললিতা-দাসী বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে পণ্ডিত মহাশয়কে এমন সৌভাগ্যের কথা গোপন করিতে বলা হইল কেন? এদিকে আপনি বলেন, কপটতাই পাপের কারণ। তবে আবার উঁহাকে ঐরূপ উপদেশ দেওয়া হইল কেন?"

বাবাজী। কেন, এ কথার উত্তর আর তোমাকে আমি কি বুঝাইব? রাত্রে উঁহার মনে মনে সংকল্প বিকল্প হইতেছিল যে, "এই ঘটনা যদি প্রকাশ পায়, তবে হয়ত অনেকে আমার প্রতি কটাক্ষ করিবে; কারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইয়া বৈরাগী গুরু করা হয়ত সকলের প্রীতিকর হইবে না। কি করা যায়! কি করিয়াই বা আমি ইঁহাদের নিকট এই কথা বলি!" তবেই বুঝিয়া দেখ দেখি, কেন আমি ঐরূপ বলিলাম। আর মানীর মান রক্ষা করাই ধর্ম্ম। তোমাদের আর কি! দলে মিশাইতে পারিলেই হইল। ঐসমস্ত লোকদ্বারা নিতাই জগতের কত উপকার সাধন করিবেন, কত কত মায়াবদ্ধ পাষণ্ড জীবকে ভগবৎ-পথে অগ্রসর করাইবেন দেখিতে পাইবে।

ললিতা। যদি এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে জগৎ উদ্ধারের ব্যাঘাতই

হইবে এই ধারণা ছিল, তবে আর গুরু করা কেন? মানমর্য্যাদা ও জাতির গৌরব লইয়া ঘরে থাকিলেই হইত!

বাবাজী। যাউক, এসমস্ত লইয়া তোমাদের বিশেষ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। নিতাইচাঁদ যখন যে মুহূর্ত্তে যাহাদ্বারা যে কার্য্য করাইতে ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে। কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে?

এই বলিয়া নিজ নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন।

কাব্যতীর্থের সংশয়চ্ছেদন

দিনের পর দিন যায়, একদিন বেলা আন্দাজ নয়টার সময় বাবাজী মহাশয় বাগানের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, "দেখ, দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বড়ই গোলে পড়িয়া গিয়াছে। সে ব্যাকরণ অনুসারে গৌরমন্ত্র শুদ্ধ করিতে গিয়া বিষম সমস্যার মধ্যে পতিত হইয়াছে। জীবের কি ভ্রম! নাম, মন্ত্র এবং ভগবান এক বস্তু; তাঁহার প্রতি বুদ্ধির পরিচালনা করিতে যাওয়া কি জীবের সাধ্য হইতে পারে? যাহা হউক, মঙ্গলময় প্রভু মঙ্গল করুন।"

এই সময়ে হঠাৎ দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয় পরম আদর এবং অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তিনিও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পর নানারূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। বেলা অধিক হওয়ায় ললিতাদাসী উভয়কেই স্নান করিবার জন্য অনুরোধ করিলে উভয়েই স্নান আহ্নিকাদি শেষ করিয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের শয়ন-গৃহে উভয়ের মহাপ্রসাদ পাইবার স্থান হইয়াছে। বাবাজী মহাশয়ের আসিতে একটু বিলম্ব আছে। ইত্যবসরে কাব্যতীর্থ মহাশয় আসিয়া ললিতাদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা! গৌরমন্ত্রে কি কোনরূপ সংস্কৃত ভুল আছে? না আমারই অভ্যাসের ভুল?" ললিতাদাসী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আমি ও সমস্ত কিছুই জানি না। তবে

শুনিয়াছি গৌরমন্ত্রটি গুরুদেবের স্বপ্নে প্রাপ্ত। আপনার যদি কিছু বলিবার থাকে তাঁহাকে বলিবেন। আজ আপনার আসিবার চার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তিনি বলিতেছিলেন যে, ‘কাব্যতীর্থ ব্যাকরণ-অনুসারে গৌরমন্ত্র শুদ্ধ করিতে গিয়া বড়ই গোলে পড়িয়া গিয়াছে। যা হউক, মঙ্গলময় প্রভু তাঁর মঙ্গল করুন”। এই কথাটা শুনিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয় একটু বিস্মিত হইলেন। ইতিমধ্যে বাবাজী মহাশয় আসিয়া পঁহুছিলে উভয়ে পরমানন্দে নানারূপ কথাবার্ত্তার সহিত মহাপ্রসাদ পাইলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কাব্যতীর্থ মহাশয় চলিয়া গেলেন।

চার পাঁচ দিন যায়, একদিন বেলা চারিটার সময় কাব্যতীর্থ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ যেন উঁহার ভাবগতিক অন্য রকম। মুখখানি আরক্তিম, নয়ন দুইটি ঢুলু ঢুলু এবং সজল। বেশভূষা আলুথালু। দূর হইতে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে উঁহাকে উঠাইবার জন্য যেমন হাত ধরিয়াছেন, অমনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, “আমি ঘোর অপরাধী অবিশ্বাসী পাষণ্ড; আমি অভিমানের বশে জগৎকে তৃণ তুল্য মনে করিতেছিলাম। সামান্য বিদ্যামদে মত্ত হইয়া পরমার্থ বা সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপের উপর দোষারোপ করিতেছিলাম। আমায় কৃপা করুন, আমার স্বকৃত অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে; আরও যদি করিতে ইচ্ছা করেন, আপনি আদেশ করুন, আমি অবনত-মস্তকে তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছি।”

বাবাজী। কি হইয়াছে? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কাব্যতীর্থ। কেন প্রভু! অন্তর্য্যামী, আপনি ত আমার অন্তরের খবর অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছেন! ইতিপূর্ব্বে আমি যে দিন এস্থানে আসিয়াছিলাম, সেইদিনই ত আপনি আপনার অন্তরঙ্গ সঙ্গিগণকে সমস্ত কথা বলিয়াছেন!

বাবাজী। কি জানি বাবা! কখন কি পাগলের ন্যায় বলি কিছুই ঠিক নাই; সম্প্রতি কিরূপ কি হইয়াছে স্পষ্ট করিয়া বলুন দেখি।

কাব্যতীর্থ। আমাকে যে দিন আপনি কৃপা করিয়া মন্ত্রপ্রদান করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই এই গৌরমন্ত্র সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জন্মে। কারণ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমি যতটুকু সংস্কৃত পড়িয়াছি, তাহাদ্বারা উহাকে অশুদ্ধ বলিয়া মনে ধারণা জন্মিল। ইতিপূর্ব্বে একদিন এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম; কিন্তু যখন শুনিলাম আমার হৃদয়ের কথা আপনি পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়াছেন, তখন প্রাণে প্রাণে আপনার শ্রীচরণে জানাইয়া গেলাম; কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়াই মনে সংশয় উপস্থিত হয়! গত কল্য রাত্রে আমি দুঃখিতচিত্তে শয়ন করিয়া আছি; রাত্র অনুমান চারিটা, এই সময় আপনি উপস্থিত হইয়া খুব তীব্রদৃষ্টিতে আমাকে বিশেষরূপে তর্জ্জন গর্জ্জন করতঃ আমার গালে একটা চাপড় মারিলেন এবং বলিলেন, "হ্যাঁরে! সামান্য দুইপাতা ব্যাকরণ পড়িয়া তোর এতই অভিমান জন্মিয়াছে যে, তুই সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত মন্ত্রের উপর কটাক্ষ করিতেছিস্! তোরা কি মনে করিস্ কলাপ, মুগ্ধবোধ, সারস্বত, কৌমুদী প্রভৃতি যতগুলি ব্যাকরণ প্রচলিত, সেই সমস্ত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ? কখনই নহে, একমাত্র পাণিনি ব্যাকরণ ছাড়া আর সমস্ত ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ। পাণিনির আবার দুই বিভাগ— পূর্ব্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড। সেই উত্তরখণ্ডে বেদ বিভাগে অনেক স্থানে এইরূপ ভাবের প্রয়োগ রহিয়াছে এবং সেই স্থানে ইঁহার সমন্বয় করিয়াছেন। আচ্ছা! তোকে বলি, যদি বা সেইরূপ না থাকে, তবু কি নাম, মন্ত্র বা ভগবানের স্বরূপ কোনও শাস্ত্রাদি দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে? হ্যাঁরে মূর্খ! ও সমস্ত যে স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ পদার্থ?" ইত্যাদিভাবে আমায় কৃপাদণ্ড করিয়া আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করতঃ আমাকে কৃতার্থ করিলেন। এই দেখুন, এখন পর্য্যন্ত আমার গালে চিহ্ন রহিয়াছে।

এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেই কাব্যতীর্থ মহাশয়ের কথা শুনিয়া এবং উঁহার কৃপাদণ্ডের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া একেবারে অবাক্। বাবাজী মহাশয় নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে উঁহাকে প্রবোধ দিয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,— "বাবা! তুমিই ধন্য, তোমার সন্দেহও ধন্য। তোমার সংশয়-চ্ছেদন জন্য পরম দয়াল নিতাইচাঁদ কতই কৃপা করিয়াছেন! এই নরাধমকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাকে ডাক, তাঁহার অহৈতুকী কৃপার জয় দাও, নিঃসঙ্কোচে তাঁহার আদিষ্ট পথে অগ্রসর হও, মনুষ্যজীবন সফল হইবে। একে মনুষ্যকুলে, তাহাতে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে, তাহাতে আবার উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, তাহাতে আবার প্রভু বিদ্যাদি নানারূপ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। তোমাদের এ ত তপস্যার জন্ম, ইহাতেও যদি সেই পরম কারুণিক প্রভুকে না ভজ— তাঁহার কৃপা গ্রহণ না কর, তবে আর কে করিবে? তোমার ন্যায় ব্যক্তির সংসর্গ পাইয়া আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।"

কাব্যতীর্থ। গুরো! আপনি যাহাই বলুন না কেন, যাঁহারই কৃপার কথা উপদেশ করুন না কেন, কিন্তু আমি জানি আমার ন্যায় ঘোর অভিমানী অবিশ্বাসী নরপিশাচের উদ্ধারক আপনি ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না। আমি এ জীবনে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু বহু সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, তপস্বীর সঙ্গ করিয়াছি; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনার ন্যায় অদোষদর্শী, অক্রোধপরমানন্দ কৃপার মূর্ত্তি আর কোথাও পাই নাই। এরূপ গুরু না পাইলে আমার ন্যায় পতিতের উদ্ধার হওয়া অসম্ভব ছিল। এখন আপনার কৃপাদত্ত এই অমূল্য পদার্থ যাহাতে রক্ষা করা যাইতে পারে এবং যাহাতে এই মনুষ্য-জীবনের উন্নতিসাধন হইতে পারে, একবার কৃপা করিয়া সেইরূপ উপদেশ করুন।

বাবাজী। বাবা! মনুষ্যজন্মের প্রকৃত অবলম্বন বিশ্বাস। ভগবদ্‌রাজ্যে

তর্ক চলে না। তর্কের দ্বারা তত্ত্ব নির্দ্দেশ হয় না। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,— "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।" বাস্তবিক কথাই তাই ; কারণ তিনি স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্রপুরুষ। তাঁহার কার্য্যকলাপ কখনও আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মানবের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না, করিতে চেষ্টা করাও আমার মতে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলি, যেমন আমরা বিশ্বাস পূর্ব্বক সংসারের অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকি, সেইরূপ ভগবদ্-রাজ্যটাকেও বিশ্বাস করা বিশেষ প্রয়োজন।

কাব্যতীর্থ। আমরা সংসারে বিশ্বাসের দ্বারা কি কার্য্য করিয়া থাকি ?

বাবাজী। কেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে ব্রাহ্মণ বা ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, অত্রি প্রভৃতি বংশসম্ভূত, একথা তুমি বিশ্বাস কর না কি ? তুমি তোমার পিতার পুত্র, ইহা ত আর তোমার প্রত্যক্ষগোচর নয় ; তবে তুমি বিশ্বাস কর না ? এ ত গেল অতীতের কথা, বর্ত্তমানে দেখ, আমরা এতই বিশ্বাসী যে, চক্ষু বলিল— 'ঐ যে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতেছ, ঐ বস্তুটীতে অপূর্ব্ব সুখ নিহিত রহিয়াছে ; অতএব উহাকে গ্রহণ কর।' চক্ষুর কথা বিশ্বাস করিয়া অমনি আমরা সেইদিকে ধাবিত হইলাম, এখন মরি আর বাঁচি। এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উধাও হইয়া ছুটিতেছি। বল, এইটী কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া করিতেছি কি ? বরং প্রতিকূলে অনেক দৃষ্টান্ত পাইতেছি। তাই বলি বাবা! একমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর কর, কোনরূপ অভাব থাকিবে না। তোমার উপর প্রভুর এতই কৃপা যে, তিনি নিজে প্রত্যক্ষ হইয়া তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন।

কাব্যতীর্থ। গুরুদেব! আমি আপনার শ্রীচরণে চিরজীবনের মত বিক্রীত হইলাম। আমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনার উপর নির্ভর।

এইরূপ নানা কথোপকথনে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয়

কাব্যতীর্থ মহাশয়কে সায়ংসন্ধ্যা করিবার জন্য আদেশ করিয়া নিজে নিত্য-কৃত্য করিতে গমন করিলেন। যথাসময়ে উভয়ে মহাপ্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন। ক্ষণকাল পরে কাব্যতীর্থ মহাশয় ইঁহার চরণ দুইখানি নিজ অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ও হাসিমুখে উত্তর দিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশে একটু শয়ন করতঃ পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া কার্য্যানুরোধে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ইনিও নিজ নিত্যকৃত্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়দিন যায়, একদিন প্রাতঃকালে একটী লোককে চার পাঁচজন লোক ধরাধরি করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট লইয়া আসিল। লোকটী অচৈতন্য, মুখে ফেনা উঠিতেছে। বাবাজী মহাশয় দেখিবামাত্র শশব্যস্তে বলিলেন, "এ কি বাবা! ইহার কি হইয়াছে?" আগন্তুক লোক কয়জন বলিল, "বাবা! রাত্‌মে ইস্‌কো সাপ্‌ কাটা হ্যায়। হামলোক বড়ী দুঃখী আদ্‌মী, আপ্‌ দয়া করকে ইস্‌কো বঁচায় দিজীয়ে।"

বাবাজী। বাবা! আমি ত কিছুই জানি না, তবে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার মন্ত্রে সে দিন একজন বাঁচিয়াছে। তাঁহাকে ডাকিয়া দিই, তিনি ভাল করিবেন।

আগন্তুক। মহারাজ! দো তিন ওস্তাদ ত বহুত্‌ ঝাড়্‌কে থক্‌ গিয়া। অব্‌ আপ্‌কো কৃপা বিনা এ মর্‌ জায়গা।

বাবাজী। না বাবা! সে জন্য তোমাদের ভয় নাই।

এই বলিয়া নবদ্বীপদাদাকে বলিলেন, "সকলে ইহাকে ঘেরিয়া নাম কর এবং বুড়া বাবাকে ডাকিয়া দাও।"

নবদ্বীপদাদা মৃদু হাসিয়া যথাদিষ্টভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। খুব নাম চলিতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাবাজী মহাশয়ের আদেশে আগন্তুক লোকটীকে মন্ত্রদ্বারা ঝাড়িতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যায় কিছুই হইতেছে না

দেখিয়া আগন্তুক হিন্দুস্থানী ভক্তকয়েকটী কাতরপ্রাণে বাবাজী মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন। ইনি তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া বলিলেন, "তোমরা নিতাইচাঁদকে জানাও, তিনি ওঝার ছেলে ওঝা ; সুতরাং এখনই ভাল হইয়া যাইবে।" শুনিয়া সকলে 'হা নিতাই, জয় নিতাই' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেই হিন্দুস্থানী লোক কয়েকটীকে বলিলেন, "দেখ বাবা! তোমরা ধরাধরি করিয়া উহাকে সংকীর্ত্তনে দাঁড় করাইয়া দাও।" তাহারা তাহাই করিল ; কিন্তু সে লোকটীর শরীরের গ্রন্থিসকল একেবারে শ্লথ হইয়া গিয়াছে ; গায়ের রং কাল, মুখে ফেন বাহির হইতেছে। বাবাজী মহাশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ সেই লোকটীকে কোলে ধরিলে অপরাপর লোকসকল তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ঐরূপ অবস্থায়ই কীর্ত্তনে নাচিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে লোকটী যেমন চম্‌কিয়া উঠিল, অমনি বাবাজী মহাশয় তাহাকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া দিয়া নিজে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে উক্ত লোকটী প্রকৃতিস্থ হইয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক যেমন বাবাজী মহাশয়কে দেখিতে পাইল, অমনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"এ মহারাজ, হাম্‌কো দয়া কর্‌কে চরণ দিজীয়ে।" অন্য লোকসকল দেখিয়া অতিশয় বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়কে প্রণাম পূর্ব্বক নানারূপ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় রোগীটীকে বলিলেন, "দেখ বাবা! এই বুড়া বাবা তোমার প্রাণদান করিয়াছেন, ইহাকে নমস্কার কর। ইঁহার অপূর্ব্ব মন্ত্রের প্রভাব।" প্রতিষ্ঠার ভয়ে বাবাজী মহাশয় এইরূপে প্রকৃত ঘটনা চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছেন ; দর্শকবৃন্দ কিন্তু সে কথায় ভুলিতেছেন না। তাঁহারা একবাক্যে বাবাজী মহাশয়কেই উহার প্রাণদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। যথাসময়ে অন্যান্য সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে বাবাজী মহাশয় স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

সদলে দর্জ্জিপাড়ায় গমন ও অবস্থিতি।

রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ইডেন গার্ডেন্স) প্রায় সর্ব্বদাই বাবাজী মহাশয়ের কাছে থাকেন। উঁহার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! যিনি সর্ব্বদা সাহেবদের সঙ্গে একত্র আহার ব্যবহারাদিতে পরম শান্তি লাভ করিতেন, নিষ্ঠা বা সদাচারকে যিনি কুসংস্কার মনে করিতেন, ধর্ম্ম বলিয়া একটী বস্তু জগতে আছে এরূপ ধারণা যিনি কখনও মনে স্থান দেন নাই, তিনি আজ পরম সদাচারী, নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ—গলায় তিন কণ্ঠী তুলসীর মালা, কপালে হরিমন্দির তিলক, মুখে সর্ব্বদার তরে ভগবৎ-নাম। উঁহাকে দেখিবামাত্র যেন একটী সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।

প্রায় মাসাবধি কাল রায় বাহাদুর প্রসন্নবাবুর বাগানবাড়ীতে কাটিয়া গেল। আর যেন বাবাজী মহাশয়ের মন টিকিতেছে না ; কিন্তু প্রসন্নবাবুর অতিশয় আগ্রহ ; সুতরাং সহজে ছাড়াইতেও পারিতেছেন না। প্রসন্নবাবু বলেন, "বাবা! আমি বহুদিনের পাপী! আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন ; কিন্তু কিছুদিন নিকটে রাখিয়া নানারূপভাবে শক্তিসঞ্চার না করিলে আবার যদি পড়িয়া যাই! তাই আমার প্রার্থনা— অন্ততঃ ছয়মাস আমার এই বাগানে অবস্থান করুন।" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলে, "বাবা! ভিখারী বৈরাগীদিগকে বহুদিন একস্থানে রাখিতে নাই! আমরা ত আছিই! নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হইলে কতবার আসা যাওয়া হইবে। এ যাত্রায় আর অনেক দিন থাকা বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা নয়।" প্রসন্নবাবু নানারূপ কৌশলে যাহাতে অন্ততঃ আর কিছুদিন থাকা হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এই ঘটনার পর দিবস দর্জ্জিপাড়া নিবাসী বাবু যোগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় আসিয়া সদলে বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার

বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রসন্নবাবুকে নানারূপ ভাবে প্রবোধ দিয়া সদলে যোগেন বাবুর সহিত তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ইঁহাদের থাকিবার জন্য যোগেনবাবু অনাথ নাথ দেবের লেনের মধ্যে উক্ত অনাথ বাবুদেরই একটী দোতলা বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা সেই বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তিন চারদিন যায়, হঠাৎ একদিন বাবাজী মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হইল। বুকে অত্যন্ত শ্লেষ্মা ও কাসি হইতে লাগিল। সঙ্গিগণ বড়ই চিন্তিত হইলেন। এই সময় যোগেন বাবু আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে শরীরটী বড়ই অসুস্থ হইল। আমাদের মন বড়ই খারাপ হইতেছে। আদেশ করেন ত একজন কবিরাজ আনিয়া দেখাই।" বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা।" তখন যোগেনবাবু সে সময়ের কলিকাতার প্রধান কবিরাজ নিশিকান্ত সেন মহাশয়কে আনাইলেন। কবিরাজ মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের সহিত নানারূপ ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করিবার পর বলিলেন, "আজ্ঞে একবার হাতখানা দেখিতে ইচ্ছা করি।"

বাবাজী। স্বচ্ছন্দে! আপনারা ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র ; কারণ তিনি আপনাদের দ্বারা বহুলোকের হিতসাধন করাইতেছেন।

কবিরাজ। আমাদের কি ক্ষমতা? আমরা নিমিত্তমাত্র। তিনি জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য কতরূপ চেষ্টা করিতেছেন। ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিলে নিজে অবতার গ্রহণ করিয়া অসুর বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম্মসংস্থাপন করিতেছেন। তৎপর যখন দেখিলেন, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং ; দেহ সুস্থ না থাকিলে দুর্ব্বল জীব কোন কার্য্য করিতে পারিবে না, তখন ধন্বন্তরিরূপে অবতার গ্রহণ করিলেন। আপনারা মহাপুরুষ, কৃপা করুন যেন তাঁহার উপদিষ্ট পথে চলিতে পারি।

এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের হাত দেখিতে লাগিলেন। বুকে শ্লেষ্মা

থাকায় একটু ভীত হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আমার একটি অনুরোধ,—কিছুদিন আপনি অধিক কথা, উচ্চ কথা, উচ্চ সংকীর্ত্তন বা কোনরূপ কায়িক পরিশ্রম করিবেন না ; কারণ যেরূপ কাসি হইয়াছে, ইহাতে ঐ সমস্ত করিলে এইটী ব্যাধিতে পরিণত হইতে পারে। আমি ঔষধ দিয়া একেবারে নীরোগ করিয়া দেই, পরে যখন বলিব, তখন যাহা ইচ্ছা করিবেন ; তাহাতে কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না।

বাবাজী। কতদিন বন্ধ করিতে হইবে!

কবিরাজ। আজ্ঞে ছয়মাস পারিলে ভাল হয়, অগত্যা তিনমাস।

বাবাজী। বাবা! তিন মাস যদি উচ্চকীর্ত্তন বন্ধ করা হয়, তবে আমার মাথা গরম হইয়া যাইবে, অথবা বুকে কোনও অসুখ হইবে।

কবিরাজ। এ যে বিপরীত কথা হইল! কারণ আমরা জানি, উচ্চ-কীর্ত্তন, উচ্চভাষণ অথবা অধিক ভাষণেই মস্তিষ্ক খারাপ বা বুকের অসুখ হইবে!

বাবাজী। আমি জানি এই সমস্ত না করিলে আমার শরীর খারাপ হয়।

কবিরাজ। আপনারা মহাত্মা, আপনাদের সকলই সম্ভবে। কিন্তু আমার অনুরোধে অন্ততঃ একমাস কাল অবশ্যই একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

বাবাজী। আচ্ছা, নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

কবিরাজ মহাশয় তখন হৃষ্টচিত্তে একখানি কাগজে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলে যোগেনবাবু একটী লোককে কবিরাজবাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে যাহাতে কবিরাজ মহাশয়ের ব্যবস্থানুরূপ কার্য্য হয়, সেই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখুন, আপনারা কোনই ভয় করিবেন না ; কারণ বাহিরের লোক আসিলে ত ইনি কথা বলিবেন, আমি দ্বারবান রহিলাম। আজ হইতে একমাস কাল

অন্য কাহাকেও উপরে আসিতে দিব না।" সকলেই নিত্যস্বরূপের কথায় বড়ই আনন্দিত হইলেন। এদিকে কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ আসিয়া পঁহুছিলে বিধান-অনুযায়ী ঔষধ সেবন করান হইল। পথ্যও তদনুযায়ীই হইল। তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; কেবল আপত্তি উচ্চসংকীর্ত্তন বা উচ্চভাষণ বাদ করার দরুণ।

প্রাণপ্রিয়তম রামদাস বলিলেন, "আমি কীর্ত্তন করি, আপনি এই স্থানে বসিয়া শ্রবণ করুন।" বাবাজী মহাশয় তাহাতেই সম্মত হইলেন। সকালে কীর্ত্তন, বৈকালে পাঠ এবং সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। প্রথম দিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন সকাল হইতেই অনেক লোক দরজায় আসিতে লাগিল। নিত্যস্বরূপ সকলকে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবাজী মহাশয়ের শরীর অসুস্থ; অতএব আপনারা কয়েকদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করুন।" অবশ্য কেহ বা বুঝিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, কেহ বা একবার দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া নানারূপ কাতরভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বেলা নয়টা বাজিল। এই সময়ে বাবাজী মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে নিত্যস্বরূপ, আমার মাথা ফাটিয়া গেল, এইবার দরজা ছাড়িয়া দে, নতুবা আমি পাগল হইয়া যাইব!" ইঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে সঙ্গিগণ সকলেই ভীত হইয়া নিত্যস্বরূপকে নিষেধ করিলে নিত্যস্বরূপ উপরে আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে কবিরাজ মহাশয় আপনাকে অন্ততঃ একমাস পর্য্যন্ত উচ্চকথা বা বহু কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।"

বাবাজী। দেখ, পরের জিনিষের মমতা পরে বুঝিতে পারে কি? আমি মনে করিয়াছিলাম, কবিরাজ মহাশয়ের উপদেশ-অনুসারে চলিব; কিন্তু এ দেহটী ত আর আমার নহে; যাঁর বস্তু তিনি যেরূপ করিয়া ভাল-বাসিবেন, তাহার উপর আমার বলিবার কি অধিকার আছে? আমরা আমাদের মঙ্গল যতটা অনুভব করিতে পারি, তদপেক্ষা সর্ব্বান্তর্য্যামী

মঙ্গলময় নিতাইচাঁদ অনেক বেশী চিন্তা বা চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে মুহূর্ত্তে যেটি প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা তিনিই করিয়া থাকেন। নিতাই-চাঁদের ইচ্ছায় যাঁহারা আমার নিকট আসেন, তাঁহাদের দ্বারা আমার পরম উপকার ভিন্ন কখনই অপকার সাধিত হয় না বা হইতে পারে না, এটী নিশ্চয়ই জানিও। নিতাইচাঁদ যতদিন যে পুতুল দ্বারা যেরূপ ভাবে খেলা করিতে ইচ্ছা করিবেন, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। কাহাকেও বাধা দিও না। ভক্তগণের প্রাণে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিলে নিতাইচাঁদ বড়ই কষ্ট পাইবেন। এজীবনে তাঁহাকে সুখী করিতে পারিলাম না, পারিবার আশাও নাই ; কারণ আমি সর্ব্বদা আত্মসুখের জন্য লালায়িত। তাহাতেও আবার যদি পদে পদে তাঁহাকে দুঃখ দেই, তবে গতি কি হইবে! সুখময় নিতাইচাঁদ আমাদের সুখের জন্য আত্মসুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন— নিজ কুসুম-সুকোমল তনুতে কত না অত্যাচার সহ্য করিতেছেন— কত না পাষণ্ডীগণের গঞ্জনা অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতেছেন। কৈ আময়া ত ভ্রমেও একবার তাঁহার সুখের দিকে লক্ষ্য করিতেছি না! ধিক্ আমাদেয় স্বার্থপরতায়! ধিক্ আমাদের নশ্বর দেহের সুখভোগ-লালসায়! ধিক্ আমাদের জীবনে!

এই বলিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নিত্যস্বরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি ঘোর অপরাধী। আমি আপনার প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য আমায় ক্ষমা করুন।" এই বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় উঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। যথাসময়ে সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

———

শিশিরবাবুর সহিত মিলন।

একদিন বেলা অনুমান চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় উপর তলায় বসিয়া আছেন, ললিতাদাসী মাথায় বাতাস করিতেছে, অন্য দুই একজন সঙ্গী ইঁহার নিকটে বসিয়া আছেন কিন্তু সকলেই নীরব। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় চমকিত হইয়া বলিলেন,—"কোনও এক মহাত্মা আসিতেছেন দেখ ত।" শুনিয়া একজন শশব্যস্তে গমনোদ্যত হইলেন। এই সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকটীর বাহিরের বেশভূষার চাকচিক্য একেবারেই নাই; সাধারণভাবের একটী জামা গায় ও একখানি চাদর সঙ্গে। যদিও লোকটী খুব গৌরবর্ণ নন, কিন্তু মুখখানি জ্যোতির্ম্ময় এবং নয়ন দুইটী সজল ঢুলু ঢুলু। গমনের ভঙ্গিটী যেন কোনও অপ্রাকৃত রাজ্যের পরিচায়ক। লোকটীকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন ভিতর হইতে প্রকাশোন্মুখ কোনও বস্তু গোপন করিবার মানসে অতিকষ্টে চাপা দিতেছেন। দূর হইতে উঁহাকে দেখিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় সসম্ভ্রমে 'এই যে দাদা! আসুন' বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। অপূর্ব্ব সম্মিলন! স্পর্শ-মাত্রই উভয়ে অচৈতন্য—উভয়ের চোখের জলে উভয় দেহ সিক্ত; উভয়ের দেহেই সমকালীন সাত্ত্বিক বিকার সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভক্তগণ উভয় মহাপুরুষকে অতিশয় সাবধানে রক্ষা করিতেছেন, যাহাতে ভূমিতে পতিত না হন। নানারূপ সন্তর্পণে কিছুক্ষণ পরে উভয়েই কথঞ্চিৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া উরবেশন করিলেন। উভয়েরই চক্ষু আরক্তিম এবং সজল। শিশিরবাবু গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা! আপনি এখানে আসিয়াছেন শুনিয়া অনেক দিন হইতেই আমি মনে করিতেছি যে একবার দর্শন করিব, কিন্তু ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। আজ গৌরের ইচ্ছায় অভাবনীয়রূপে দর্শন পাইলাম। বোধ হয়

আমাকে চিনিতে পারেন নাই। অধমের নাম শিশির কুমার ঘোষ।”

বাবাজী। দাদা! আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার দর্শন-লাভ করিলাম। জানি না নিতাইয়ের কি ইচ্ছা। সকাল হইতে মনটা যেন কোথায় ছুটিয়া যাইতেছিল— যেন কাহার সহিত আলিঙ্গন করিবার জন্য হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল। কাহার দর্শনের জন্য প্রাণ যেন ব্যাকুল হইতেছিল। কৃপাময়ের কি কৃপা! যোগমায়ার কি অপূর্ব্ব যোগাযোগ! এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আপনার বিষয়ই ভাবিতেছিলাম।

শিশিরবাবু। কেন, কি উদ্দেশ্যে অধমের কথা মনে পড়িয়াছিল?

বাবাজী। কোনও উদ্দেশ্য করিয়া নয়; তবে মনে ভাবিতেছিলাম, শিশিরবাবু নিতাইয়ের কৃপায় এতই শক্তিমান্ যে অত বড় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষকে কি না নিঃসঙ্কোচে বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিল! দেখা পাইলে একবার ঝগড়া করিতাম।

শিশিরবাবু। তাই! তোমাদের ঠাকুরটী যে একেবারে সহজ তাহা নয়। এবার আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতীতে কুলাইল না, তাই বিদেশী লোকের সহিত মিশিয়া চলিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমার দোষ কি? আমি ত দেখি, তাহার সঙ্গে পড়িয়া আমাদের পর্য্যন্ত জাতিটা গেল!

এইরূপ কত যে প্রেমালাপ হইতে লাগিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? উঁহাদের উভয়ের ভাব উভয়েই বুঝিতেছেন। যাঁহারা সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ইঁহাদের পরস্পরের ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও বা উভয়ের দেহেই অশ্রুকম্পপুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এইরূপে অনেক সময় কাটিয়া গেল। যদিও পরস্পরের সঙ্গ ছাড়া কাহারই অভিমত নহে, তথাপি কার্য্যানুরোধে শিশিরবাবু বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া বাসায় গমন করিলেন।

দুই তিন দিন পরে একদিন শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এবং এক মূর্ত্তি বৈষ্ণব এই দুই জনে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। দেখিবা-মাত্র ইনি বিশেষ সম্মানের সহিত উভয়কে বসাইলেন। পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত সেই বৈষ্ণবটীর মায়া লইয়া অনেক রকম বাদানুবাদ চলিতেছিল। বৈষ্ণবটী বলেন, যাবতীয় কার্য্যই একমাত্র যোগ-মায়ার খেলা। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, প্রাকৃত রাজ্যের সমস্ত ক্রিয়াই মায়াকৃত। অপ্রাকৃত নিত্যচিন্ময় রাজ্যের লীলাখেলাই একমাত্র যোগমায়া-কৃত ইত্যাদি। শুনিয়া বাবাজী মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথাই যুক্তি-সঙ্গতবোধে সেই বৈষ্ণবটীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ সংকীর্ত্তন ধরিলেন সংকীর্ত্তনে আজ অন্য কোনও কথা নাই, ঐ মায়া এবং যোগমায়া সম্বন্ধেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হইতেছে, এই সময় শিশিরবাবু তাঁহার একটী নাতিকে লইয়া আসিয়াই কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। অপূর্ব্ব আনন্দ। সকলেই সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর সকলে নানারূপ ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। এইরূপ প্রায়ই শিশিরবাবু ঐ নাতিটীকে সঙ্গে করিয়া আসিতেন। একদিন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আপনি যখন আসেন প্রায়ই এই নাতিটী সঙ্গে থাকে। এই ছেলেটী পরম ভাগ্যবান্।" তখন শিশিরবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনার নিকট আসিলে আর বাড়ীর কথা মনে থাকে না। পাছে একেবারে ভুলিয়া থাকি তাই বলিয়া ইহাকে সঙ্গে আনি। ইহার টানে বাড়ীর কথা মনে পড়িবে।" বাবাজী মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার দ্বারা প্রভু যেরূপ কার্য্য করাইতেছেন, ইহাতে সংসার ছাড়া অপেক্ষা অনেক মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে ও হইবে। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিকে তিনি নির্ব্বিঘ্নে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন।" এইরূপ ভাবে বহু কথাবার্ত্তার পর শিশিরবাবু নিজ

বাড়ীতে গমন করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও নিজকৃত্য করিতে লাগিলেন। দর্জ্জিপাড়ায় অবস্থানকালে কখনও বাবাজী মহাশয় শিশিরবাবুর বাড়ী যাইতেন, কখনও বা শিশিরবাবু বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিতেন।

অতীন্‌বাবুর সহিত মিলন।

দর্জ্জিপাড়ায় সংকীর্ত্তনানন্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় একটী দীর্ঘাকার যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটী আর কখনও আসিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়োচিত চিহ্নাদি উঁহার দেহে কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছিল না—ভদ্রোচিত বেশ, গায়ে একটী জামা। আসিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় বিশেষ আদরের সহিত "এস ভাই এস" বলিয়া হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। আজ দুই তিন দিন হইতে ইঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে। বুকে পিঠে শ্লেষ্মা বসিরা একটু বেদনা হইয়াছে। পুরাতন ঘৃত মালিশ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ইঁহার কিন্তু সেদিকে খেয়াল নাই। বাবুটীর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ ভাই! তোমার নাম কি? তোমরা বোস্ নও?" বাবুটী একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম অতীন্দ্র নাথ বসু।"

বাবাজী। ভাই! তুমি ত বেশ কুস্তি করিয়া থাক, আমার এই হাতখানা একটু টিপিয়া দাও ত!

অতীন্‌বাবু কিন্তু ইঁহার ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কারণ এরূপ সরলতা ও মধুর ব্যবহার অন্য কোথাও পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। হৃষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে বাম হাতখানি টিপিতে লাগিলেন। ইনি বলিলেন, "কৈ তুমি অতবড় বলবান্, তোমার গায়ে জোর কৈ? একটু জোরে টিপ ত!" এইবার অতীন্‌বাবু জোরে টিপিতে লাগিলেন। যতই জোরে টিপিতে

লাগিলেন ততই ইনি বলিতেছেন, "কৈ জোর কৈ? কি রকম পালোয়ান।" অতীন্‌বাবু কিন্তু এইবার হয়রান্ হইয়া গেলেন। যথাসাধ্য টিপিয়াও যখন ইঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন বিস্মিতভাবে ইঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ইনিও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বড়ই কষ্ট হইয়াছে? আচ্ছা বস, স্থির হও।" বলিয়া নানারূপ ভগবৎ-কথা বলিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে অতীন্‌বাবু বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। এই হইতেই অতীন্‌বাবু বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। প্রায় প্রত্যহই আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের মুখে নানারূপ তত্ত্বকথা এবং রামদাদার প্রভাতী কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অতীন্‌বাবুর দেখাদেখি উঁহারই সঙ্গী কেবল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একটী ব্রাহ্মণযুবক বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে আসিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখের উপদেশ এবং রামদাদার সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই চাটুয্যে মহাশয়ের মতিপরিবর্ত্তন হইল। ক্রমে বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে মন্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক গলায় মালা ধারণ করিলেন। চাটুয্যে মহাশয়ের অবস্থাপরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেকেই বলিতে লাগিল যে এই লোকটীর একদেহে জগাই মাধাই বর্ত্তমান ছিল। ইহাকে উদ্ধার করা সহজ শক্তির কার্য্য নহে! উঁহার অবস্থা দেখিয়া দর্জ্জিপাড়াবাসী সকলেই বিস্মিত। বাবাজী মহাশয় উঁহার নাম রাখিলেন **বিজয়**। যথার্থই এ হেন পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়া ইনি জগতে বিজয়পতাকা উড়াইয়াছেন। বিজয়ের অপূর্ব্ব গুরুনিষ্ঠা এবং নামে রুচি জন্মিল। নিতাইচাঁদের কি করুণা! যে লোককে সকলে অশ্রদ্ধা, অপ্রীতি বা অবজ্ঞার চোখে দেখিত এবং ভীত ভীত ভাবে যাহার সহিত ব্যবহার করিত, সে আজ দেবদুর্ল্লভ ভক্তিপথের পথিক হওয়ায় সকলের প্রীতির পাত্র হইয়া পড়িল। লোকের অনিষ্ট-চেষ্টাই যাহার ব্রত ছিল, সে আজ পরহিতে রত— পরোপকারের জন্য

প্রাণ দিতে প্রস্তুত। জগতে এমন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহা সৎসঙ্গের প্রভাবে না হইতে পারে। মহৎকৃপার সর্ব্বথা জয় হউক।

এইরূপ পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন যোগেন-বাবুর আগ্রহে নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইবার উদ্যোগ হইল। কলিকাতা সহরে পাস না করিলে সংকীর্ত্তন করা যায় না; কাজেই যোগেনবাবু নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী রাস্তা পাস করাইলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় কীর্ত্তন বাহির করা হইল। মাতামাতি কীর্ত্তন! বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। সঙ্গিগণ ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। অনুরাগের প্রাণে বিধির বন্ধন কতক্ষণ থাকে? কীর্ত্তনের স্রোত "পাসের" রাস্তা ছাড়িয়াও অন্য রাস্তায় যাইতে লাগিল। বাধা দেয় কার সাধ্য? নিতাইচাঁদের কৃপার আনন্দের স্রোতে বাধাবিঘ্নরূপ তৃণলতা-সকল ভাসিয়া গেল। যাহারা বাধা-বিঘ্নকারী, তাহারাও সেই আনন্দে যোগ দিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। বহুক্ষণ নগর-কীর্ত্তন করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন।

গিরীনবাবুর সহিত মিলন।*

তিনি লিখিয়াছেন:— আমার নাম গিরীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আমি চাকরির অনুরোধে কলিকাতায় বাস করিতেছি। ইং ১৯০০ সালের অনুমান শেষভাগে একদিন একটী লোক আমাকে বলেন, "দেখুন, দর্জ্জিপাড়ায় একজন সাধু আসিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব এবং অলৌকিক শক্তি দেখিবামাত্রই মনপ্রাণ গলিয়া যায়, আপনি একবার দেখিতে যাইবেন কি?

---

* এই ঘটনাটী শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা ক্ষতি কি! আজই সন্ধ্যাকালে যাওয়া যাক।" তাহাই হইল। সন্ধ্যার সময় সেই লোকটী এবং অপর দুইটী ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া আমি দর্জ্জিপাড়া গেলাম। গিয়া দেখি খুব সংকীর্ত্তন হইতেছে। সঙ্গী পূর্ব্বোক্ত লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ যে সংকীর্ত্তন করিতেছেন ঐ কি সেই সাধু?" তিনি বলিলেন, "না, এটী তাঁহার শিষ্য, উঁহার নাম রামদাস।" রামদাস নামেতে এবং উঁহার আকার প্রকারে যেন আমার পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কীর্ত্তনসমাপ্তির পর উঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে আমার অনুমান সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। বাবাজী মহাশয় সেদিন উপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল না। মনের মধ্যে বড়ই উৎকণ্ঠা রহিল।

পর দিবস আবার যাইয়া দেখি, একটী সুদীর্ঘাকার মহাপুরুষ কীর্ত্তন করিতেছেন। বলিতে কি, উঁহাকে দেখিবামাত্রই আমার চিত্ত আকর্ষিত হইল। ইতিপূর্ব্বে সংকীর্ত্তনে যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তাহা নহে; জানিনা, কি শুভ মুহূর্ত্তে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখোচ্চারিত নাম কর্ণে প্রবেশ করিল, মনপ্রাণ যেন কেমন একপ্রকার হইয়া গেল। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলাম। সেদিন আর বাবাজী মহাশয়ের সহিত কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। এই হইতেই আমি প্রত্যহ ইঁহার নিকট যাইতে লাগিলাম।

একদিন প্রাতে গিয়া দেখি রামদাদা প্রভৃতি ইঁহার সঙ্গিগণ কালীঘাট যাইতেছেন। কেবল বাবাজী মহাশয় এবং আর দুই একটী মাত্র বাসায় রহিলেন। অবসর পাইয়া আমি বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কি রকম বৈষ্ণব? শুনিয়াছি বৈষ্ণবেরা কালীনাম করে না, দর্শন ত দূরের কথা; আর আপনারা সেই কালীদর্শনে গেলেন? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!"

বাবাজী। কেন ভাই! তুমি অমন শিক্ষিত! আর একটী সামান্য কথা

বুঝিতে পার না? হৃদয়ে কোনরূপ দ্বেষভাব থাকিতে ধর্ম্মভাব আসিতে পারে না; বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে ত দ্বেষভাব একেবারেই থাকা অসম্ভব। কারণ,—

"ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাই মতি॥
অনিন্দুক হইয়া সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে তারিবেন হেলে॥
সর্ব্ব দেব পূজিবে না হবে তৎপর।
সবার নিকট মেগে লবে কৃষ্ণভক্তিবর॥"

ইত্যাদি বাক্যসকল বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল ভিত্তি। কালীদুর্গা ত দূরের কথা— বৈষ্ণবগণ তৃণ, লতা, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কোনও ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা বা দোষকে নিষ্কলঙ্ক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মগত করা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই জাতীয় বুদ্ধিকে অতি হেয় জ্ঞান করিতেন।

আমি। আচ্ছা নিতাই এবং নিমাই কে? ইঁহাদের সম্বন্ধে আমার কিছু জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

বাবাজী। নিতাই গৌর যে কে, ইহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন; তবে মোটামুটি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকার ভাব এবং কান্তি গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে শ্রীশচীনন্দন-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর বলরাম ও অনঙ্গমঞ্জরী মিলিত হইয়া নিত্যানন্দরূপে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আমি। আচ্ছা ইঁহারা কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন? অন্যান্যযুগে যেমন "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি

যুগে যুগে ॥” এই ভগবদ্বাক্য অতি স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এই কলিযুগে সেইরূপ কোনও কার্য্য-উদ্ধারের জন্য ইঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি ?

বাবাজী। ঠিক এই উদ্দেশ্যে কখনই স্বয়ং রূপের আসিবার প্রয়োজন হয় না— কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন—

যুগ প্রবর্ত্তন হয় অংশ কলা হইতে।
আমা বিনু কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥

আমি। তবে কি প্রেম দান করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছেন ?

বাবাজী। এই প্রেম প্রদানও আনুষঙ্গিক। মূল উদ্দেশ্য—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

এই হইল শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের মূল প্রয়োজন ; আর যত কিছু কার্য্য সমস্ত আনুষঙ্গিক ভাবে পূরণ হইতেছে। এ বিষয় বিস্তারিতরূপে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত আছে। যাহা হউক, তুমি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানি একবার দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে।

এই বলিয়া আমাকে উক্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানি দিলেন। আমিও গ্রন্থখানি পড়িয়া বৈকালে ফেরত দিলাম। দুই এক দিন পরে বাবাজী মহাশয়ের শরীর একটু অসুস্থ হইল। বুকে পিঠে শ্লেষ্মাজনিত বেদনা হইয়াছে। আমি যেমন উপস্থিত হইয়াছি, অমনি বাবাজী মহাশয় আমাকে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিতে বলিলেন। আমি পরমানন্দে ইঁহার বুকে এবং পিঠে মালিশ করিতে লাগিলাম।

একদিন আমি রামদাদাকে বলিলাম, “ভাই! তোমরা সংকীর্ত্তনে কাঁদ কেন ? আমার বিশ্বাস ওসব কিছুই নয়। যদি আমার চোখে জল

আনাইতে পার, তবে জানি তোমাদের মধ্যে কোনও পদার্থ আছে।" রামদাদা বলিলেন, "ভাই! তিনদিন পর্য্যন্ত তুমি নিতাই গৌরের নাম একবার করিয়া স্মরণ কর, আমার বিশ্বাস—নিশ্চয়ই ফল হইবে।" এইরূপে দুইদিন যায়, তৃতীয় দিবসে আমি বাবাজী মহাশয়কে ঘৃত মালিশ করিতেছি, রামদাদা কীর্ত্তন করিতেছেন—"হাড়াই পণ্ডিতসুত, জাহ্নবাজীবন ধন।" জানি না আমি কি জন্য হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলাম। বাবাজী মহাশয় আমাকে আলিঙ্গন দিলেন; আমি আরও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি কেন কাঁদিলাম? কে কাঁদাইল? কথার ভিতরে এমন কিছু ছিল না, যাহাতে আমার পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হইতে পারে বা আমি কাঁদিতে পারি। কিন্তু আমি কোন্ অলৌকিক শক্তি প্রভাবে কাঁদিলাম প্রভুই জানেন।

বাবাজী মহাশয়ের কথাবার্ত্তা বা ব্যবহারাদিতে আমি যেন ক্রমেই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলাম। একদিন সগণে বাবাজী মহাশয়কে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় স্বীকৃত হইলেন। আমি ইঁহার উদারতাগুণে বিমোহিত হইলাম। এইরূপ পরমানন্দে কয়েকদিন যায়; একদিন বিরাট নগরকীর্ত্তন বাহির করিবার জন্য রাস্তার পাস লওয়া হইল। আমাকে সঙ্গে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি সংকীর্ত্তনে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে থাকিব— তিনি আবিষ্ট হইয়া যাহাতে আছাড় খাইয়া ভূমিতে না পড়েন, সেইরূপভাবে রক্ষা করিব, এই সমস্ত কথা যতই ভাবিতেছি, আমার হৃদয়ে ততই যেন আনন্দের উৎস ছুটিতেছে। যথা সময়ে সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া বিডন স্ট্রীট দিয়া নিমতলা স্ট্রীটে মা আনন্দময়ীর নিকট যেমন উপস্থিত হইল, অমনি বাবাজী মহাশয়ের আদেশ হইল। আমি পূর্ব্বে যাহা ভাবিয়াছিলাম যে আবেশের সময় বাবাজী মহাশয়কে রক্ষা করিব তাহা হইল না। ইনি প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত জায়গায় প্রেমভরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর গদগদকণ্ঠে বলিতে

লাগিলেন, "মা আনন্দময়ি! ধন্য কলিযুগ, একবার গৌরহরি বল। শুনিয়া তোমার অবোধ সন্তানগণ প্রেমানন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাক্। সন্তানগণের আনন্দে তুমিও আনন্দিতা হও! মা যোগমায়ে! জীবের হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে হিংসার বীজ উৎপাটিত করিয়া দাও। ইত্যাদি। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বাবাজী মহাশয় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। অশ্রুকম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকল সমকালীন ইঁহার দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে যেমন বাবাজী মহাশয়ের নিকট গিয়াছি, অমনি কৃপাময় কৃপা করিয়া আলিঙ্গন দানে আমায় কৃতার্থ করত আমার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। আমার পশুজীবন দূর হইল— আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চিরজীবনের মত বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। যথাসময়ে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন বটে; কিন্তু সেই অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় নামের ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমাকে যেন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন করিতে লাগিল। আমি যেন আর সে আমি নাই। বলিতে কি, অদ্যাপি যখনই মা আনন্দময়ীকে দর্শন করি, তখনই যেন আমার হৃদয়ে সেই দিনের এবং সেই আনন্দের কথা যুগপৎ জাগিয়া উঠে, আর বাবাজী মহাশয়ের অহৈতুকী কৃপার জয় দিই।

নবদ্বীপদাদার বিদায়

মহতের ক্রিয়াকলাপ বুঝা দুঃসাধ্য। তাঁহারা এক কার্য্য করিতে পাঁচ সাত কার্য্য করিয়া থাকেন। আজ সাত আট দিন হইতে নবদ্বীপ দাদা একটু ফাঁকে ফাঁকে থাকেন। বাবাজী মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা এমন কি দেখা শুনা পর্য্যন্তও নাই। তিনি কলুটোলা কুঞ্জবাবুদের বাড়ীতে থাকেন। মাঝে মাঝে যদিও একবার ঐ বাসাবাড়ীতে আসেন, কিন্তু দুই ভাইয়ে দেখা শুনা নাই। ইনিও ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন না, আবার ভাইও দাদার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। ইঁহাদের এইরূপ অভিমান প্রায় মাঝে মাঝে হইয়া থাকে। যত বিপদ সঙ্গিগণের। সঙ্গিগণ উভয়কেই প্রীতির চোখে দেখিয়া থাকেন। কারণ উঁহারা যদিও নবদ্বীপদাদার গুরুভাই হন, তথাপি অনেক সময় উঁহারই উপদেশ-অনুসারে চলিয়া থাকেন। নবদ্বীপদাদার উপর তাঁহাদের এতই আন্তরিক টান যে বরং বাবাজী মহাশয়ের কোনও কথা তাঁহারা অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু নবদ্বীপদাদা যাহা করিতে বলিবেন, তাহা প্রাণপণে আচরণ করিবেন। তাঁহারা নবদ্বীপদাদাকে না পাইয়া সর্ব্বদা দুঃখিত। কোনও দিন দাদা আসিলে সকলেই ঘেরিয়া বসিয়া নানারূপ প্রাণের দুঃখ জানাইতে থাকেন এবং বলেন, "দাদা! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন?" নবদ্বীপদাদা হাসিতে হাসিতে বলেন, "হাঁরে আমি তোদের ছাড়ি নাই বা ছাড়িতে পারিবও না। তবে তোদের গুরুদেব এ জন্মের মত আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।" বাবাজী মহাশয় এবং নবদ্বীপদাদা এই উভয়ের মধ্যে কাহারও অভিমান হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মানসূচক ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "কি রকম বাবাজী মহারাজ! কেমন আছেন? ভজন সাধন বেশ চলিতেছে ত?" অপরে বলিলেন, "আজ্ঞে আপনার কৃপায়

এক প্রকার চলিতেছে, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনাদের পাদপদ্মে মতি থাকে।" ইত্যাদি। সম্প্রতি এই অভিমানের কারণ যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। তবে মোটামুটি যতটা অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই অভিমানের সূত্র রায় বাহাদুর প্রসন্নবাবুর বাগান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

অভিমানের মূলসূত্র গুরুতত্ত্ব লইয়া। নবদ্বীপদাদা বলেন, "নিতাই-গৌরাঙ্গ মিলিত-তনু শ্রীগুরুদেব। গুরুতত্ত্ব সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। গুরুপূজা হইলেই সকলের পূজা হইল। গুরুদেবের সন্তোষে সকলের সন্তোষ। কৃষ্ণে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন! গুরুসেবা করিলেই সকলের সেবা করা হইল। গুরুর নাম জপ করিলেই সকল নাম করা হইল।" ইত্যাদি। বাবাজী মহাশয় বলেন, "যদিও তত্ত্বতঃ গুরুতত্ত্বে এবং ভগবৎ-তত্ত্বে অভেদ একথা সুসত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রভেদ না রাখিলে উচ্ছৃঙ্খলতা হইয়া থাকে। প্রকাশমান বস্তুমাত্রই দৃষ্টাংশে এবং তত্ত্বাংশে ভেদাভেদ প্রকাশ স্বীকার না করিলে ধর্ম্মবিপ্লব বা শাস্ত্রের অপলাপ করা হয়। গুরুতত্ত্ব প্রচারের তত্ত্ব নহে। গুরুতত্ত্ব নিজনিজ ভাবানুসারে আস্বাদ্য। ভগবৎ-তত্ত্ব বরং সহজে অনুভবগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু গুরুতত্ত্বে বিশ্বাস হওয়া সহজ নহে। গুরুতত্ত্ব অতীব কঠিন তত্ত্ব। তাই জীব যাহাতে সহজে গুরুতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেই উপদেশ করিয়াছেন, যথা—অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ গুরুরূপা সখীর বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে, চামরের বাতাস করিব ইত্যাদি। গুরুকে ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়কারীভাবে রাখিয়া যত সহজে উপাসনা চলিতে পারে, সাক্ষাৎ বুদ্ধিতে তত সহজে হইতে পারে না। অন্তরে ভাব বা বিশ্বাস না জন্মিলে দেখাদেখি বা অনুরোধে আচরণ করিতে গিয়া সেই পথকে কলঙ্কিত করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। আজ কাল অনেক স্থানে দেখা যায় শব্দগত উপাসনা অর্থাৎ কতকগুলি বড় বড় কথা মুখস্থ করিয়া, সেই ভাবে চলিতে

পারুক আর নাই পারুক, সেই পথের পথিক বলিয়া অন্ততঃ লোকের নিকট পরিচয় দেওয়া চাই ; সুতরাং পথভ্রষ্ট হইয়া যায়।”

নবদ্বীপদাদা বলেন,— “তবে কি ‘আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥’ ‘গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু-র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।’ ‘ন গুরোরধিকং কিঞ্চিৎ’ ইত্যাদি বাক্যকে মিথ্যা বলিতে হইবে ? গুরুকে ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায় বলিয়া যে তাঁহাকে ভক্তি-বিশ্বাস করা, তাহার নাম মারফতদারী ভক্তি ; অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার অভীষ্ট বস্তু লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই গুরুভক্তি। ইহাকে ভক্তি না বলিলেও কোন দোষ হইতে পারে না।” উত্তরে বাবাজী মহাশয় বলেন যে, “গুরুতত্ত্ব এবং ভগবৎ-তত্ত্ব যে অভেদ, একথা আমি অস্বীকার করিতেছি না বা যাঁহারা সেই ভাবে উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অধিকারিভেদে আচরণ করা দরকার ; কারণ মহাজনগণ বলিয়াছেন— ‘অধিকারী নহে চায় ভাব আচরিতে। অল্পকালে বিনাশ হয় হাসিতে খেলিতে।’ ইত্যাদি। কলির জীব কোমলশ্রদ্ধ এবং অবিশ্বাসী। আজ পর্য্যন্ত রাধাগোবিন্দ বা নিতাই-গৌরকেই জগতের লোক মানিতে চায় না। ইহার পর যদি আবার নিজ নিজ গুরুকে অবতার খাড়া করা হয়, তবে জগতের উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করা হইবে না কি ? এসব প্রচার করা কখনই উচিত নহে।” মোট কথা নবদ্বীপদাদার ইচ্ছা, যেরূপ রাধাগোবিন্দ-মিলিত-বপু শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং বলরাম অনঙ্গমঞ্জরী-মিলিত-বপু নিত্যানন্দ প্রভু, সেইরূপ নিতাই-গৌরাঙ্গ-মিলিত-বপু বাবাজী মহাশয়, এই কথা সাধারণে প্রকাশ করা এবং সেইভাবে আচরণ করা। কিন্তু বাবাজী মহাশয় ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। উভয়ের বাহ্যিক মনোমালিন্যের প্রধান কারণ এই। এই লইয়াই উভয়ের বাদানুবাদ— এই লইয়াই উভয়ের মতভেদ।

ইতিপূর্ব্বে একদিন বাবাজী মহাশয় প্রসন্নকুমার রায়বাহাদুরের বাগানে

বসিয়া আছেন, কোনই কথাবার্ত্তা নাই, হঠাৎ ঠিক বালকের ন্যায় কেবল কাঁদিতেছেন। সঙ্গিগণ অনেক প্রকার অনুসন্ধানেও কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারায় অগত্যা বিশেষ জেদ করিয়া বাবাজী মহাশয়কে অকস্মাৎ ঐরূপ বিষাদের কারণ-জিজ্ঞাসা করাতে ইনি বলিলেন— "যে সমস্ত স্বতন্ত্রতার জন্য আমি সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও ভবেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিলাম, আবার, সেইরূপ স্বতন্ত্রতা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের কথা মনে হইলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে ; তাহারা এক একজন মহামহাশক্তি ধারণ করিত। তাহাদের সহিত তুলনায় বর্ত্তমানসঙ্গীদিগকে যেন শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় বোধ হয়।" এই পরম ভাগ্যবান সুরেন, ভবেন ও দেবেনের কথা প্রায়ই বাবাজী মহাশয়ের মুখে শুনা যাইত। ইহাতে অনুমান হয় এই মতভেদ লইয়া বহুদিন হইতেই ইঁহাদের বাদানুবাদ চলিতেছিল। সম্প্রতি যেন নবদ্বীপদাদার নিজ মত সংস্থাপনের ইচ্ছাটা একটু প্রবল হইয়া পড়িল। কাজেই দাদা ভাইয়ে কথাবার্ত্তা নাই। ইঁহাদের পরস্পরের এই ভাবটি সঙ্গিগণকে বড়ই ব্যথা দিতে লাগিল। সঙ্গিগণ একবার বাবাজী মহাশয়কে বলিতেছেন, "আমাদের দাদাকে ভাল করিয়া দিন।" আবার নবদ্বীপদাদাকে বলিতেছেন, "দাদা! আপনার পায়ে পড়ি, আপনি বাবাজী মহাশয়ের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করুন।" উত্তরে বাবাজী মহাশয় বলেন, "আমি কি করিব? যে নবদ্বীপ আমার সুখে সুখী ছিল, সে আজ আত্মসুখী হইয়াছে, অর্থাৎ এখন তার ইচ্ছা যে আমাকে একটা অবতার খাড়া করে ; সুতরাং আমার সে নবদ্বীপ নাই।" আবার নবদ্বীপদাদা বলেন, "আমি কি করিব? যে দাদা আমাদের রসময় বিগ্রহ, পরমকরুণ, কোমলহৃদয়, বালকবৎ সর্ব্বদা আনন্দময় ছিল, সে আজ মহাগম্ভীর, মর্য্যাদা-বিধি-নিষ্ঠা-পরায়ণ পুরুষ, পরম বৈষ্ণব হইয়াছে ; কাজেই এখন আর আমার সে দাদা নাই। এখন সে গৌরহরিদাস মহান্তের চেলা যাদবদাস বাবাজী।"

এইরূপে কয়েক দিন যায়, একদিন রামদাদা, পুলিনদাদা, নিত্যস্বরূপ

ব্রহ্মচারী, ললিতাদাসী প্রভৃতি কয়েকজনে পরামর্শ করিলেন যে, বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ জেদ করিয়া ধরিলে বোধ হয় অবশ্য ইহার প্রতিকার হইতে পারে। তখন রামদাদা বলিলেন, "দেখ আমি মুখে কিছুই বলিতে পারিব না। তবে যদি আমাকেই বলিতে হয়, আমি গানের দ্বারা বলিতে পারি।" সকলেরই সেই যুক্তি স্থির হইল। বেলা অনুমান সাতটার সময় ইঁহারা কয়েক জন মাত্র বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসিয়া ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। সকলেই নীরব নিস্তব্ধ! এই সময় রামদাদা কাতরকণ্ঠে আর্ত্তস্বরে গান ধরিলেন—

"নবা কি তোর কেউ নয়রে চরণ।
একদিন নব অনুরাগে, বাড়ালে সোহাগে,
এখন কেন ভিন্ বাস হে এমন ॥"
(ঠিক যেন পরের মতন)
(তোমার ভাব কিছু বুঝিতে নারি)
(আমরা যে আর সইতে নারি)
(মরি মরি প্রাণে মরি)" ইত্যাদি।

চোখের জলে সকলের মুখবুক ভাসিয়া যাইতেছে। এক একবার রামদাদার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। হঠাৎ একেবারে অধৈর্য্যভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এতক্ষণে বাবাজী মহাশয়ের হৃদয় দ্রবিল— চোখে জল আসিল— গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা আমায় কি করিতে হইবে বল।"

পুলিন। আজ্ঞে আদেশ করুন, নবদ্বীপদাদাকে লইয়া আসি।

বাবাজী। সে কি এ স্থানে আছে?

পুলিন। আজ্ঞে না, তিনি আমাদের বাড়ীতে আছেন।

বাবাজী। সে ত অনেক দূর।

পুলিন। আজ্ঞে না, আমি গাড়ী করিয়া এখনই লইয়া আসিব।

বাবাজী। কর যাহা তোমাদের ইচ্ছা। আমার কোনই আপত্তি নাই।

তখন পুলিনদাদা এবং নিত্যস্বরূপ অতিদ্রুত গতি একখানা গাড়ী করিয়া নবদ্বীপদাদাকে আনিতে গেলেন।

নবদ্বীপদাদা প্রথমে আপত্তি করিলেন, পরে ইঁহারা বিশেষ জেদ করিলে বলিলেন, "চল যাইব বটে কিন্তু বিপরীত ফল হইবে।" বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সঙ্গিগণের মনে কতই আশার সঞ্চার হইতেছে। বহুদিন পরে আজ তাহাদের দুইটী প্রাণ একত্র হইবে, কতই না আনন্দ হইবে ইত্যাদি সংকল্প বিকল্প হইতেছে, এইসময় পুলিনদাদা, নিত্যস্বরূপ ও কুঞ্জবাবু নবদ্বীপদাদাকে সঙ্গে করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই নবদ্বীপদাদা প্রণাম করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও প্রতিপ্রণাম করিলেন। প্রেমের স্বাভাবিক স্বভাবই বক্র। উভয়েই নীরব। উপস্থিত সকলে একবার নবদ্বীপদাদার মুখপানে তাকাইতেছেন, আর একবার বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইতেছেন; কিন্তু কেহই কিছু বলিতে সাহস পাইতেছেন না— সকলেই নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় একটু উদাসভাবে বলিলেন, "আমার নিকটে তোমার কিছু বলিবার আছে কি?"

নবদ্বীপ। আপনি সম্প্রতি যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, এই ভাবের মূর্ত্তির সঙ্গে আমার কোনও কথা বা ব্যবহার নাই। আমি যে রসময় বিগ্রহের নিকটে বিক্রীত হইয়াছি, তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ। যখন আপনাতে তিনি অবস্থান করিবেন, তখন আমার যাহা কিছু বলিবার হয় বলিব।

বাবাজী। আমি ত জানি না আমি এখন কিরূপ আছি। মোট কথা— সম্প্রতি আমার সহিত তোমার কোন কথাবার্ত্তার প্রয়োজন আছে কি?

নবদ্বীপ। কিছুই নয়, তবে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি যাঁহার চরণে মাথা বিক্রি করিয়াছি, তাঁহাতে রতিমতি থাকে।

তখন রামদাদা, নিত্যস্বরূপ, পুলিন প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন,— "কেমন তোমরা আর আমায় কি করিতে বল?" সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপদাদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি আর কি বলিব? যখন আমার এই দেহের সহিত তোমার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, তখন আর আমার সহিত এ দেহে তোমার দেখা শুনা হইবে না। তোমার যে স্থানে থাকিয়া যাহা করিতে ভাল লাগে, তাহাই করিতে পার।" নবদ্বীপদাদা 'যে আজ্ঞে' বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সে স্থান হইতে নীচের তলায় গিয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ অনেকেই নবদ্বীপদাদার কাছে বসিলেন। তাঁহার কিন্তু সমান অবস্থা; কোনই বিষাদ নাই। সঙ্গিগণের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ আনন্দময় ব্যবহার করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় নীচে আসিতেছেন জানিতে পারিয়া নবদ্বীপদাদা বলিলেন, "দাদা বলিয়াছে এ জন্মে আর আমার সহিত দেখা হইবে না; অতএব এস্থানে আর অধিক সময় থাকা উচিত নয়, কারণ যদি অনবধানতা বশতঃ চোখে পড়িয়া যায়, তবে তাহার কথা মিথ্যা হইবে; সুতরাং আমি চলিলাম।" বলিতে বলিতে দ্রুতগতি চলিয়া গেলেন।

উপস্থিত ব্যাপারে আমরা কি বুঝিলাম? যে নবদ্বীপদাদা এবং বাবাজী মহাশয় এক আত্মা, এক মুহূর্ত্তের জন্য পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইলে উভয়ে ব্যাকুল, যে নবদ্বীপদাদা দাদা বলিতে অজ্ঞান, দাদার সুখের জন্য ত্রিজগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন— এমন কি, দাদাকে ছাড়িয়া নিতাই-গৌর রাধাকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত যিনি প্রার্থনা করেন না, তিনি আজ ঐরূপ বজ্রাদপি কঠোর বাক্যে বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ নন! পাছে দাদার বাক্য অসত্য হয় কিংবা দাদার মনে কষ্ট হয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি নিজে

স্থানান্তরিত হইলেন। এই অমানুষিক ব্যাপার লইয়া আমাদের সমালোচনা করা সম্পূর্ণ ভুল বই আর কিছুই নহে। ইঁহাদের মধ্যে একের নিন্দা অপরের প্রশংসা করিলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। এই উভয়ের বাহ্যিক ব্যবহার এইরূপ হইবার কারণ— আমাদের বিশ্বাস, একমাত্র, লোকশিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নবদ্বীপদাদা নিরপেক্ষভাবে চলিতে চাহেন। তিনি বলেন, "অন্যাপেক্ষা হইলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে। আমার মনে যেটী ভাল বুঝিব বা যেরূপ ভাবে চলিলে আমার ভক্তিপথের উন্নতি হয়, আমি সেইরূপভাবে চলিব। সে বিষয়ে লোকের কথা শুনিতে যাইব কেন? লোকে মন্দ বলে বলুক, লোকে আমায় ঘৃণা করে করুক, আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিব বা বুঝিব তাহা কেন আচরণ করিব না?" বাবাজী মহাশয় বলেন, "মহাপ্রভু পর্য্যন্ত লোকাপেক্ষা করিয়াছেন, আমরা কোন্ ছার। "ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু স্থাপেন সর্ব্ব ধর্ম্ম। লোকশিক্ষা হেতু কভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম।" অন্যত্র মহাপ্রভু নিতাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"লোকাপেক্ষা ছাড় তুমি কৃষ্ণকৃপা হইতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে॥"

জোর করিয়া লোকাপেক্ষা ছাড়া মহতের কার্য্য নহে। তবে আপনা-আপনি যেটা ছাড়িয়া যায় যাক্। যিনি ভক্তিপথের পথিক হইবেন, তিনি প্রথম হইতেই মনে মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া রাখিবেন যে— "আমি কায়-মনোবাক্যে কাহাকেও উদ্বেগ দিব না। আমার কোনওরূপ ব্যবহারে যেন কেহ কষ্ট না পান। আমি সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিব" ইত্যাদি। যদি প্রথম হইতেই সংকল্প হইল যে আমি লোকাপেক্ষা রাখিব না, তবে আর তন্ময়তা আসিল কৈ? এই কারণেই মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের কথাবার্ত্তায় বা ব্যবহারে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্যই অভিন্নকলেবর প্রিয় পার্ষদ নবদ্বীপদাদার উপর এইরূপ কঠোর ব্যবহার।

তিনিও তাহাই বুঝিতে পারিয়া অবনতমস্তকে দাদার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি চেষ্টা করিলেই বাবাজী মহাশয়ের মন পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করিলেন না। বাবাজী মহাশয় কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া সদলে নবদ্বীপ যাইবার কয়েক দিন পরে নবদ্বীপদাদা নবদ্বীপে গেলেন; কিন্তু তখন ইনি সগণে নবদ্বীপ পরিক্রমায় বাহির হইয়া গিয়াছেন; সুতরাং নবদ্বীপদাদা ইঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করতঃ শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। জানি না প্রভুর কি ইচ্ছা! প্রায় দুইমাস কাল পরে নবদ্বীপ-দাদার শরীর অসুস্থ হইল। কিন্তু কি অপূর্ব্ব শক্তি! শয়নে স্বপনে একমাত্র দাদা ছাড়া অন্য বুলি ছিল না। এক একদিন নিজের শুশ্রূষাকারীদিগকে বলিতেন, "তোরা তাড়াতাড়ি মিশ্রিত সরবত করিয়াদে, ঐ যে দাদা আমাকে দেখিতে আসিতেছে। বড়ই গরম! কষ্ট হইবে।" বলিয়া মিশ্রির সরবত খাওয়াইতেন। এমন কি কোন কোন দিন এক একজনকে প্রত্যক্ষভাবে পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন। এইরূপে কয়েকদিন থাকিয়া জগতে শ্রীগুরুদেবের প্রতি বিশুদ্ধ মাধুর্য্য ভাবের আদর্শ দেখাইয়া রথদ্বিতীয়ার দুইদিন পূর্ব্বে অমাবস্যার দিন সকলকে বলিলেন, "আমাকে ভ্রমর ঘাটের উপরে লইয়া চল, আমি যমুনা মাইকে দর্শন করিব।" সকলে তাহাই করিলে তখন করযোড়ে শ্রীযমুনাকে প্রণাম বন্দনা করতঃ নাম করিতে করিতে আমাদের প্রাকৃত চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে অবিচ্ছেদে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু উপভোগ করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপদাদার অলৌকিকী শক্তি ও অভাবনীয় কার্য্যকলাপ দর্শনে বৃন্দাবনবাসী অনেক লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উঁহার বিরহ যেন তাঁহাদের অসহ্য হইয়া পড়িল। সকলেই হা হুতাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,— "হায়রে! আমরা এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ পাইয়া নিজ ব্যবহার বা বুদ্ধির দোষে অতি অল্পদিনেই বঞ্চিত হইলাম। যতদিন পর্য্যন্ত ইনি বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন, ততদিন যেন বাবাজী মহাশয় সর্ব্বদার তরে এস্থানে উপস্থিত ছিলেন। আজ আমরা একজনের

জন্য দুইজনের বিরহজ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছি।" যাঁহারা নবদ্বীপদাদার সহিত অন্ততঃ দুই একদিন সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করিবেন যে, নবদ্বীপদাদাকে পাইবামাত্র সকল অভাব মিটিয়া যাইত। এমন কি বাবাজী মহাশয়ের বিরহে একজন হয় ত খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন— আহার নিদ্রা বন্ধ, কেবল অনবরত কান্নাকাটি করিতেছেন, বাবাজী মহাশয়ের কোনও গণকে দেখিলে তাঁহার বিরহজ্বালা আরও দ্বিগুণতর প্রবল হইতেছে ; কিন্তু যেমন নবদ্বীপদাদার দর্শন পাইলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আর তাঁহার হৃদয়ে বাবাজী মহাশয়ের বিরহ নাই। হায় হায়! আজ এ হেন মহারত্ন প্রাকৃত চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত! ইহা অপেক্ষা আমাদের পক্ষে আর দুর্দ্দৈবের কথা কি আছে? আমাদের অযত্ন বা অনবধানতা বশতঃই বুঝি তিনি আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতে ইচ্ছা করিলেন।

———

অমৃতবাবুর কাহিনী *

তিনি লিখিয়াছেন ঃ— আমার নাম অমৃতলাল মিত্র। বহুদিন হইতে আমরা কলিকাতায় বাস করিতেছি। যখন প্লেগ উপলক্ষ্যে কলিকাতায় মহাসংকীর্ত্তন হয়, তখন দর্জ্জিপাড়ায় শ্রীদাম মুদীর লেনে সন্ধ্যার পর নগর-কীর্ত্তন হইতেছিল। যদিও সে সময় নানারূপ ভাবের গায়কগণ কলিকাতার প্রতি গলিতে গলিতে নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন, কিন্তু এরূপ মনপ্রাণ-মাতান, হৃদয়-গলান, সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক অপূর্ব্ব কীর্ত্তন আর কোথাও শুনি নাই। কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ঘোর পাষণ্ড, মদ্যপায়ী, অসৎ ব্যক্তিও দূর হইতে নামের ধ্বনি শুনিয়া চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় গিয়া সেই মহাসংকীর্ত্তনে যোগ

* এই ঘটনাটী দর্জ্জিপাড়া-নিবাসী অমৃতবাবুর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

দিতেছে। এই সংকীর্ত্তনের নেতা শ্রীধাম পুরীর বড় বাবাজী মহাশয়। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ কলেবরখানি অশ্রুকম্প পুলক স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভূষণে বিভূষিত। বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সুমধুর নৃত্য করিতেছেন এবং গগনভেদী কণ্ঠধ্বনিতে দিক্‌সকল মুখরিত করিতেছেন। সংকীর্ত্তন ক্রমে বাবু রামানন্দ পাল মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিল। লোকে লোকারণ্য। অনেক কৃতবিদ্য যুবকগণ ঠিক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিভোর ভাবে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। সকলেই বাহ্যদৃষ্টি রহিত, সকলেই প্রেমানন্দসাগরে নিমগ্ন। জানি না ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা! এই সময়ে সকলের অজ্ঞাতসারে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহাশয় হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই সকলের বাহ্যদৃষ্টি আসিল, প্রাণে যেন কি একটা অভাব বোধ হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিলেন বাবাজী মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন। যুবকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সংকীর্ত্তনে এরূপ ভাবে নৃত্য ত আমরা কখনও করি নাই। আমরা যাঁহার শক্তিতে এই অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করিলাম, সেই মহাপুরুষ কোথায় চলিয়া গেলেন? আমাদের কি দুর্দ্দৈব! আমাদের ভাগ্যে আর কি তাঁহার দর্শন ঘটিবে না!" বলিয়া অতি ব্যাকুলভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। আমি কিন্তু সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতেই ইঁহার দর্শন লালসায় উৎকণ্ঠিত।

পরদিন সন্ধ্যার সময় ইনি শ্রীযুক্ত মুকুন্দ ঘোষ মহাশয়ের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে দর্জ্জিপাড়ার অনাথনাথ দেবের লেনে শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আমরা কয়েকজন সেস্থানে উপস্থিত ছিলাম, আমার ত আর আনন্দের সীমা রহিল না। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া মুকুন্দ ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাসায় গমন করিলেন। আমাদিগকে প্রতি রাত্রে ঐ যোগেন্দ্র বাবুর

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা এবং হাটপত্তন পাঠ ও কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। আমরাও দিবসে নানারূপ বিষয়কার্য্য করতঃ ইঁহার আদেশ অনুযায়ী রাত্রি প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত পরমানন্দে সংকীর্ত্তন করিয়া থাকি।

এইরূপ ভাবে কয়েক বৎসর যায়, একদিন পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের পাট-বাড়ীর অধিকারী শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, বাবাজী মহাশয় সদল-বলে এঁড়েদহ প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রায়বাহাদুরের বাগানবাড়ী আসিয়াছেন। শুনিয়া একদিন দর্শন করিতে গেলাম। সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে! রামদাদা প্রভৃতি অন্যান্য সকলে গঙ্গাতীরে "নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই, অনঙ্গ কানাই রাই ॥" এই নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় আমাদিগকে লইয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রায় তিন ঘণ্টা সময় গ্রহণ স্থিতি ছিল, ঐ সময় পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া গ্রহণ মুক্তির পর পুষ্করিণী হইতে একটু জল আনিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গে শান্তি-জলরূপে ছিটাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা বাসায় যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ, তোমরা এত রাত্রে বাসায় গেলে রাস্তায় বড়ই কষ্ট পাইবে; অতএব আজ এইখানেই থাক, কল্য ঠাকুরের মহাপ্রসাদ পাইয়া এই স্থান হইতেই আফিসে যাইবে।" আমরা তাঁহার কথা না শুনিয়া মোহবশে সেই রাত্রেই রওনা হইলাম বটে; কিন্তু গাড়ী না পাওয়ায় সমস্ত রাত্রি হাঁটিয়া শেষ রাত্রে বাসায় পৌঁছিলাম এবং বাবাজী মহাশয়ের অন্তর্য্যামিত্ব-শক্তি লইয়া সমালোচনা করিতে লাগিলাম।

কয়েক দিন পরে বাবাজী মহাশয় দর্জ্জিপাড়ার অনাথনাথ দেবের লেনে উক্ত অনাথ বাবুদেরই একটী দোতলা বাড়ীতে যোগেন বাবুর বিশেষ আগ্রহে সদলে কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে নানারূপ

ভাবের ভক্তসমাগম হইতে লাগিল। প্রতিদিনই নূতন নূতন ভাবে আনন্দ হইতে লাগিল। শ্রীপাট খড়দহ-নিবাসী শশিভূষণ ঘোষ মহাশয় আমার মুখে বাবাজী মহাশয়ের গুণগান শুনিয়া প্রায়ই ইঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। একদিন সন্ধ্যার পরে বাবাজী মহাশয় শীতল ভোগ প্রসাদ পাইতে পাইতে বলিলেন, "দেখ, এই রসগোল্লা নবীন ময়রার তৈয়ারী নয় কি ?" প্রকৃতই নবীন ময়রার দোকানের রসগোল্লা জানিতে পারিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। শশী বাবুকে বলিলেন—"কেমন শশী, তোমার নিতাই গৌরকে বেশ ভাল লাগে নাকি ?" শশী বলিল— "আজ্ঞে যথার্থই আমার নিতাই গৌরকে ভাল লাগে— সংকীর্ত্তনে নিতাই গৌর নামে যত আনন্দ হয়, এত আনন্দ আর কিছুতেই হয় না।"

বাবাজী। এই আনন্দ স্থায়ী করিবার জন্যই সাধন ভজনের প্রয়োজন।

শশী। আজ্ঞে, আমরা কলিহত দুর্ব্বল জীব ; আমাদের সাধনভজন করিবার ত কোনই ক্ষমতা নাই ; অতএব আমাদের উপায় কি ?

বাবাজী। বাবা, আমরা যেমন কলিহত দুর্ব্বল জীব, তেমনই আমাদের পরম দয়াল প্রভু সুগম উপায় বিধান করিয়াছেন। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ॥" আর কি চাই বল ? যেমন তেমন করিয়া একবার নাম করিতে পারিলেই সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হইবে। আবার কেমন বিধান দেখ, বলিয়াছেন, "শুদ্ধং যদ্যপ্যশুদ্ধং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং ॥" "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি" ইত্যাদি। এমন দয়াল প্রভু কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে তবুও অশ্রদ্ধা, নিজে ত উচ্চারণ করিবই না, আবার কেহ যদি করিতে চায় তাহাকেও বাধা দিব।

এইরূপে নানা ভাবের উপদেশ প্রদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। একদিন আমাকে বলিলেন, "অমৃত ! তুমি কাল ক্ষৌর হইয়া আসিবে।" আমি পর দিবস তাহাই করিলাম। আসিয়া

বাবাজী মহাশয়কে যেমন প্রণাম করিলাম, অমনি ললিতাদিদিকে বলিলেন—"অমৃতকে মালাতিলক দিয়া ভালরূপে সাজাইয়া দাও ত।" ললিতাদিদিও বাবাজী মহাশয়ের প্রসাদী মালা এবং তিলকাদি দ্বারা আমাকে সাজাইয়া দিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "একখানি আয়না দিয়া দেখ দেখি তোমার কেমন শোভা হইয়াছে!" আমি কাতরকণ্ঠে বলিলাম, "সকলই আপনার কৃপা।" তখন সকলকে সেই ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া অযাচিতকৃপাকারী প্রভু, আমার কর্ণে মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপ তাপ দূর করতঃ চির জীবনের মত আমায় অঙ্গীকার করিলেন। সেই অপ্রাকৃত প্রেমালিঙ্গন প্রাপ্তে আমার বোধ হইতে লাগিল যেন সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ-প্রবাহ প্রবেশ করিয়া প্রতি ধমনীতে ধমনীতে ছুটিতে লাগিল।

অনাথ বাবুদের এই বাড়ীটীর একটা তুর্নাম ছিল। লোকে বলিত এই বাড়ীতে কোন অপদেবতা আশ্রয় করিয়াছে, কারণ যে ব্যক্তি এই বাড়ী ভাড়া লয়েন, হয় তিনি না হয় তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ না কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। পাছে ভূতুড়ে অপবাদে এই বাড়ীটী পতিত হইয়া থাকে, এই ভয়ে বাড়ীর মালিক যোগেন বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া বাবাজী মহাশয়কে ঐ বাড়ীতে রাখিলেন! বাবাজী মহাশয় কিন্তু এ কথা অবগত ছিলেন না। একদিন হঠাৎ বলিলেন—"দেখ, এই বাড়ীতে তুইটী অপদেবতা আছেন, তাঁহারা আমাকে দেখা দিলেন। আমি বলিলাম —'আপনারা এখানে থাকেন কেন? এখানে কীর্ত্তনাদি হয়; আপনাদিগকে দেখিলে লোকে ভয় পাইবে; অতএব আপনারা এখান হইতে চলিয়া যান।' তাঁহারা বলিলেন—'বাবা! আমরা সংকীর্ত্তন বড়ই ভালবাসি, সংকীর্ত্তন শুনিয়া আমরা উদ্ধার পাইব। আর কয়েকটী দিন আমাদিগকে থাকিতে দিন, আমরা যে দিন যাইব আপনার সহিত দেখা করিয়া যাইব।' তখন আমি বলিলাম—'দেখুন, যেন কেহ আপনাদিগকে দেখিয়া কোনও রূপ ভয়

না পায় এবং যেদিন যাইবেন কোনও একটা চিহ্ন রাখিয়া যাইবেন।" যথার্থই একদিন খুব মাতামাতি সংকীর্ত্তন হইয়া গেল। হঠাৎ একটা নূতন ঘরের মেজে মাঝামাঝি ফাটিয়া গেল। সকলেই বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলিলেন—"দেখ সেই যে অপদেবতা দুইজন ছিলেন, তাঁহারা আজ চলিয়া গেলেন। এই ঘরে ছিলেন তাই চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। আজ হইতে এ বাড়ী নির্ভয় হইল।"

বাবাজী মহাশয়ের দর্জ্জিপাড়া অবস্থানকালে মহাতেজঃপুঞ্জশালিনী, বর্ষীয়সী, পরম সাধিকা, একটী তপস্বিনী ব্রাহ্মণী প্রায়ই ইঁহার নিকট আসিতেন। আমরা উঁহাকে **যোগিনী মাই** বলিয়া ডাকিতাম। আমাদের হরিসভায় এবং পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের নিকট যাতাযাত করিয়া ইনি সকলকেই নানারূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। একদিন বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন —"বাবা! তুমি নাকি নবদ্বীপকে ত্যাগ করিয়াছ? নবদ্বীপ যে সে লোক নহে; ও পরম শক্তিমান্ এবং গুরুনিষ্ঠ ভক্ত।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন— "না মা! আমি কখনও নবদ্বীপকে পরিত্যাগ করিতে পারি কি? নবদ্বীপ আমার প্রাণ; কলির জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া নবদ্বীপের যত প্রাণ কাঁদে এবং উদ্ধারকল্পে নবদ্বীপ যত কাতরপ্রাণে চেষ্টা করে এমন হওয়া অসম্ভব। তবে সে আমার রুচি-বিগর্হিত কোন একটি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল, তাই শাসনের জন্য তাহাকে একটু তফাৎ করিয়াছি।" যোগিনী মা একদিন আমাদিগকে বলিলেন, "দেখ্, নবদ্বীপ শ্রীগুরুচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, শ্রীগুরুকৃপাবলে সে এরূপ শক্তি পাইয়াছে যে গুরুদেব কখন কোথায় থাকেন, কি করেন বা তাঁহার কি অভিপ্রায়, সে এক স্থানে বসিয়া ধ্যানে সমস্ত জানিতে পারে। নবদ্বীপ জিতেন্দ্রিয়, মহাতেজস্বী সাধক। শ্রীগুরুতত্ত্ব জানিতে হইলে নবদ্বীপের নিকট জানিবার দরকার। নবদ্বীপ একমাত্র গুরু ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তোরা কি করিলি? এমন দুইটী মহাপুরুষ তোদের নিকট সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, তোরা চিনিতে পারিলি

না! এই **চরণদাসকে** লোকে চিনিতে পারে না, এ যে **জাল চৈতন্য**; উহার স্পর্শে ঘোর পাষণ্ডও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যায়। সংকীর্ত্তনের সময় তোরা ওর অবস্থা দেখেছিস্ কি? উহার প্রতি লোমকূপ হইতে আমি রক্তোদ্গম হইতে দেখিয়াছি। এক এক সময় উহার দেহে মহাভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি! অমৃত! তোদের আর কি বলিব! একদিন পুরী ঝাঁজপীটা মঠে বসিয়া আছি। হঠাৎ বাবাজী আমার মুখে মহাপ্রসাদ দিতে আসিল। আমি তখন উহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে বলিলাম—'আমি এ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিব না। যে মহাপ্রসাদের এক কণিকা আস্বাদন করিয়া শিবদুর্গা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, এ যদি সেই মহাপ্রসাদ হয় তবে আমি গ্রহণ করিব।' বাবাজী তখন ছলছলনয়নে গদগদকণ্ঠে বলিল—'মা! এ সেই মহাপ্রসাদই বটে; আপনি একবার আস্বাদন করিলেই ইঁহার গুণ বুঝিতে পারিবেন।' বলিয়া আমার মুখে দিল। বলিতে কি মহাপ্রসাদ গ্রহণ মাত্র আমার এরূপ মত্ততা আসিল যে আমি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলাম। আজ পর্য্যন্ত আমার সেই কথা মনে পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আমি বহু পাহাড় পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া অনেক গোফাবাসী, জটাধারী, যোগী, ঋষি, সাধু সন্ন্যাসীদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ইহাকে পরীক্ষা করিতে গিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আজ পর্য্যন্ত এমন প্রেমিক মহাপুরুষ আমার চক্ষুগোচর হয় নাই। বহু সুকৃতিফলে যদি তোরা উহার কৃপা পাইয়াছিস্। সাবধান! বিশ্বাস কর্, অমূল্যরত্ন পাইয়া যত্ন করিতে শেখ্, সুখ পাইবি।" যথার্থই এমন অদোষদর্শী, পরম-দয়াল, পতিতপাবন প্রভু পাইয়া আমরা ধন্য হইলাম। অযাচিতভাবে করুণাময় কৃপা না করিলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশাই হইত বলা যায় না।

—

প্রভুপাদ নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামীর দর্শন

একদিন পূর্ব্বাহ্ণ সময় সংকীর্ত্তন হইতেছে, রামদাদা প্রভৃতি সকলেই মাতোয়ারা। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। হঠাৎ কি মনে হইল, সংকীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইয়াই গান ধরিলেন ঃ—

সকল জনার মন, করিবারে আকর্ষণ,
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ।
একবার যেই হেরে, সে মন ফিরাতে নারে,
মন উন্মাদন গোরাচাঁদ॥
হেরিয়ে গৌরাঙ্গ গতি, থুৎকৃত গজেন্দ্র গতি,
গজ সে সামান্য মদে মাতা।
গৌরাঙ্গ বদন হেরি, সকলঙ্ক চন্দ্রোপরি,
ঘৃণা করে সকল জনতা॥
গৌর কান্তি ঝল মল, তার আগে স্বর্ণাচল,
অচল সে তারে কি গণিব।
গৌরাঙ্গ মধুর বাণী, অমৃত তরঙ্গ জিনি,
পিলে মন করে পিব পিব॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥
আরে মোর গৌর-সুন্দর নটরাজ।
শ্রীল জগন্নাথ আগে, বাঢ়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি ভাব রত্নসাজ॥
বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।

এই সপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, আর দুই অনুভাব,
হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম্ম ॥
নবরত্ন অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে চমৎকার,
হেরি জগন্নাথ প্রমুদিত।
সে রস যে নিরখিল, সেহ সে রসে মাতিল,
মোর মন করে উন্মাদিত ॥
আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥

গানটী প্রভুপাদ নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামী মহাশয় রচিত— শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য স্তব-কল্প-বৃক্ষের অনুবাদ। পদটী শেষ হইতে না হইতেই বাবাজী মহাশয়ের মন যেন কেমন হইয়া গেল। যথাসময়ে সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া রামদাদাকে বলিলেন, "রাম! শ্রীনবদ্বীপচাঁদ প্রভুর দর্শনে যাইবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি বাড়ীতে আছেন কি না কাহারও দ্বারাই অনুসন্ধান কর ত?" শুনিয়া রামদাদা পরমানন্দিতচিত্তে নিজেই বেণেটোলায় গমনপূর্ব্বক প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করতঃ বাবাজী মহাশয়ের কথা নিবেদন করিলেন। শুনিবামাত্র প্রভুপাদ শশব্যস্তে বলিলেন— "বাবা! আজই যাহাতে বাবাজী মহাশয় এ স্থানে আসেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কিছুক্ষণপূর্ব্বেই তাঁহায় কথা স্মরণ হইয়াছিল। সে যে আমার "বড়দিদি"। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই মন যেন কোন আনন্দময় রাজ্যে চলিয়া যায়। তাঁহার

কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গিগুলি যেন অপ্রাকৃত চিন্ময়রাজ্যের বলিয়াই মনে হয়। আনন্দময় মূর্ত্তিখানি যে কত মধুর তাহা আর কি বলিব। একদিন শ্রীধাম নবদ্বীপে নগরকীর্ত্তনকালে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। সেইদিন হইতেই যেন আমার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে ধারণা হইয়াছে। যাহা হউক আজ তাঁহাকে আনা চাই।” ইত্যাদি নানারূপ নিজ মহত্ত্বের পরিচায়ক বাক্যদ্বারা আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদের আদেশানুক্রমে রামদাদা বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া যথাযথ সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। ইনিও প্রভুপাদের দর্শনের জন্য যোগেনবাবুকে ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলে তিনি তিনখানা গাড়ী আনাইলেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে সকলে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ॥” এই নাম করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিয়া রওনা হইলেন। যথাসময়ে গাড়ী আনিয়া বেণেটোলা সোনার গৌরাঙ্গের বাড়ীর দরজায় পঁহুছিল। ইঁহারা নাম করিতে করিতে উপর তলায় মহাপ্রভুর সম্মুখে গিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে একজন গিয়া প্রভুপাদকে সংবাদ দিলে তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখস্থ অঙ্গনের অপর পার্শ্বের ঘর হইতে “গৌর আমার সর্ব্বস্ব ধন গৌর মূলাধার। প্রাণ গৌর আমার প্রাণপতি গৌর আমার গলার হার॥” গগনভেদী ধ্বনিতে এই গানটী গাহিতে গাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি অপূর্ব্ব সম্মিলন, অপূর্ব্ব ভাব, অপরূপ আনন্দ! দর্শন পাইবামাত্র প্রেমগরগরভাবে যেমন বাবাজী মহাশয় দণ্ডবৎ করিতে গেলেন, অমনি প্রভুপাদ ইঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের সেই বিশাল দেহ দুইখানি অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক ভূষণে বিভূষিত হইতে লাগিল। উভয়েই নীরব, উভয়েই কি যেন কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু প্রেমে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ক্রমে আনন্দের মাত্রা যেন দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে প্রভুপাদ প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিলেন ঃ—“তুমি যে

আমার দিদি— আজ কয়েক দিন হইতেই তোমার জন্য মন কেমন করিতেছিল। মহাপ্রভু আজ মিলাইয়া দিলেন।"

বাবাজী। আজ্ঞে, আমি যে আপনার দাসী।

প্রভু। তুমিত দাসী আমিও দাসী। তুমি শ্রীরতি মঞ্জরীর দাসী, আমি অনঙ্গ মঞ্জরীর দাসী ; সুতরাং তুমি আমার বড় নও কি ?

বাবাজী। আজ্ঞে, আমি ত জানি আপনি সাক্ষাৎ অনঙ্গমঞ্জরী।

প্রভু। ভাই! সাক্ষাৎ অপেক্ষা দাসীর অধিকার ও আনন্দ অনেক বেশী ; সুতরাং আমার সেই অধিকার দূর করিয়া কি লাভ হইবে ? স্বয়ং যাঁহারা আছেন তাঁহারাই থাকুন। আমরা সকলেই তাঁহার কিঙ্করী। তোমার সহিত দেখা হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি তোমাকে **"বড়দিদি"** বলিয়া জানি।

বাবাজী মহাশয়ের মুখে আর কোনই কথা বাহির হইল না, কেবল দুইটী চোখের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রভুপাদ বাম হস্তখানি বাবাজী মহাশয়ের স্কন্ধদেশে স্থাপন পূর্ব্বক ভাবে বিভোর হইয়া গান ধরিলেন ঃ—

নবদ্বীপ নাগরী আগরী গোরা রসে।
কহিতে গৌরাঙ্গ কথা প্রেমজলে ভাসে॥
ভাব ভরে ভাবিনী পুলক ভরে ভোরা।
শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥
গোরা-রূপ-গুণ অবতংস পরে কাণে।
দিবানিশি গোরা বিনে অন্য নাহি জানে॥
গোরোচনা নিবিড় করিয়ে মাখে গায়।
যতন করিয়ে গোরা নাম লিখে তায়॥
প্রেমাবেশে প্রেমজল ঝরে দু'নয়নে!
তাহে অভিষিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দু'চরণে॥

গোরোচনা হরিদ্রার পুতলী করিয়া।
পূজয়ে চক্ষের জলে প্রেমফুল দিয়া ॥
পিরীতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বূল।
পরিচর্য্যা করে ভাব সময়ানুকূল ॥
অঙ্গকান্তি প্রদীপে করয়ে আরত্রিকে।
কঙ্কণ শবদ ঘণ্টা আনন্দ অধিকে ॥
অঙ্গ-গন্ধ ধূপ-ধূঁয়া বহে অনুরাগে।
পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে ॥
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল।
লোচন বলে এতদিনে জ্ঞান-শেল গেল ॥

প্রভুপাদ অগ্রে অগ্রে গাহিতেছেন, আর সকলে তাঁহার দোহারকী করিতেছেন! অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ! বাবাজী মহাশয় এবং প্রভুপাদ উভয়েই চরণে চরণ রাখিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখস্থ লম্বা বারান্দার এ পাশ হইতে অপর পাশ পর্য্যন্ত সুমধুর নৃত্য করিতেছেন। অতি মনোহর দৃশ্য! নৃত্যকালে মনে হইতেছে যেন উভয় মহাপুরুষের সেই বিশাল দেহ দুইটী কলের পুতুলের ন্যায় শূন্যে থাকিয়া নৃত্য করিতেছে বা কেহ সূত্রধর হইয়া সূত্রদ্বারা অতি দ্রুতগতি নৃত্য করাইতেছে। ঐ ভাবে আবার যখন ভ্রমণ করিতেছেন, তখন ঠিক যেন আলাত চক্রের ন্যায় পরস্পরকে চিনিবার সাধ্য হইতেছে না। উভয়ে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া, ললিতাদাসী, রাধাবিনোদিনীদাসী, কুসুমমঞ্জরীদাসী প্রভৃতি সখীগণের উপর নাচিবার আদেশ দিলেন। রাম-দাদা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাত্র অনুমান দশটা পর্য্যন্ত এইরূপ পরমানন্দে কাটিয়া গেল। সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেবার অনুরোধে অগত্যা কীর্ত্তন সমাপ্তি করা হইল।

প্রভুপাদের স্বাভাবিক নিয়ম— কেহই অগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারে না; চরণধূলি ত প্রায় কাহাকেও দেন না। আজ প্রেমের বন্যায়

বিধির বন্ধন টুটিয়া গেল। সখীগণ নৃত্য সমাপন করিয়াই প্রভুপাদের চরণ ধরিয়া দণ্ডবৎ করিল। প্রথম একটু আপত্তি করিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আজ্ঞে উহারা যে আপনার ; উহাদের মাথায় চরণ দিয়া কৃপা করুন, উহাদের উপাসনা এবং উদ্যম সফল হউক।" প্রভু একটু মৃদু হাসিয়া সখীগণকে বলিলেন—"হঁ্যারে! একদিন আমিও তোদের ন্যায় ঘাঘরী কাঁচুলি পরিয়া নৃত্য করিতাম। আমাকে দেখিয়া তোরা অত লজ্জা করিস কেন? আজ আমার সম্মুখে বসিয়া প্রসাদ পাইতে হইবে।" বলিয়া সকলের মস্তকে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। রামদাদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?" রামদাদা করযোড়ে বলিলেন—"আজ্ঞে, আমার নাম রামদাস।" প্রভুপাদ প্রেমার্দ্রহৃদয়ে রামদাদাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন—"আজ হইতে তোমার নাম রহিল নিত্যানন্দ রামদাস।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় **"জয় নিত্যানন্দ রাম"** বলিয়া হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুর আদেশে সকলে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। যথার্থই সখী কয়জনকে প্রভু নিজ সম্মুখে বসাইয়া মহাপ্রসাদ পাওয়াইলেন। উহাদিগের উপর প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপা দর্শনে সকলেই বিস্মিতভাবে উহাদের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ অতিশয় যত্নাগ্রহের সহিত বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলকে বার বার মহাপ্রসাদ দেওয়াইয়া স্নেহাতিশয্যে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে আচমনাদি করিয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

—ঃ*ঃ—

সদলে শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন

দিনের পর দিন যায়— কলিকাতায় নিত্য নূতন ভাবের আনন্দ চলিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখে অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন এবং তত্ত্ব-মীমাংসা শ্রবণ করিয়া নিত্যই নূতন নূতন লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। একদিন প্রভাতে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয় যোগেন বাবুকে বলিলেন, "দেখ যোগেন! শ্রীধাম নবদ্বীপ যাইবার জন্য আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।" শুনিয়া যোগেন বাবু এবং তাঁহার পুত্র যতীন নানারূপ ওজোর আপত্তি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না। সুতরাং অপরাহ্নে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া অগত্যা টিকিট করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। বাবাজী মহাশয় সকলকে নানারূপ সুমিষ্ট বাক্যে পরিতুষ্ট করত নাম করিতে করিতে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী বগুলা দিয়া হাসখালি প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করত যথাসময়ে কৃষ্ণনগর পৌঁছিল! রাত্রি অধিক হওয়ায় সেদিন আর শ্রীধামে যাওয়া হইল না। পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ উপস্থিত হইলেন। আনন্দধাম শ্রীনবদ্বীপধাম যেন আজ পূর্ণানন্দময় হইলেন। যাঁহার সহিত বাবাজী মহাশয়ের দেখা হইতেছে, তিনিই আত্মহারাভাবে ইঁহার সহিত নানারূপ ইষ্টালাপ করিতেছেন। ইঁহার মুখকমলটী সর্ব্বদাই প্রফুল্ল।

ইঁহার শ্রীগুরুদেব আশ্রমে উপস্থিত নাই। শ্রীগুরুদেবের মৈত্র শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দাস কর্ত্তাবাবাজী মহাশয়ের উপরেই আশ্রমের ঠাকুরসেবার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। মহাত্মা কর্ত্তাবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের পিতাপুত্র-সম্বন্ধ। উভয়ে প্রায় সর্ব্বদাই লীলাকথা আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাহির দরজার দুই পার্শ্বে দুইখানি টিনের ঘরেই সকলের থাকা হয়। প্রভাতে রামদাদা অন্যান্য সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া প্রভাতী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রথম প্রথম দুইচারি দিন

খোলা ভাবেই সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ক্রমে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ার দরুণ নানারূপ অসুবিধা বোধ করায় বাবাজী মহাশয় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। সেইরূপ ভাবেই সংকীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

একদিন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মহৎপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সান্ন্যাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণযুবক বড়ালঘাটের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় বৈঠকী গান বাজনায় বিশেষ পারদর্শী। প্রায় সর্ব্বদার তরেই তিনি যাত্রার দলে থাকেন। নবদ্বীপে মাতুলবাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন। সান্ন্যাল মহাশয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই খোল বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ তাহা নহে; তবে গানবাজানা হিসাবে যেমন কীর্ত্তনাদি করিতে হয় তাহাই করিয়া থাকেন। আজও সেই ভাবেই আসিয়াছিলেন; কিন্তু রামদাদার মুখে মনপ্রাণমাতান সংকীর্ত্তন শুনিয়া যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। খোল বাজাইতেছেন, আর অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতেছেন। অনুমান সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন সমাপ্তির পর রামদাদা এবং সান্ন্যাল মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। ইনি সান্ন্যাল মহাশয়কে দেখিবামাত্র অতিশয় প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলে তিনি তখন বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইনি নানারূপ মিষ্টবাক্যে উঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে, একবার মাত্র বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিয়া চলিয়া যাইবেন; কিন্তু তাহা হইল না। সৎসঙ্গপ্রভাবে হৃদয়ের কবাট সকল খুলিয়া গিয়াছিল। ইঁহার দর্শন পাইবামাত্র বিভোর হইয়া গেলেন; সুতরাং মনপ্রাণ সমস্ত চুরি হইয়া গেল। অবশেষে চিরজীবনের মত ইঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। আর বাড়ী যাওয়া হইল না! সান্ন্যাল মহাশয়ের বিশেষ আর্ত্তি

দেখিয়া অবকাশ মত বাবাজী মহাশয় উঁহাকে মন্ত্র প্রদান করিলেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলে হৃদয়-ক্ষেত্র স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়াছিল; বীজ পড়িবামাত্র নব অনুরাগের প্রাণে ভাব প্রেমের অঙ্কুরগুলি যেন শাখা পল্লব বিস্তার করিতে লাগিল। সান্ন্যাল মহাশয় আর সে সান্ন্যাল মহাশয় নাই। তিনি এখন দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি, গুরুপদৈকনিষ্ঠ পরম ভক্ত। সর্ব্বদা বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রামদাদার সহিত সংকীর্ত্তন-আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

—

কুঞ্জদাসের জীবন দান

নবদ্বীপ অবস্থান কালে বাবাজী মহাশয় নিজ সঙ্গিগণের উপর আদেশ করিয়াছেন যে, "কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবে না, কাহারও কোন দত্ত দ্রব্য আমার অজ্ঞাতসারে ভোজন করিবে না, রাত্রে কোন স্থানে বাহির হইবে না, দিবসে কোথাও যাইতে হইলে নাম করিতে করিতে যাইবে, বৈষ্ণব মাত্রকেই অভেদবুদ্ধিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে, ধামবাসী জীবের কোনও রূপ দোষানুসন্ধান না করিয়া নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানে ভক্তি করিবে, রজে চিন্ময় বিশ্বাস রাখিবে, শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের নিত্য বিহারভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপের যাবতীয় শ্রীমূর্ত্তি-সেবাকেই নিত্যসেবা মনে করিয়া ভক্তি করিবে, অনিবেদিত বস্তুমাত্র গ্রহণ করিবে না, ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করিবে, উপাসনা লইয়া কাহারও সহিত বাদানুবাদ করিবে না, ব্রজমণ্ডলের সহিত নবদ্বীপ মণ্ডলের অভিন্নত্ব হৃদয়ে দৃঢ় সংস্কারাবদ্ধ করিয়া রাখিবে।" ইত্যাদি।

সঙ্গিগণ সাধ্যানুসারে বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। একদিন অপরাহ্লে বাবাজী মহাশয় দর্শনে বাহির হইয়াছেন। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক অনুমান দুইসের রসগোল্লা আনিয়া তখনই ঠাকুরকে

ভোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কার্য্য করিলেই যে তাহার পরীক্ষা দিতে হইবে, সঙ্গিগণের মধ্যে কাহারই সে সময় এ খেয়াল হইল না। স্ত্রীলোকটীর আর্ত্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। রসগোল্লা ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে ললিতাদাসী, বাবাজী মহাশয় এবং ইঁহার সঙ্গে যে কয়েক জন আছেন, তাঁহাদের জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট সকলকে বাঁটিয়া দিতে লাগিলেন। কুঞ্জদাস বাবাজীর কি ঝোঁক হইল মঙ্গলময় প্রভুই জানেন! হাসিতে হাসিতে এক একজনের হাত হইতে জোর করিয়া রসগোল্লা খাইতে লাগিল। পশ্চাৎ বিচার না করিয়া এইরূপ আনন্দে মহাপ্রসাদ সেবা হইতেছে, এই সময় বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ এইরূপ আনন্দময় হুলুস্থুল ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কুঞ্জদাস অগ্রগামী হইয়া বলিল, "আজ্ঞে আজ রসগোল্লা পঙ্গত হইল, প্রায় কাহাকেও আমি খাইতে দেই নাই, সকলের হাত হইতে ছাড়াইয়া খাইয়াছি; তবে আপনাদের জন্য কিঞ্চিৎ আছে।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল?" ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে আরতি-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল; রাত্র অনুমান দশটা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

প্রভাত হইতে না হইতে কুঞ্জদাস বাবাজীর দাস্ত এবং বমি হইতে আরম্ভ হইল। বেলা অনুমান সাড়ে সাতটার সময়ই অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িল। বাবাজী মহাশয় একজন ডাক্তার ডাকাইলেন। ডাক্তার আসিয়াই বলিলেন, "রোগীর অবস্থা খারাপ, এ রোগীর রক্ষা পাওয়া কঠিন; কারণ আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যত কিছু উপসর্গ উপস্থিত হইবে। সম্ভব বেলা বারটার মধ্যে বিকার হইবে এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ যাইবে। আপনি আমাকে ঔষধ দিতে বলেন আমি দিতে পারি, কিন্তু কিছু ফল হইবে না।" তথাপি বাবাজী মহাশয় জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। শুশ্রূষার ব্যবস্থা

বিশেষ যত্নের সহিত করিতে বলায় বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে উহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিলেন। এদিকে মধুসূদনদাস প্রভৃতি কয়েক জনকে নাম করিতে আদেশ করিলে তাহারা নাম করিতে লাগিল। রোগীর অবস্থা ক্রমান্বয়ই খারাপ হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল, অনবরত ঘর্ম্ম হইতেছে, প্রতি শিরায় শিরায় এরূপ ভাবে খিল ধরিতেছে যে তিন চারিজনেও ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। দাস্ত বমি অনবরত হইতেছে, কিন্তু পেটফাঁপা আছে; হিক্কা, পিপাসা প্রভৃতি যে সমস্ত লক্ষণ কলেরা রোগীর পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ, সেগুলি সমস্তই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলেই কুঞ্জদাসের আশা ত্যাগ করিয়াছে। বাবাজী মহাশয় ঠাকুর-মন্দিরের সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছেন, অপর চারি পাঁচ জন ভদ্রলোক ইঁহার নিকট বসিয়া কেবল কুঞ্জদাসের কথাই বলিতেছেন। এই সময় হঠাৎ কুঞ্জদাস নানারূপ কুৎসিত ভাষায় নামকারী ব্যক্তিদিগকে গালাগালি করিয়া নাম বন্ধ করিতে বলিতে লাগিল। একটী বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন, তিনি হাত দেখিয়া বলিলেন, "বিকার হইয়াছে।" কুঞ্জদাস এক একবার উঠিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু শুশ্রূষাকারিগণ অতি সন্তর্পণে ধরিয়া রাখিতেছেন। নানারূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতেছে দেখিয়া সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। এক একবার উহার উরুদেশে ভয়ানক খিল ধরায় বড়ই কষ্ট পাইতেছে। ললিতাদাসী নানারূপ কৌশল করিয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই সময় ঠিক পিচকারির ন্যায় এরূপ ভাবে দাস্ত হইল যে, একেবারে ললিতাদাসীর গলার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়দংশ বা উদরস্থ হইল, কিয়দংশ বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। সকলেই শশব্যস্তে উপস্থিত ঘটনা বাবাজী মহাশয়ের নিকট জানাইলে ইনি ললিতাদাসীকে ডাকাইলেন। উপস্থিত ভদ্রলোক কয়েকটী বিশেষ ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, "দেখুন, রোগীর ত আশাই নাই, কিন্তু ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা দরকার; কারণ কলেরার বিষ পেটে গিয়াছে, বড়ই আশঙ্কার কথা।"

বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন, বিপদ সম্পদ একমাত্র প্রভুর হাত ; তিনি রক্ষা করিলে যতই বিষ পেটে যাক্ না কেন, অমৃত হইয়া যাইবে।" ললিতাদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মনে কোনও রূপ ভয় বা ঘৃণা জন্মিয়াছে কি ?" ললিতাদাসী বলিল, "কৈ আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না !"

বাবাজী। তবে আর ভয় নাই, যা মুখটা ধুইয়া ফেল্।

ললিতা। আজ্ঞে আমি না হয় মুখ ধুইলাম বা না ধুইলাম, কিন্তু ঐ ছেলেটা কি অকালে মারা যাইবে ?

বাবাজী। উহার যদি নিয়তি থাকে তবে কে কি করিবে ?

ললিতা। নামের আশ্রয় এবং গুরুপদাশ্রয় গ্রহণ করিলেও কি নিয়তি থাকে ? আপনারাই ত বলেন যে, গুরুপদাশ্রয় গ্রহণ মাত্রই পুনর্জ্জন্ম হয়।

বাবাজী। পুনর্জ্জন্ম হইলে না হয় পূর্ব্বজন্মের নিয়তি কাটিয়া গেল, কিন্তু ইহ জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ত ভোগ করিতেই হইবে! আর আশ্রয় কথাটাও ত মুখে বলিলেই হইবে না, কার্য্যত প্রতিপন্ন করা চাই ত! আশ্রয় গ্রহণের পরে স্বতন্ত্রতা থাকিলে আর আশ্রয় থাকিতে পারে কি ?

ললিতা। সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইলে তবে ত সেরূপ অধিকার হইবে। যাহার সে অধিকার না হয় সে কি উদ্ধার হইবে না ? আমার বিশ্বাস আশ্রয়দাতার চেষ্টা বা ইচ্ছা ভিন্ন কেবল আশ্রিতের চেষ্টায় কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না।

বাবাজী। ভাল হইতে পারুক আর নাই পারুক মন্দ হইতে খুব পারে। ভাবিয়া দেখ, এই শ্রীধামে আসিবামাত্রই নিতাইচাঁদ তোমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "কোনও দ্রব্য উপস্থিত হইলে আমাকে না জানাইয়া কেহ খাইবে না।" কাল কিরূপ কার্য্য হইল ? তাহাতে আবার ঐ কুঞ্জের এরূপ দুর্ম্মতি হইল যে প্রায় সকলের জিনিষ ও একা খাইয়াছে। এই ব্যাপারটী নিতাইচাঁদের পূর্ণ কৃপার চিহ্ন ; তাহা না হইলে সকলেরই

বিপদ হইত। যাহা হউক সকলে নিতাইকে ডাক, তিনি মঙ্গলময়— মঙ্গল করিবেন।

ললিতা। যাহা করিতে হয় আপনি করিবেন। মোট কথা— এইরূপ অপরাধের বিচার করিয়া সামান্য দণ্ড দ্বারা চৈতন্য করিয়া লইলে কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু একেবারে প্রাণদণ্ড করিলে কে আপনাদের প্রভুকে দয়াল বলিবে? আমাদের স্বভাব— আমরা স্বতন্ত্রতা, কপটতা প্রভৃতি নানারূপ অপরাধ করিব; কিন্তু আপনাদের স্বভাব ত ক্ষমা করিয়া কোলে লওয়া!

বাবাজী। আমি কি বলিব? প্রভুকে জানাও। ঠাকুরের চরণামৃত ও বৈষ্ণবের চরণামৃত বেশ কবিয়া গা মাথায় মাখাইয়া দাও।

ললিতাদাসী সেইরূপ করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় একবার কুঞ্জদাসের নিকট গিয়া বলিলেন,— "কিরে কুঞ্জ! কেমন আছিস্।" কুঞ্জের স্বর ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ—কাহাকেও চিনিবার শক্তি নাই।

ললিতাদাসী বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কুঞ্জের মাথায় ও বুকে দিবামাত্রই যেন একটু অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। একজন বাবাজী মহাশয়ের চরণামৃত লইয়া কুঞ্জকে খাওয়াইয়া দিল। মধুদাদা সাশ্রুগদগদ-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কুঞ্জের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ক্রমে কুঞ্জদাসের শরীর সুস্থ ও সবল হইতে লাগিল। তিন দিনের দিন পথ্য দিবার আদেশ করিলেন। সঙ্গিগণের মনে আর আনন্দের সীমা রহিল না। প্রাণে প্রাণে তাঁহাদের প্রাণের ঠাকুর পরম দয়াল প্রভুর জয় দিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় কুঞ্জকে বলিলেন, "দেখ, নিতাইচাঁদের কৃপায় তোমার পুনর্জ্জন্ম হইল, ভবিষ্যতে সাবধানে থাকিবে।" কুঞ্জ কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমি কোন্‌দিন বা সাবধান হইয়াছি বা হইতে পারিব? যদি কৃপা করিয়া বাঁচাইলেন, তবে আবার যাহাতে স্বতন্ত্রতা না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

রসকীর্ত্তন শ্রবণ

এইরূপ দিনের পর দিন যায়, যদিও বাবাজী মহাশয়ের শ্রীগুরুদেব আশ্রমে উপস্থিত নাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ গৌরমোহন দাস কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় উপস্থিত থাকায় আর কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে না। আশ্রমের সেবার ভার উঁহারই উপরে। বাবাজী মহাশয়ের গুরুভাই মহাত্মা মাধবদাস বাবাজী মহাশয়, মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যহই মাধুকরী করেন।

কয়েক দিন যায় একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় কয়েকটী ভক্ত সঙ্গে আশ্রমে বসিয়া নানারূপ তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছেন, এই সময় গৈরিক বসনধারী, দীর্ঘকেশবিশিষ্ট একটী যুবক আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ইনি শশব্যস্তে উঠিয়া যুবকটীকে প্রতিপ্রণাম করত পার্শ্বে বসাইলেন। তখন মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "এই ছেলেটী যশোহর জেলার অন্তর্গত বেলব্যায়না গ্রামের। সম্প্রতি মা এবং অন্যান্য অনেক আত্মীয় স্বজনগণকে লইয়া শ্রীধাম দর্শনের জন্য আসিয়াছে। ছেলেটী জাতিতে কায়স্থ, পূর্ব্বাশ্রমে আমাদের সহিত কিঞ্চিৎ সম্বন্ধও ছিল। এ আজ কয়েক দিন হইতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রাণের কয়েকটী কথা বলিবে বলিয়া আসিতেছে, কিন্তু সুযোগ ঘটে না, তাই আজ আসিয়াছে, উহার কয়েকটী কথা শুনিতে হইবে।"

বাবাজী। বেশ ভাল কথা! বাবা তোমার নাম কি?

যুবক। আজ্ঞে! আমার নাম প্রিয়নাথ দাস সরকার।

বাবাজী। তোমার মাতাপিতা বর্ত্তমান আছেন কি?

প্রিয়। আজ্ঞে পিতা গত বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন, মাতা ঠাকুরাণী সঙ্গেই আসিয়াছেন।

বাবাজী। বিবাহাদি করিয়াছ কি?

প্রিয়। আজ্ঞে আপনাদের কৃপায় ওবিষয় খালাস আছি।

বাবাজী। এই গৈরিক বসন ধারণ এবং মাথায় বড় বড় চুল রাখিবার উদ্দেশ্য কি ?

প্রিয়। আজ্ঞে উদ্দেশ্য আর বিশেষ কিছুই নয়, তবে এই নবদ্বীপ আসিতে গেলে কাপড় ময়লা হয় এবং অনেক অসুবিধা তাই এইরূপ করিয়াছি।

বাবাজী। না, কেবল যে সেই উদ্দেশ্য তাহা নহে; আমার বোধহয় সাধু সাজিবার ইচ্ছা আছে। আচ্ছা তোমার কি বলিবার আছে বল দেখি!

প্রিয়। আজ্ঞে বলিবার অনেক ছিল কিন্তু গত কল্য নগরকীর্ত্তনের সময় আপনাকে দর্শন করিয়াই আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। আহা মরি কি অপূর্ব্ব করুণা! কে যেন বলপূর্ব্বক আমাকে সংকীর্ত্তনের দিকে আকর্ষণ করিয়া নিল! যেমন কীর্ত্তনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, অমনি দেখি একটী অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আজানুলম্বিত বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক প্রেমার্দ্রভাবে করুণা-নয়নে যেন আমাদের ন্যায় কলিহত পতিত পাষণ্ড জীবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হ্যাঁরে দুর্ব্বল জীব! আর তোদের ভয় নাই, একবার গৌর গৌর বল্, আমি তোদের জন্ম-জন্মান্তরীয় অশেষ পাপ তাপের বোঝা মাথায় লইয়া তোদের বিশুদ্ধ ব্রজ-প্রেমের অধিকারী করিব।" বলিতে কি সেই মূর্ত্তিখানি যেন সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ মূর্ত্তি বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি বিচারবুদ্ধি আসিল, অমনি মনে হইল, ইনিই আমার ভবপারের কাণ্ডারী অভীষ্টদেব! কিন্তু যদি আমার মনের ভাব বুঝিয়া অযাচিত ভাবে আমাকে অঙ্গীকার করেন তবেই জানিব ইনি অন্তর্য্যামী পতিতপাবন। ভাবিতে না ভাবিতেই আপনি আমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনের মধ্যে লইয়া গেলেন। সুতরাং আমার সকল সন্দেহ মিটিয়াছে। তবে একটী জিজ্ঞাস্য আছে।

বাবাজী। বল, বেশ খোলা প্রাণে বল।

প্রিয়। আজ্ঞে আমাদের কুলগুরু বংশাবলীর একরূপ অভাব; তবে তিনি একজনকে আনিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনিই এখন আমাদের সকলকে মন্ত্রাদি দিয়া থাকেন। আমার পিতা মাতা কেহই উঁহার নিকটে দীক্ষিত নন। উঁহারা শাক্ত সম্প্রদায় কিন্তু কেহ কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সেই মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। নিজে যে মন্ত্রে দীক্ষিত নহেন, তাঁহার নিকট সেই মন্ত্র গ্রহণ করা যায় কি?

বাবাজী। এ কথার সিদ্ধান্ত করা বড়ই কঠিন; কারণ গুরুতত্ত্ব অতীব নিগূঢ়তত্ত্ব। কোন্‌টী করা উচিত কোন্‌টী অনুচিত একমাত্র অন্তর্য্যামী প্রভুই জানেন; সুতরাং ও সমস্ত বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা না করাই ভাল।

প্রিয়। আজ্ঞে অন্য কিছুই আমার জিজ্ঞাস্য নহে, কেবলমাত্র এই জিজ্ঞাসা করি যে গুরুপদে একজনকে বরণ করিয়া তৎপর যদি তাঁহার চরণে ভক্তি না রাখিতে পারা যায় বা অবজ্ঞা বুদ্ধি জন্মিয়া মন্ত্রাদি গ্রহণ জন্য হৃদয়ে অনুতাপ আসে তবে কি অপরাধ হইবে না?

বাবাজী। নিশ্চয়ই হইবে। গুরুর প্রতি অবজ্ঞা ত দূরের কথা মনুষ্য জ্ঞান করিলে পর্য্যন্ত অপরাধ হইবে। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—

গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরুনিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥

আমার মতে গুরু করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা অপেক্ষা বরং না করাই ভাল। পাছে এই সমস্ত অনর্থ ঘটে এই ভয়েই পূর্ব্ব আচার্য্যগণ গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া গুরুশিষ্যের মানসিক অবস্থানুসারে দীক্ষিত

হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অশক্ত পক্ষে অন্ততঃ একবৎসর কালও একত্র বাস করিয়া তবে দীক্ষিত হইবে।

প্রিয়। আবার শুনিতে পাই গোস্বামিগণ অসম্প্রদায়ী গুরু করিতে নাকি নিষেধ করিয়াছেন ?

বাবাজী। হ্যাঁ, শাস্ত্রে সে কথাও যে নাই তাহা নহে। অসম্প্রদায়ী বা অবৈষ্ণব গুরু করিবে না, ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। তবে কে যে বৈষ্ণব, কে যে অবৈষ্ণব তাহা কিরূপে ঠিক করা যাইতে পারে ? কেবল যে বাহিরের বেশ দেখিয়াই বৈষ্ণব ঠিক করা সেটী সম্পূর্ণ ভুল।

প্রিয়। আচ্ছা, তাঁহার আদেশ লইয়া কার্য্য করিলে কোনও রূপ দোষ হইতে পারে কি ?

বাবাজী। সে ভাল কথা, তিনি যদি প্রসন্নমনে আদেশ করেন, তবে আর কোনরূপ দোষ থাকে না। তবে তাঁহাকে দর্শনমাত্র গুরুবুদ্ধি করা বা তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে দেওয়া আমার মতে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এবার প্রিয়নাথের মনেব মত হইয়াছে, কাজেই প্রসন্নভাবে বলিল, "আজ্ঞে মন্ত্র নিতে হইলে কিরূপ কি করিতে হইবে ?"

বাবাজী। মন্ত্র নেওয়া দেওয়া নিতাইচাঁদ জানেন ; তবে আমার মতে তোমার এই অভিমানের বেশ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন গিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া শুভ্রবসন ধারণ কর।

প্রিয়নাথ, বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিল। ঐদিবস প্রাতে খুব মাতামাতি উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হইতে লাগিল। এদিকে প্রিয়নাথ, বাবাজী মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণের সংকল্প করিয়া আসিয়াছে। সংকীর্ত্তনের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় গিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় শুভমুহূর্ত্তে উহার হৃদয়ের ভাবানুযায়ী কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন। মন্ত্র পাইবামাত্র প্রিয়নাথ অচৈতন্য হইয়া পড়িল। অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন তাহার দেহের

ভূষণ হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তথাপি প্রিয়নাথ সংজ্ঞা লাভ করিতেছে না দেখিয়া উহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় প্রেমগরগরভাবে গিয়া যেমন প্রিয়নাথকে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি প্রিয়নাথ নিদ্রোত্থিতের ন্যায় শশব্যস্তে উঠিয়া বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। ইনিও যথাসময়ে সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণকরত বিশ্রাম করিলেন।

এইভাবে নানারূপ আনন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। নবদ্বীপে ধূলট উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অনেক ঠাকুরবাড়ীতে রাঢ়দেশবাসী ভাল ভাল রসকীর্ত্তনের সম্প্রদায় গান করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় এক একবার এক এক সম্প্রদায়ের গান শুনিতেছেন। নবীনদাস বলিয়া একটী অল্পবয়স্ক কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন ইঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। উপাসনা-বিরুদ্ধ ভাব বা রসাভাসের ভয়ে প্রসিদ্ধ দুই একটী কীর্ত্তনীয়া ছাড়া প্রায়ই ইনি কাহারও কীর্ত্তন শুনিতে যান না; আজ কি মনে হইয়াছে, মহাপ্রভুর বাড়ী গান শুনিতে গিয়া নবীনদাসের গানে মুগ্ধ হয়ইাছেন। গান সমাপ্তির পর একেবারে সে স্থান হইতে গোপালচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভায়া! আজ আমি নবীনদাসের গান শুনিয়া বড়ই তৃপ্তহইলাম; তবে বহুলোকসমাগম হওয়ার দরুণ বড়ই গোলমাল হয়। আজ তোমার বাড়ী আমাকে নবীনদাসের গান শুনাইতে হইবে।"

ঘটক মহাশয়ের সহিত বাবাজী মহাশয়ের ভ্রাতৃসম্বন্ধ। ঘটক মহাশয় কনিষ্ঠ এবং ইনি জ্যেষ্ঠ, উভয়ের এইরূপ অভিমান। উভয়ের ব্যবহার বা ভাব দেখিলে কে বলিবে যে ইঁহারা দুইটী সহোদর ভাই নহেন! কাজেই দাদার আদেশে ঘটক মহাশয় নবীনদাসের গান ঠিক করিলেন। নবীনদাস আসিয়া গান আরম্ভ করিল। অপূর্ব্ব আনন্দ! নবীনদাস মাঝে মাঝে এক একটী আঁখর দিতেছে, আর বাবাজী মহাশয় বিভোর হইয়া যাইতেছেন। নবীনদাসও এক একবার আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেছে। রস যেন

মূর্ত্তিমান হইল। সাত্ত্বিক বিকারগণ বাবাজী মহাশয়ের দেহ আবরণ করিয়া ফেলিল! সম্পূর্ণ তদ্ভাবাবিষ্ট হইয়া গান শুনিতেছেন। চক্ষু দুইটী সজল ও রক্তবর্ণ। মুখে বাক্য নাই, কেবল এক একবার হুঙ্কারধ্বনিতে যেন উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ের আবরণসকল দূর করত সকলকে অপ্রাকৃত লীলা-সাগরে ডুবাইয়া দিতেছেন। যোগমায়ার আশ্চর্য্য প্রভাব! বায়েন, দোহার প্রভৃতি কাহারই ক্লান্তি নাই— সকলেই বিভোর— সকলেই যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। বাবাজী মহাশয়ের গায়ে একখানি বসন্ত রঙের দোপাট্টা চাদর রহিয়াছে। একটী আঁখরে এতই আনন্দিত হইয়াছেন যে চাদরখানি খুলিয়া নবীনদাসের হাতে দিলেন। নবীনও সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিল, "আজ আমি অপ্রাকৃত চিন্ময় উপহার পাইয়া ধন্য হইলাম!" বলিয়া চাদরখানি মাথায় বাঁধিয়া গান করিতে লাগিল। ক্রমে গানও যত শেষ হইতে লাগিল, বাবাজী মহাশয় যেন ততই আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার একটী পদ শুনিয়া নিজের পরিধেয় বহির্ব্বাস খুলিয়া নবীনকে যেমন দিতে গেলেন, অমনি সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভু! আমি এ জন্মে এত কৃপা কোথাও পাই নাই বা পাইব বলিয়া আশাও ছিল না। এতদিন গান করিয়া ঐহিকের সম্বল অর্থ নামধারী বহু অনর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, আজ আপনার কৃপারূপ পরম সম্পদ প্রাপ্তে আমি পরমার্থ-ধনে ধনী হইলাম। বাবা আর কেন? কৃপাকটাক্ষ হইলেই দাস চরিতার্থ।" নবীনের কথা শুনিয়া শ্রোতবৃন্দ হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রেম-বিহ্বলভাবে নবীনকে আলিঙ্গন করিলেন। গায়ক, বাদক এবং শ্রোতৃবর্গের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সময়ের অনুরোধে গান সমাপ্তি করিয়া সকলে বাবাজী মহাশয়ের সহিত কিছুক্ষণ নানারূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ করত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইঁহারাও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

—

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা

দেখিতে দেখিতে গান, মেলা অর্থাৎ ধূলট উৎসব শেষ হইতে চলিল। একদিন গৌরমোহনদাস কর্ত্তাবাবাজী মহাশয়, বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখ বাবা! ব্রজমণ্ডলে এবং নবদ্বীপ মণ্ডলে কোন ভেদ নাই, একথাটা আমরা মুখেই বলিয়া থাকি, ব্যবহারে প্রায়ই দেখা যায় না। যেমন ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হয়, তেমনি না হইলেও এক রকম ভাবে গোরাচাঁদদাস মহান্ত এবং গোবিন্দদাস মহান্ত প্রভৃতি মিলিত হইয়া নবদ্বীপ পরিক্রমা করিতেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পর আজ কয়েক বৎসর সেটী প্রায় বন্ধ হইবার মত হইয়াছে। এবার তুমি যদি একটু চেষ্টা কর আমার বিশ্বাস তাহা হইলে কার্য্যটী সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতে পারে।" বাবাজী মহাশয় আনন্দিতমনে বলিলেন, "বাবা! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আপনাদের সন্তান, ভালমন্দ কিছুই জ্ঞান নাই; যাহা করিলে ভালহয়, সেইরূপ আদেশ করিবেন। পূর্ব্বে কোন্ দিন আপনারা পরিক্রমায় বাহির হইতেন?"

কর্ত্তাবাবাজী। এই ধূলটের পরদিবস অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন।

বাবাজী। পঞ্চমী কবে হইল?

কর্ত্তাবাবাজী। আগামী কল্য বড় আখড়ায় ধূলট বাহির হইবে, পরশ্ব তারিখ পঞ্চমী।

বাবাজী। বেশ ত! সেই দিনই যাওয়া যাইবে।

কর্ত্তাবাবাজী। কতকগুলি জিনিষপত্র সংগ্রহ করা চাই ত! সে সব কিরূপ হইবে?

বাবাজী। বাবা! আমরা ভিখারী বৈরাগী, আমাদের আবার সংগ্রহের প্রয়োজন কি? নিতাইচাঁদের নাম করিয়া বাহির হওয়া যাইবে, যাঁহার ভাবনা তিনিই ভাবিবেন।

কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় পরমানন্দে বাবাজী মহাশয়কে কোল দিলেন এবং এই পরিক্রমার কথা অপরাপর সকলের নিকট বলাবলি করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিন বেলা আড়াইটার সময় আশ্রম হইতে নাম ধরিয়া বড় আখড়ার নাটমন্দির হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং মহাপ্রভুর দর্শন পূর্ব্বক রওনা হইলেন। সঙ্গে লোক প্রায় তিন শত হইবে। মাধাইতলা গিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করা হইল। পরদিবস প্রাতে ছাড়িগঙ্গা পার হইয়া একখানি নূতন বস্তিগ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ইদ্রাকপুরের চড়া। গ্রামখানিতে কেবল গোয়ালা জাতির বসতি। বেলা অনুমান সাতটা, এই সময় মাঠের রাস্তায় কীর্ত্তন বাহির হইয়াছে। জটিয়া রামদাস নামক একটী মহাত্মা সঙ্গে আছেন। তিনি এবং বাবাজী মহাশয় সখ্যরসে আবিষ্ট হইয়া অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিতে কবিতে চলিয়াছেন। প্রভাতী সুরে 'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥' নামটী অতি মধুর লাগিতেছে— সকলেই আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। বাবাজী মহাশয় এবং জটিয়া রামদাস বাবাজী এক একবার বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক হৈ হৈ শব্দে নৃত্য করিতেছেন। হঠাৎ বিশেষ বলিষ্ঠ রকমের সাত আট জন লোক হাত ধরাধরি করিয়া সংকীর্ত্তন আটক করিল। বাবাজী মহাশয় ঠিক পূর্ব্ববৎ হাতে তাল ঠুকিয়া বলিলেন, "কিরে তোরা কেরে? কি বল্‌ছিস্?" উহাদের মধ্যে একটু পরিণত বয়স্ক একটী লোক বলিল, "আজ আমাদের এই গ্রামে থাকিতে হইবে। কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না।"

বাবাজী। তোরা কি জাতি বল্‌ দেখি!

সকলে। আজ্ঞে! আমরা গোয়ালা।

বাবাজী মহাশয়। "আরে তবে ত আমাদের স্বজাতি। স্বজাতির কথা ত অবহেলা করা যাইতে পারে না" বলিয়া কর্ত্তাবাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "বাবা! স্বজাতির কথা ফেলিয়া যাওয়া কখনই উচিত নহে; অতএব আজ এই স্থানে থাকা যাক্।"

কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় প্রথম একটু আপত্তি করিলেন। পরে ইঁহাদের প্রেমের খেলা এবং উহাদের অনুরাগ দেখিয়া অনুমতি করিলেন ; সুতরাং সংকীর্ত্তনের স্রোত গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। ইঁহাদের সঙ্গে যে সমস্ত সামান্য জিনিষপত্র ছিল, তাহা ঐ মাঠের মধ্যস্থিত একখানি গোয়ালঘরে রাখিবার ব্যবস্থা হইল। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও অতীব মনোরম দৃশ্য। কেবল মাত্র গোয়ালা জাতির বসতি ; উহাদের মধ্যে **বাঁশী ঘোষ** নামক একব্যক্তি প্রধান ধনী ও সম্ভ্রান্ত। গ্রামবাসী সকলেই উহার অনুগত। কীর্ত্তন গ্রাম পরিক্রমা করিয়া সেই গোঠের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই সে অভিনব অপ্রাকৃত আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তনসমাপ্তি হইল। বাঁশী ঘোষ বড়ই উদার প্রকৃতির লোক। "শালা" শব্দটী তাহার ব্যবহারগত কথা। গ্রামের প্রধান-প্রধান কয়েক জনকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, আজ এই গ্রামের কোন শালা দুধ লইয়া যেন বাহিরে না যায়, সকলকে বারণ করিয়া দে। শালারা! তোদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য যে এমন মহাপুরুষ সকল নবদ্বীপ হইতে তোদের গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে। আজ ইহাদের কেবল দুধের পায়স ছাড়া আর কিছুই খাওয়ান হইবে না।" শুনিয়া বাবাজীদের মধ্যে দুই একজন বলিল, "বাবা! কেবল পায়স খাইয়া কি লোক বাঁচে ?"

বাঁশী। ও শালারা পেটরোগা বাবাজী কিনা! পায়স হজম হবে কেন ? আচ্ছা সামান্য কিছু ডাল ভাতও করা যাক।

এই বলিয়া সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। এদিকে সুবলদাস, নবগৌরাঙ্গদাস, সীতানাথদাস, নারায়ণদাস ও হরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পূজারীগণ রান্নার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় কিরূপ কি লাগিবে বাঁশী ঘোষের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। রান্নার যোগাড় হইতে অধিক বিলম্ব হইবে জানিতে পারিয়া বাঁশী ঘোষ ইঁহাদের জল খাইবার জন্য কিছু চিড়া মুড়কী এবং মিষ্টি

আনাইয়া দিলে যথাসময়ে সকলে স্নানাদি মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনান্তে বাল্যভোগ মহাপ্রসাদ পাইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গ্রামবাসী লোকের আনন্দ আর ধরে না। খোলা গোচর ভূমি আজ যেন ব্রজভূমি হইল। গ্রামে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার! কাহারও বাহ্যস্মৃতি নাই— সকলেই যেন আবিষ্টের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর বাঁশী ঘোষের প্রার্থনানুসারে বাবাজী মহাশয় অনেক জনকে মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক বাঁশী ঘোষকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাঁশী! তোমাদের এই গ্রামখানিতে যেরূপ আনন্দ হইল, ইহা নিতাইর কৃপা ভিন্ন কিছুতেই সম্ভবে না; অতএব আমার মতে এই গ্রামের নাম **নিত্যানন্দপুর** রাখা উচিত।" শুনিয়া সকলে **হরিধ্বনি** করিয়া উঠিলেন। বেলা অনুমান একটার সময় রান্না শেষ হইলে ঠাকুরের ভোগ লাগিল। ইঁহারাও ভোগ-আরতি কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে সে স্থান হইতে রওনা হইলেন।

ইঁহাদের পথপ্রদর্শক একমাত্র নাম; কারণ যদিও কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় প্রাচীন এবং বহুদিন হইতে পরিক্রমা করার দরুণ সুপরিচিত, কিন্তু তিনি সংকীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে চলিতে অক্ষম। জটিয়া রামদাস বাবাজী আবিষ্টভাবে অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, আর বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে যাইতেছেন। ক্রমে যাইয়া বিল্বপুষ্করিণী উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসী অনেক লোকের অনুরোধে সে রাত্র সেই স্থানেই বাস করা হইল। অপরাহ্নে প্রসাদ পাওয়া হেতু কেহ রাত্রে আর কিছু প্রসাদ পাইলেন না। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইল। গ্রামবাসী অনেক লোক সমবেত হইল। সকলেরই ইচ্ছা যে ইঁহারা সদলে অন্ততঃ একদিন সে স্থানে থাকেন; কিন্তু পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন; সুতরাং তাহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না।

পরদিবস প্রাতেই নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন। বাবাজী

মহাশয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নাম সংকীর্ত্তন প্রচার দ্বারা জীবের মঙ্গল বিধান করা ; সুতরাং কেবল যে রাস্তা ধরিয়াই চলিয়া যাওয়া হইতেছে তাহা নহে। যে গ্রাম সম্মুখবর্ত্তী হইতেছে, সেই গ্রামের মধ্য দিয়াই গমন করিতেছেন। কোথাও বা এক স্থানে অনেক লোক দাঁড়াইয়াছে, হয়ত সেই স্থানেই একঘন্টা কাটিয়া গেল। এইরূপ ভাবে বেলা অনুমান নয়টার সময় গিয়া ব্রাহ্মণপুকুর পোঁছিলেন। বাজারের এবং গ্রামবাসী অনেক লোক একত্রিত হইয়া ইঁহাদিগকে বাজারের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া সেদিনকার ভোগরাগের যোগাড় করিয়া দিতে লাগিল। রান্না আরম্ভ হইল। এদিকে বাবাজী মহাশয় সগণে স্নানাদি করিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া চারিদিক হইতে লোকসকল ছুটাছুটী করিয়া আসিতে লাগিল। বহুলোক একত্র সমবেত হইলেও নীরব-নিস্তব্ধ। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাবাজী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। প্রেমগদগদকণ্ঠে ইঁহার মুখ হইতে এক একটী পদ উচ্চারিত হইতেছে, আর যেন উপস্থিত সর্ব্বসাধারণের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে। প্রায় চারিঘন্টা কীর্ত্তন হইল, কাহারই খেয়াল নাই। শ্রোতৃবর্গের গায়ে রৌদ্র পড়িয়াছে— হুঁস নাই। কেহ হয়ত বাজার করিতে আসিয়াছে, কেহ বা বাজার করিয়া বাড়ী যাইতেছে ; কিন্তু সংকীর্ত্তনধ্বনিতে এতই বিভোর যে নিজ নিজ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেল। বালকগণ স্কুলে যাইতে যাইতে সেই অবস্থায়ই সংকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া গেল, আর স্কুলের কথা বা মাষ্টার পণ্ডিতের শাসনের কথা একেবারেই মনে নাই। সকলেই অনিমেষনয়নে বাবাজী মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। কেবল মনঃশিক্ষা কীর্ত্তন হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাবাজী মহাশয় কখনও পদ মুখস্থ করিয়া কীর্ত্তন করেন না ; নিজ স্ফূর্ত্তি অনুসারে যাহা উপস্থিত হইতেছে, তাহাই পদাবলী আকারে পরিণত হইতেছে। কীর্ত্তন করিতে করিতে কি মন হইল, হঠাৎ উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণও আস্তে ব্যস্তে

ইঁহার অনুসরণ করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ যাঁহারা এতক্ষণ নীরবে সংকীর্ত্তন শুনিতেছিলেন, তাঁহারাও এবার প্রাণ খুলিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। মাতামাতি কীর্ত্তন— সকলেই বিভোর। যাহারা স্বপ্নেও নিতাই গৌর নাম কিরূপ জানে না, তাহারাও আজ হাতে তালি দিয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥" বলিয়া নৃত্য করিতেছে। যেন আজ আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। বহুক্ষণ এইরূপ মাতামাতি কীর্ত্তনের পর সকলের শ্রম জানিয়াই যেন বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। এদিকে বেলা অনুমান তিনটার সময় ঠাকুরের ভোগ লাগিল। নিজেদের প্রসাদ পাইতে এবং আগন্তুক ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদাদি দিতে দিতেই রাত্র হইয়া গেল ; সুতরাং সে দিন আর সেস্থান হইতে যাওয়া হইল না। রাত্রে আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন হইবার পর সকলে বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে সেস্থান হইতে রওনা হইলেন। সঙ্গে লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ; কারণ ইঁহারা যে গ্রামে একদিন থাকিয়া সংকীর্ত্তনাদি করিতেছেন, সে গ্রামবাসী লোকসকল যেন আর এই আনন্দময় সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। কাজেই যে একটু সংসারের নিকট অবকাশ পাইতেছে, সেই ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। ক্রমে সংকীর্ত্তন গঙ্গাপার হইয়া মায়াপুর বাবু কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ সেই স্থানে কীর্ত্তন করিয়া তথা হইতে কাজির সমাধিস্থান দর্শন করিবার মানসে চলিলেন। সমাধিস্থানে উপস্থিত হইয়াই বাবাজী মহাশয় আবিষ্টভাবে মহাপ্রভুর কাজিমিলন প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সমাধিস্থানে একটী কাঠচাঁপা ফুলের গাছ আছে ; সেটী যে কত কালের তাহা নির্দ্ধারণ করা অতি সুকঠিন। গাছটী এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, দর্শন মাত্রই বোধ হয় যেন ইনি বহু প্রাচীন ঋষিপ্রবর ;

ইচ্ছা করিয়া স্থাবরদেহ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। সেই বৃক্ষরাজের তলায় একখানি কুটীর মধ্যে একটী মুসলমান বাস করেন। তাঁহাকে দেখিলে হিন্দু কি মুসলমান ঠিক করা কঠিন। গলায় নানারূপ মালা ঝুলান রহিয়াছে। তিনি ইঁহাদের কীর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া নাম করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক একবার বাবাজী মহাশয়ের চরণের উপর পড়িয়া নানারূপ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হা গুরুদেব! আমার কৃপা করুন, আমার কর্ণে হরিনাম প্রদান করিয়া আমার জীবন ধন্য করুন। আমি এতদিন যে মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, আজ সেই মূর্ত্তি সম্মুখে পাইয়াছি। আমায় বঞ্চিত করিবেন না। আমি গত পরশ্ব হতাশ প্রাণে কাজিসাহেবকে এই কথা জানাইয়াছিলাম, শেষ রাত্রে তিনি আমার আদেশ করিলেন যে "অল্প দিনের মধ্যেই তোর অভিলাষ পূর্ণ হইবে, চিন্তা নাই। কোন মহাত্মা এই স্থানে আসিতেছেন, তাঁহাকে তোর মনের ভাব জানাইলে তিনি তোকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিবেন!" কাজিসাহেবের আদেশানুযায়ী আমি আপনাকে পাইয়াছি; আর আমায় দুরাচার বলিয়া পরিত্যাগ করিলে চলিবে না!" বাবাজী মহাশয় উহার আর্ত্তি দর্শনে সাশ্রুগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! কাজিসাহেব মহাত্মার কথা বলিয়াছেন। আর সেই চাপ এই দুরাত্মার উপর কেন? তুমি সাধু, মহাপ্রভুর নিত্যপরিকর কাজিসাহেবের সমাধিস্থানে থাক, তাঁহার সঙ্গসুখ অনুভব করিতেছ, বরং তুমিই আমাকে কৃপা করিবে, যাহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সপরিকরে প্রভুর নিত্যলীলা অনুভব করিতে পারি।" সে ব্যক্তি সে কথা শুনিবার পাত্র নহে— সে দৃঢ়ভাবে চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল; কাজেই সংকীর্ত্তনের মধ্যে উহার কর্ণে হরিনাম প্রদান করিবামাত্র সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসকল উহার দেহে বিকাশ পাইতে লাগিল। সংকীর্ত্তনের দল উহাকে বেষ্টন করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। বহুক্ষণের পর উহার কিঞ্চিৎ

সংজ্ঞালাভ হইলে উহাকে ঐ স্থানে থাকিয়াই ভজন করিবার আদেশ করিয়া নাম করিতে করিতে সেস্থান হইতে সুরভিকুঞ্জ বা স্বরূপগঞ্জ নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা প্রায় দশটা বাজিল, ভোগের কোনই সংস্থান নাই। উদারপ্রকৃতি মহাত্মা জটিয়া রামদাস বাবাজী একটী দোকানীর সহিত নানারূপ আলাপ করিয়া বুঝিলেন যে, প্রতিবৎসর পরিক্রমা করিতে যত লোক আসে, তাহাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্ত সেই ব্যক্তিই দিয়া থাকে। সে ব্যক্তি বিশেষ ভক্তিসহকারে বলিতে লাগিল, "আমি চিরদিন ইবৈষ্ণবসেবার দ্রব্যসকল দিয়া থাকি। আমি থাকিতে আপনারা অন্য কাহারও নিকট কিছু লইতে পারিবেন না।" দোকানীর মনের ভাব এই যে, চিরদিনই বৈষ্ণবসেবার দ্রব্যসকল আমি দিয়া থাকি। যাইবার সময় তাঁহারা আমাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া যান, এবারও সেইরূপ হইবে। মহাত্মা জটিয়া রামদাস বাবাজীর মনের ভাব যে, তবে ত এ লোক পরমভক্ত; এ নিজেই এতকাল হইতে বৈষ্ণবসেবা করিয়া আসিতেছে; সুতরাং আর আমাদিগের ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? যাহা যাহা দরকার, অকুণ্ঠিত ভাবে দোকান হইতে লইয়া যাইতেছেন। আবার বাবাজী অপেক্ষা দোকানী আরও অধিক। একসের জিনিস চাহিলে দোকানী বলিল, "আজ্ঞে! একসেরে কখনই হইতে পারে না, দুইসের দিলাম।" কাজেই জটিয়া রামদাসবাবাজীর প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। একবার বাবাজীমহাশয়, রামদাসবাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা! আজ যে বড়ই স্বচ্ছলতা, ইহার দাতা কেহ আছে, না আপনার উপর নির্ভর?" রামদাসবাবাজী মহাশয় হাসিমুখে বলিলেন, "দাতার কথা আর কি বলিব! আমি একসের চাহিলে সে দুইসের দিয়া দেয়। আর কোন ওজোর আপত্তি করে না, দোকানীটী বড়ই ভক্ত।"

বাবাজী। না, আমি ভক্তির কথা বলি না, তবে টাকা পয়সার প্রয়োজন হইবে না ত?

রামদাস। সেজন্য তোদের ভাবিবার দরকার নাই, আমি আছি। ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। এদিকে যথাসময়ে রান্না হইয়া ঠাকুরের ভোগ লাগিল; বাবাজী মহাশয় ভোগ-আরতি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে চারিদিক হইতে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই ভোগ-আরতি উপলক্ষ করিয়াই বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইতে লাগিল। আনন্দের অবধি নাই। ভোগ-আরতি কীর্ত্তনে যে এত আনন্দ হইতে পারে এইটী ধারণার অতীত। বহুক্ষণ পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

সকলের মহাপ্রসাদ পাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইল, কাজেই সে রাত্র সেই স্থানেই থাকার ব্যবস্থা করিয়া রাত্রে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দোকানী পসারী প্রভৃতি গ্রামবাসিগণ যাহারা মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারে নাই, তাহারা রাত্রে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। কেহ কেহ বা নিজ দোকান বা গৃহ হইতে আলো আনিয়া দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় সাড়ে দশটার সময় কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। রাত্রে কোনরূপ আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেও বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া নিষেধ করিলে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিবস প্রাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এই সময় পূর্ব্বোক্ত দোকানী একটী ফর্দ্দ আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে দিল। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এ কি?" দোকানী বলিল, "আজ্ঞে! কালকার খরচের হিসাব।" শুনিবামাত্র জটিয়া রামদাস বাবাজী একেবারে চটিয়া লাল! বলিলেন, "হ্যারে দাম কিসের রে? তুই ত নিজ মুখে বলিলি যে, "বরাবর বৈষ্ণবসেবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন আমি দিয়া থাকি!"

দোকানী। আজ্ঞে সে কথা ত আর আমি অস্বীকার করিতেছি না, তবে আমি যে টাকা পয়সা না লইয়া দেই এ কথা কি বলিয়াছি?

জটিয়া। তুই সে কথা না বলিলেও আমি ত সেইরূপই বুঝিয়াছি।

দোকানী। আজ্ঞে! আমি গরীব মানুষ, আমার কি অত বড় সাধ্য হইতে পারে ?

জটিয়া বাবাজী ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যা শালারা! আমাকে এই দোকানে বাঁধা রাখিয়া তোরা চলিয়া যা।"

তখন বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে বাঁধা রাখিয়া উহার টাকা আদায় ত খুবই হইবে, উলটিয়া আবার আপনার খোরাকীর জন্য গরীব কষ্ট পাইবে।" কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় ও অন্যান্য সঙ্গিগণ সকলেই দোকানীকে বলিতে লাগিলেন যে, "তোমার আগে স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত ছিল। আমরা গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আনিতাম, এখন আমরা টাকা-কড়ি কোথায় পাইব ?" অন্যান্য দোকানদারগণও উক্ত দোকানীকেই ভৎ‍্সনা করিতে লাগিল। দোকানীটী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে বিষণ্নমনে বসিয়া আছে, আর নীরবে সকলের ভৎ‍্সনা শুনিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার কত টাকা পাওনা হইয়াছে ?"

দোকানী। আজ্ঞে পঁয়তাল্লিশ টাকা সাড়ে তের আনা।

বাবাজী। বাবা! আমি আর কি বলিব! যদি আমার কথায় বিশ্বাস কর, তবে আমি ব্যবস্থা করিতে পারি।

দোকানী। আজ্ঞে! আপনি যাহা করিবেন আমি তাহাতেই রাজি আছি।

বাবাজী। যদি তুমি চার পাঁচদিন পরে নবদ্বীপে আমার গুরুদেবের আশ্রমে যাইতে পার, তবে আমি ভিক্ষা করিয়া তোমার এই টাকা পরিশোধ করিতে পারি। অবশ্য আমি অপরিচিত লোক, তাহাতে আবার ভিখারী বৈরাগী, আমার উপর তোমার এতটা বিশ্বাস হইবে কি ?

দোকানী। বাবা! আপনার কথাতেই বিশ্বাস— তবে আপনি

নিজ হাতে একটু কাগজ লিখিয়া দিলে বড়ই ভাল হয়।

বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাবা! তাহাই হউক।" এই সময় ললিতাদাসী বলিল, "আজ্ঞে! উপস্থিত সঙ্গিগণের নিকট একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক্, যদি অন্ততঃ ধার স্বরূপেও পাওয়া যায়, তবে ইহার টাকা মিটাইয়া দেওয়া যাইবে।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখ, নিতাইচাঁদের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।" তখন ললিতাদাসী সকলের নিকট খোঁজ করিয়া তের টাকা পনের আনা সংগ্রহ করত বাবাজী মহাশয়কে বলিলে ইনি বলিলেন, "বেশ! যাহা কিছু সংগ্রহ হইল উহাকে দাও।" দোকানীকে বলিলেন, "বাবা! এই টাকা বাদে যাহা বাকী থাকিল, তাহার জন্য আমি একখানা কাগজ লিখিয়া দেই, তুমি পাঁচ দিন পরে নবদ্বীপে আমার গুরুদেবের আশ্রম হইতে টাকাটা লইয়া আসিবে।" দোকানী তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া একখানা কাগজ আনিয়া দিলে বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার কত টাকা বাকী রহিল ?"

দোকানী। আজ্ঞে ও সাড়ে তের আনা আমি বাদ দিলাম। এই তের টাকা পনের আনা বাদ আর বাকী একত্রিশ টাকা আপনি লিখিয়া দিন।

বাবাজী। না বাবা! সে কি হয় ? আমি ঐ বত্রিশ টাকাই লিখিয়া দিলাম। কারণ এই কয়েক দিনে এই টাকাটার জন্য তোমার হয়ত অনেক বেগ পাইতে হইবে; বরং তোমাকে আমার আরও কিছু বেশী করিয়া দেওয়া উচিত।

উপস্থিত লোকসকল ইঁহার ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় এইরূপ ভাবে দোকানীকে প্রবোধ দিয়া মিষ্টবাক্যে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন।

আজ দশমী। কর্ত্তাবাবাজী মহাশয়ের ইচ্ছা যে আজই গঙ্গা পার

হইয়া অন্ততঃ সমুদ্রগড় গেলে, তবেই একাদশীর দিন শ্রীধামে পৌঁছান যাইবে।

বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! এই কয়েক দিন হইল মুষ্টি ভিক্ষা বন্ধ আছে, আজ একবার মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া নিতাইচাঁদকে দুইটি ভিক্ষার চাউল ভোগ দেওয়া যাক্।" কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলে মাজিদা গ্রাম ছাড়িয়া ঘোলাপাড়ার নিকট একখানি বাগানের মধ্যে গাছতলায় সকলে উপবেশন করিলেন। স্থানটী অতি মনোরম; সুতরাং সকলেরই সেই স্থানে থাকিবার মত হইল। বাবাজী মহাশয়ের মুখে মুষ্টিভিক্ষার কথা শুনিয়া অনেকেরই মনে আনন্দ হইয়াছে। সঙ্গীয় স্ত্রীলোকগণ তিন চারভাগে বিভক্ত হইয়া নাম করিতে করিতে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। বাবাজী মহাশয় নিজে একবার ভিক্ষায় বাহির হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সঙ্গিগণ ইঁহাকে বাধা দিয়া নিজেরা একদল ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ইনিও বহির্ব্বাসখানি খুলিয়া সম্মুখে বিছাইয়া দিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সকলে আমাকে কিছু কিছু ভিক্ষা দাও।" বলিয়া নাম করিতে লাগিলেন। বাগানটী লোকযাতায়াতের রাস্তার ধারে; সুতরাং ক্রমেই লোক জমা হইতে লাগিল এবং যাহার যাহা সাধ্য, সেই কাপড়ের উপর দিতে লাগিল। "যেই জন ভজে মোরে অনন্য হইয়া। তারে ভিক্ষা দেই মুঞি মাথায় বাহিয়া॥" ভগবানের এই বাক্য আজ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিক হইতে এরূপ ভাবে ভিক্ষা সংগ্রহ হইতে লাগিল যে, ইঁহাদের প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত হইয়া গেল। রান্না আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয়ের আদেশ—ভিক্ষালব্ধ কোন দ্রব্য সঞ্চয় করা হইবে না; যাহা কিছু উপস্থিত হইবে, সমস্তই রান্না করিতে হইবে। সেইরূপই হইতে লাগিল। এদিকে যথাসময়ে ইঁহারা স্নানাহ্নিকাদি শেষ করত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ গ্রামের মধ্যে অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া চারিদিক হইতে লোকসকল উধাও

হইয়া আসিতে লাগিল। নির্জ্জন কানন আজ জনতা-পরিপূর্ণ হইল। মহা হুলুস্থুল ব্যাপার! গ্রামবাসী কেহ বা কাঠ যোগাড় করিয়া আনিতেছে, আবার কেহ বা জল, কেহ বা কলাপাতা ইত্যাদি যাহার যেরূপ সাধ্য সে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। গ্রামবাসী লোকদিগের সেই আর্ত্তি-পরিপূর্ণ আগ্রহ দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইলেন। কাজেই আর কাহাকেও নিষেধ করিবার সাধ্য হইল না। অপূর্ব্ব কীর্ত্তনধ্বনিতে সকলেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীধাম নবদ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী-বাসিনীগণ সর্ব্বদাই কীর্ত্তন শুনিয়া থাকে; কিন্তু আজকার কীর্ত্তন যেন তাহাদের কানে অভিনব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতেছে, "দেখ, এরূপ কীর্ত্তন ত আমরা আর কখনও শুনি নাই। এক একটী কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন মনপ্রাণ এরূপভাবে আকৃষ্ট হইতেছে যে, জগৎ-সংসারের কথা ভুলাইয়া দিতেছে। নবদ্বীপে ত বরাবরই কীর্ত্তন হয় শুনিয়া থাকি কিন্তু এরূপ অবস্থা ত আমাদের আর কখনও হয় নাই। আর সে সমস্ত কীর্ত্তনের আসবাব যোগাড় কত! এক এক দলে চারি পাঁচ খানা খোল — বড় বড় ওস্তাদ বায়েন; তেম্নি বড় বড় তালে গান হয়। আর এ কিছুই নয়, একখানা খোল বাজিতেছে। সেরূপ কোন কঠিন তাল মান নয়; কিন্তু এক একটী কথায় যেন প্রাণ কেমন করিয়া দিতেছে।" কেহ বলিতেছে, "সে ব্যবসাদারী সংকীর্ত্তন, আর এ হইল নামসংকীর্ত্তন; ইহার শক্তি পৃথক ত হইবেই।" অপর কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ভাই! আমরা অনেক নাম-কীর্ত্তন শুনিয়া থাকি; কিন্তু এরূপ অবস্থা ত কখনই হয় না। ঐ যে ঐ মহাপুরুষটী আগে গাহিতেছেন, দেখ, উঁহার এক একবার কেমন অবস্থা হইতেছে! দেখিলেই ভক্তি জন্মে। উঁহারই শক্তি-প্রভাবে আমাদের ন্যায় পাষণ্ডেরও মতি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আহা মরি! দেখিলেই মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা করে। মনে হয় জ্বালা যন্ত্রণাময় এ মিথ্যা সংসারে আর কাজ নেই। এমন সুখময় সঙ্গে থাকিয়া দিন কাটাই।" আবার

কেহ বা উপহাসও করিতেছে। এইরূপে আপন আপন হৃদয়ের ভাব লইয়া সমালোচনা চলিতেছে। বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। যথাসময়ে রান্না শেষ হইলে ভোগ লাগিল। আবার ভোগ আরতি কীর্ত্তন অন্তে সকলে মহাপ্রসাদ পাইলেন। নিতাইচাঁদের কৃপায় ইঁহাদের সঙ্গীয় লোক ছাড়া প্রায় দুইশত আন্দাজ লোক প্রসাদ পাইল। আনন্দের অবধি নাই! হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার! খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে সন্ধ্যা হইল; কাজেই সে রাত্র সকলে সেই স্থানেই বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন।

আজ একাদশী। আহারাদির ব্যাপার তত বেশী নয়; কাজেই কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ, আজ একেবারে গঙ্গা পার হইয়া সমুদ্রগড়ে যাওয়া চাই।" সকলের তাহাই মত হইল। ঘোলাপাড়ার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া বেলা অনুমান সাড়ে দশটার সময় সমুদ্রগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রগড় ছাড়িগঙ্গা পার হইতে হইবে। খেয়াঘাট একটু ব্যবধান; অর্থাৎ প্রায় আধ মাইল দূর হইতে পার হইয়া আবার ঠিক সেই স্থানে আসিতে হইবে। একারণ অনেকেরই মত হইল যে, অতি অল্প জল, তাহাতে স্রোত নাই; সুতরাং হাঁটিয়াই পার হওয়া যাক্। এইরূপ বিচার হইতে না হইতেই বাবাজী মহাশয় জলে নামিলেন, ঐ দেখা দেখি অনেকেই জলে নামিয়া প্রায় অর্দ্ধ পথ গিয়াছেন, এই সময় স্থানীয় কয়েকটী লোক উঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিল, "আজ্ঞে! আর যাইবেন না, শীঘ্র উঠিয়া আসুন; কারণ এ গঙ্গায় ভয়ানক কুম্ভীর আছে।" শুনিবামাত্র অন্যান্য লোক শশব্যস্তে তীরে উঠিলেন। বাবাজী মহাশয় উঠিতেছেন না; কাজে কাজেই সঙ্গিগণও ইঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিলেন। তীরস্থ সেই লোক কয়েকটী বিশেষভাবে জেদ করায় অগত্যা ইঁহারা তীরে উঠিলেন। আনন্দময়ের লীলাখেলা সবই যেন আনন্দময়। এই যে জলে নামা উঠা

এইটীও যেন পরমানন্দের বিষয় হইয়া পড়িল। গ্রামের একপ্রান্তে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। ইঁহারা সকলে পার হইয়া উক্ত বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিলেন। এদিকে একাদশীতে কিরূপ কি বন্দোবস্ত হইবে, কর্ত্তাবাবাজী মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! আমার কোনই স্বতন্ত্র মতামত নাই; আপনাদের যেরূপ মত হইবে আমারও সেই মত।" বহু লোক সুতরাং মতও বহুরকম আছে! কেহ বা নিরম্বু, কেহ বা রাত্রে অনুকল্পকারী, কেহ কেহ বা দিনেই অনুকল্পকারী; কাজেই সেই সেইরূপ ব্যবস্থা হইতে লাগিল। অনুকল্পের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফলের যোগাড় হইয়াছিল। কয়েকটী স্ত্রীলোক বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে যে এই গ্রামের মধ্য হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া আনি, তাহাতে কোনও-রূপ আপত্তি আছে কি?"

বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন মা! ভিক্ষা করিয়াই ত সমস্ত করা উচিত এবং তাহাই হইতেছে; ইহাতে আপত্তির ত কোনই কারণ নাই।" শুনিয়া তাহারা অতি হৃষ্টচিত্তে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করত "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নাম করিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় স্নান আহ্নিকাদি শেষ করত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যদিও গ্রামের বাহিরে এক প্রান্তে বৃক্ষমূলে বসিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি গ্রামের মধ্যে কীর্ত্তন-ধ্বনি এরূপভাবে প্রবেশ করিতেছে যে, সকলেই সমানভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। একাদশীর অনুকল্প সামান্য কিঞ্চিৎ ফল মূল দেখিয়া বাবাজী মহাশয়ের মনে একটু ক্ষোভ হইয়াছিল যে, প্রায় তিন শত লোক কিরূপে এই সামান্য বস্তু দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিবে। যোগমায়ার কি অপূর্ব্ব যোগাযোগ! গ্রামবাসী লোক নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে নানারূপ জিনিষ আনিয়া দিতে লাগিল। এদিকে যে সমস্ত স্ত্রীলোক ভিক্ষার জন্য গ্রামে

গিয়াছিল, তাহারাও নানারূপ ফল, দুধ, মিষ্টি, এই সমস্ত লইয়া আসিল। বেলা অনুমান একটা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। যথাসময়ে ভোগ লাগিলে পরমানন্দে সকলে অনুকল্প করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে অনেকেই চাঁপাহাটী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পাটদর্শনে গমন করিলেন। কেহ কেহ বা সেই বৃক্ষমূলেই রহিলেন। যথাসময়ে দর্শনাদি শেষ করত সকলে সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া রাত্রিবাস করিলেন। প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ রওনা হইবেন, এই সময় গ্রামস্থ কয়েকটী ভক্ত ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "দেখুন, গত কল্য আপনারা উপবাস করিয়া আমাদের এই গ্রামের মধ্যে ছিলেন; কিন্তু আজ যদি পারণ না করিয়া যান, গ্রামের অমঙ্গল হইবে। অতএব আজ মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক যাইবেন।" ভক্তগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা সে বেলা সেই স্থানেই থাকিতে বাধ্য হইলেন। গ্রামবাসিগণ চাল ডাল তরীতরকারী প্রভৃতি যোগাড় করিয়া আনিতে লাগিল। এদিকে রান্না আরম্ভ হইল। ইঁহারা স্নানাহ্নিকাদির পর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন ঘন্টা খুব মাতামাতি কীর্ত্তন হইল। ভোগান্তে যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করত সকলে নাম করিতে করিতে শ্রীধাম নবদ্বীপ রওনা হইলেন।

—

কলিকাতার আখড়ায় অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন

আজ আবার শ্রীধামে নূতন আনন্দ। প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় সগণে "নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর" এই পদকীর্ত্তন করিতে করিতে নগরে বাহির হইয়াছেন। কয়েক দিন হইল বাবাজী মহাশয় শ্রীধামে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া আজ যেন আবার সমস্তই নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে। যাঁহার সহিত দেখা হইতেছে, তাঁহাকেই যথাযোগ্য প্রণাম বন্দনাদি করিয়া কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। এইরূপ ভাবে পরস্পর মিলনানন্দের সহিত কীর্ত্তনানন্দটী যেন ক্রমেই প্রবলভাব ধারণ করিতে লাগিল। বেলা অনুমান এগারটার সময় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। অপরাহ্নে কলিকাতার আখড়ার মহান্ত মহাত্মা শ্রীযুক্ত কিশোরদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমার বড়ই অভিলাষ হইতেছে যে, আখড়ায় একটী অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হয়।"

বাবাজী। বেশ ভাই! এ ত পরমানন্দের বিষয়।

মহান্ত। তার মধ্যে একটী কথা— ব্যবসাদারগণকে পয়সা দিয়া কীর্ত্তন করিতে গেলে তাহাতে সুখ হয় না। যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন এবং নিজেরা নিজেরা আরম্ভ করা যায় তবে বড়ই ভাল হয়।

বাবাজী। যদি করিতে হয় তবে সেইরূপ করাই দরকার।

মহান্ত। তবে কোন্ দিন আরম্ভ করা যাইবে ?

বাবাজী। বেশ ত! আজই অধিবাস হউক, কাল নাম হইবে।

শুনিয়া মহান্ত অতিশয় আনন্দ সহকারে সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। একলা নিতাইর সেবাইত শ্রীবিশ্বম্ভরদাস বাবাজী মহাশয় অতি উৎসাহের সহিত আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। বিহারীদাস, গৌরদাস প্রভৃতি আটজন বড় বড়

বায়েন উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মনের অভিলাষ, "বাবাজী মহাশয় বড় বড় তালে গান করিবেন, আমরা নিজ নিজ শিক্ষার কৌশল ও পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণতার পরিচয় বিশেষরূপে প্রকাশ করিব।" উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্তই বিপরীত হইল। বাবাজী মহাশয় সোজা তালে পদ ধরিয়াছেন। প্রথমত বাজিয়াদের মনটা একটু নরম হইয়া গেল বটে ; কিন্তু দুই এক কলি বাজাইতে না বাজাইতেই সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনের স্বাভাবিক নিয়ম যে, যখন যে ভাবের কীর্ত্তন করেন, তখন সেই ভাবটী মূর্ত্তিমান্ করিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। আজও তাহাই হইল। উপস্থিত সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা— কাহারই যেন বাহ্যস্মৃতি নাই। লোক লোকারণ্য। চারিদিকে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বলাবলি করিতেছেন যে, "আমরা অনেকের মুখেই ত অধিবাস কীর্ত্তন শুনিয়া থাকি ; কিন্তু ইহার মধ্যে যে এত আনন্দ— এত মাধুর্য্য আছে, ইহা ত এতদিন আমাদের ধারণা ছিল না। আজ যেন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা পুনঃ প্রকট হইয়াছে। অদ্বৈত-প্রভু এবং সীতাঠাকুরাণীর সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনটী যে কি মধু বর্ষণ করিতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সাধ্যাতীত।" যথাসময়ে কীর্ত্তন শেষ হইলে নাম ধরিলেন। ইঁহার সেই গগনভেদী কণ্ঠস্বরে ভক্তগণ উধাও হইয়া ছুটিতেছেন। কি আকর্ষণ। নাটমন্দিরে কে ধরে না তথাপি সকলের ইচ্ছা যে নামে যোগ দেয়। কীর্ত্তন শেষ করিয়া ইঁহারা আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কালস্য কুটিলা গতিঃ। এত আনন্দের পরেও সমালোচনা আরম্ভ হইল। এ সমালোচনা ব্যক্তিগত নহে, এ সমালোচনা নাম লইয়া। কেহ কিশোর দাস মহান্তকে বলিতেছেন, "তুমি অত বড় মহান্ত, তোমার আখড়ায় নূতন নাম হওয়া কখনও উচিত নহে।" মহান্ত একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত এই নামের মধ্যে নূতন নাম কোন্‌টী কিছুই বুঝিলাম

না, আপনারা আমাকে বুঝাইয়া দিন যে, "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই নামের মধ্যে কোন্ নামটী নূতন।" কেহ বলিতেছেন, "নাম নূতন না হইলেও মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় ত! মহাপ্রভু যখন 'হরে কৃষ্ণ' নাম বিতরণ করিয়াছেন, তখন আমাদের সেই 'হরে কৃষ্ণ' নাম ভিন্ন অন্যান্য নাম করা অন্যায়।" মহান্ত বলিলেন, "আচ্ছা আপনাদের মনে যদি কোনরূপ সন্দেহ জন্মে ত চলুন, বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল সন্দেহ দূর করিবেন।" বলিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক আমূল বৃত্তান্ত বলিলে, ইনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই নামটী উচ্চৈঃস্বরে খোল করতাল যোগে কীর্ত্তনস্থলে বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া আমার ত মনে পড়ে না। নবদ্বীপে প্রথম 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥' এবং 'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।' এই নাম কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও সংকীর্ত্তনের কথা শ্রীচরিতামৃতে উল্লেখ আছে বলিয়া ত আমার মনে হয় না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে— 'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম। এই মতে নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম॥' এইমাত্র আছে। তৎপর মহাপ্রভুকে যখন ভক্তগণ কীর্ত্তনের কথা প্রশ্ন করিলেন, তখন মহাপ্রভু স্পষ্টই বলিলেন—

শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য খণ্ডে ২৩শ অধ্যায়ে—

আপনি সভারে প্রভু করেন উপদেশ।
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সভার।
সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর ॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া ॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"
কীর্ত্তন কহিলু এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে ॥
প্রভুমুখে মন্ত্র পাই সভার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সভে গেলা নিজ বাস ॥
নিরবধি সবাই জপেন কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায়মনে করে ধ্যান ॥
সন্ধ্যা হৈলে আপন দুয়ারে সভে মিলি।
কীর্ত্তন করয়ে সভে দিয়া করতালি ॥

ঐ অধ্যায়ে অন্যত্র দিনান্তরে যথা ঃ—

নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ কোলাহল।
হরি বলি ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল ॥
"হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম।"
হরি বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান ॥
ঠাঞি ঠাঞি এই মত মিলি দশে পাঁচে।
কেহো গায়, কেহো বায়, কেহো মাঝে নাচে ॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হইল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে যায় ॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥”
কেহো কেহো নাচয়ে হইয়া একমেলি।
দশে পাঁচে নাচে কেহো দিয়া করতালি ॥ ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি খণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদে—

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে মহাকীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥
“হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥” ইত্যাদি।

আবার দক্ষিণ ভ্রমণকালে মহাপ্রভু—

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং ॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং ॥
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাং ॥”

এই নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। খোলকরতালযোগে ‘হরে কৃষ্ণ’ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার বিধান কিরূপে হয় ইহা ত আমার ধারণার অতীত। ঐ নাম যদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন হয়, তবে আর তাঁহার মহামন্ত্র নামের সার্থকতা কোথায় থাকে? মন্ত্র যখন অপ্রকাশ্য তখন মহামন্ত্রটী যে একেবারে আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়া বেড়াইতে হইবে, ইহার ভাব ত আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আবার যখন মন্ত্ররূপে উঁহাকে শিষ্যের কর্ণে প্রদান করিবার প্রথা রহিয়াছে, তখন উচ্চৈঃস্বরে কিরূপে কীর্ত্তন হয়, আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।

যদি বলেন শ্রীহরিদাস ঠাকুর উচ্চকণ্ঠে একলক্ষ ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম করিতেন। অতি সত্য কথা; এই জন্যই আমি বলিতেছি যে, হরে কৃষ্ণ

মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কারণ যে যে স্থানেই উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই সংখ্যা রাখিয়াছেন; সুতরাং সংখ্যা রাখিলেই সেইটী জপের মধ্যে পরিগণিত হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর অষ্টকে বর্ণনা করিয়াছেন—

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থি-শ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥

চৈতন্যচন্দ্রামৃতেও প্রবোধানন্দ সরস্বতীজী বলিয়াছেন—

বধ্নন্ প্রেমভর-প্রকম্পিত-করো গ্রন্থীন্ কটিডোরকৈঃ
সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গলহরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্।
অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেবহি জগন্নাথং দিদৃক্ষুর্গতা-
য়াতৈর্গৌরতনুর্ব্বিলোচনমুদং তন্বন্ হরিঃ পাতু বঃ॥

বাবা! আমি যে কোনও-রূপ জেদ করিয়া বলিতেছি, ইহা কেহ মনে করিবেন না। মহাপ্রভু যেমন অন্যান্য নাম কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছেন, যদি "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র ঐরূপ কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিতেন, তবে আর আমার কোনও-রূপ আপত্তি ছিল না।

তিনি স্পষ্টই বলিলেন—

প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

আবার পরেই বলিলেন—

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
কীর্ত্তন কহিলু এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥

তখন আর বিধি নিষেধের বাকী রহিল কি ?

এ ত গেল শাস্ত্রের কথা। নিজেদের মনে মনে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখুন। যদি পরম দয়াল নিতাই গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ না হইতেন, তবে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত! এই ব্রজভাবের উপাসনা আমরা কোথায় পাইতাম ? এমন কি প্রেম বলিয়া বস্তুটী যে আমাদের ন্যায় জীবের প্রাপ্তির বিষয় হইতে পারে, এইটীই ত এতকাল কেহ ধারণা করিতে পারে নাই। তবেই ভাবিয়া দেখুন, যিনি শিব ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ, ব্রজের নিগূঢ় প্রেম-সম্পত্তি যারে তারে বিলাইলেন, একবার কি তাঁহার নামটা পর্য্যন্তও আমাদের করিতে নাই ? দিনান্তে একবার কি তাঁহার নিকট একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটা আমাদের চিরসংস্কারবিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাজ্য ?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অষ্টম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—

বহু জন্ম করে যদি নামসংকীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥
হেন প্রেম চৈতন্যনিতাই দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়!
কৃষ্ণপ্রেম পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয়॥
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়॥
কৃষ্ণনামে করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর না হয় বিকার॥

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদগদাশ্রুধার॥
অনায়াসে সংসার ক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥

ইত্যাদি শত শত বাক্যে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ নিতাই গৌরাঙ্গকে ভজনা করিতে বলিয়াছেন। তবুও আমাদের এত আপত্তি যে, নিতাই গৌর নাম করিলেই নূতন নাম হইল। অন্যান্য সম্প্রদায়ী লোক যদি বলেন, তাহাও বরং প্রাণে সহ্য হয়; কিন্তু নিতাই গৌরাঙ্গের উপাসকগণ যদি বলেন যে, নিতাই গৌর বলিলে নূতন নাম করা হইল, তবে মনে করুন ইহাতে কার না মনে কষ্ট হয়? কোথায় আমাদের উপাস্য দেবকে যাহাতে সর্ব্বসাধারণে ভজে, এই চেষ্টা করিব, না তার পরিবর্ত্তে যে ভজিতে বা ভজাইতে যাইবে, তাহার উপর নানারূপ কটাক্ষ— নানারূপ নিন্দা। অর্থাৎ যাহাতে এই নাম লোকে গ্রহণ করিতে না পারে এই চেষ্টা। ইহাতে আমাদের পরের উপকার করা হইল, কি অপকার করা হইল ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। আমি মহান্তকে যে এই নামই করিতে হইবে

এরূপ জেদ করি নাই, যদি উঁহার ইচ্ছা হয়, তবে অন্য কোন নামও করাইতে পারেন।"

তখন বৈষ্ণবগণ বলিলেন, "কেন আমরা শুনিতে পাই যে আপনি নাকি অন্য কোনও নাম করেন না বা মানেন না!"

বাবাজী। আমার কথা বাদ দিন, আমি ত ঘোর পাষণ্ড, কিছুই জানি না, কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তবে এই কৃপা করুন, ভগবদ্‌বাক্যের বা নামের অথবা স্বরূপের একদেশে বিশ্বাস, অপরে অবিশ্বাস করিয়া যেন ভণ্ডের মধ্যে পরিগণিত হইতে না হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কিছুই না মানে হয় সেহ ত পাষণ্ড।
একে মানে আরে না মানে সেই মত ভণ্ড॥
পাষণ্ডের উদ্ধার করিব অবহেলে।
ভণ্ডের নিস্তার নাহি কোন কালে॥

যদিও এই বাক্যটীর স্বরূপগত প্রস্তাবে উল্লেখ হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বত্র জানিতে হইবে। প্রীতি, ভক্তি বা বিশ্বাস ত কিছুতেই নাই, তবে শ্রীগুরুদেবের আদেশে নিতাই গৌর নাম করিলে অন্য নাম অপেক্ষা হৃদয়ে একটু আনন্দ আসে তাই ঐ নাম করি। আমার বিশ্বাস— অতি বড় পাষণ্ড হইলেও একবার নিতাই গৌরাঙ্গ বলিলে তাহার হৃদয়ে আনন্দ আসিবেই আসিবে।

বৈষ্ণবগণ ইঁহার কথায় আর কিছু না বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক গমন করিলেন। ইনিও সকলকে প্রতিনমস্কার করিয়া বিশ্রাম করিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যুষে কিশোরদাস মহান্ত আসিয়া সগণে বাবাজী মহাশয়কে লইয়া গেলেন। নাম আরম্ভের পূর্ব্বে বাবাজী মহাশয় "কি নাম আরম্ভ হইবে?" মহান্তকে জিজ্ঞাসা করায় মহান্ত বলিলেন, আপনি নিঃসঙ্কোচে 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে

রাম ॥' এই নাম আরম্ভ করুন ইহাতে কেহ যোগদান করেন উত্তম, না করেন কি করিব! এ সমস্ত ভগবৎ-উপাসনা সম্বন্ধে আমি অন্য কাহারও মত শুনিতে চাই না; আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমাকে আপনার ছায়ার ন্যায় অনুগত মনে করিবেন।" বাস্তবিকই মহান্ত ঠিক এরূপ ভাবেই বাবাজী মহাশয়ের সহিত ব্যবহার করিতেন। বলিতে কি, এক এক সময় ইঁহার অনুগত ব্যক্তিগণ যেরূপ ব্যবহার করিতে অসমর্থ বোধ করিতেন, মহান্ত তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতেন। বাবাজী মহাশয়ও মহান্তের ভালবাসায় এতই বিমুগ্ধ হইলেন যে, সময়ে সময়ে নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহান্তের প্রীতি-বিষয়ক আবদার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। আজও তাহাই হইল। মহান্তের বিশেষ আগ্রহে নাম আরম্ভ করিলেন। বাজারের দোকানীগণ অবকাশ পাইলেই গিয়া নামে যোগ দিতে লাগিল। হয়ত এক একজন কোন কার্য্যান্তরে যাইতেছিলেন, নামের আকর্ষণে এরূপভাবে আকৃষ্ট হইলেন যে, সে সমস্ত ভুল হইয়া গেল। দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা কাটিয়া গেল— খেয়াল নাই। এইরূপ পরমানন্দে কোথা দিয়া যে দিন রাত চলিয়া গেল কে জানে!

পরদিবস বেলা অনুমান সাতটার সময় নগরকীর্ত্তন বাহির হইল। যে রাস্তা দিয়া কীর্ত্তন যাইতেছে, সে রাস্তা যেন টলমলায়মান হইতেছে। বাবাজী মহাশয় চরণে চরণ রাখিয়া নৃত্য করিতেছেন। সাত আটখানা খোল বাজিতেছে; নামের ধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইতেছে, চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। বহুস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক আখড়ায় পৌঁছিলেন। তথায় কিছুক্ষণ উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের পর সংকীর্ত্তন সমাপন-সূচক পদ ধরিলেন। আনন্দের অবধি নাই। বাবাজী মহাশয় অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন— দুইটী চোখের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন ইঁহার দেহে

বিরাজ করিতেছে। একলা নিতাইর সেবক শ্রীবিশ্বম্ভরদাস মহান্ত ও গৌরদাস বায়েন এক একবার মন-প্রাণ-মাতান এক একটীআখর দিতেছেন, আর যেন আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। "চৈতন্য বিলাস সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু, তার কণা চাহে কৃষ্ণদাস।" এই পদে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল— কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই,— আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতেছে। বেলা অনুমান একটার সময় দধিমঙ্গল করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীর্ত্তন সমাপ্তি করিলেন। ক্রমে সকলে স্নানাহ্নিকাদি শেষ করত মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

ঘটকবাড়ী কীর্ত্তন

এইরূপে নানাবিধ আনন্দে দিন যাইতে লাগিল। একদিন বাবাজী মহাশয় নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শ্রীযুক্ত গোপাল ঘটক মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছেন। ঘটক মহাশয় যদিও ভেকধারী বৈষ্ণব, তথাপি উঁহাকে সকলেই ঘটক মহাশয় বলিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকে। উঁহারা রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ, উপাধি ঘটক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাবাজী মহাশয়ের সহিত উঁহার ভ্রাতৃভাব। উভয়ে এক সঙ্গে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন —নানারূপ কথাবার্ত্তা হাসি-কৌতুক চলিতেছে। হঠাৎ ঘটক মহাশয় বলিলেন, "সেদিন কলিকাতার আখড়ায় অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনটী বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। একবার এই বাড়ীতে ঐরূপ অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন করিলে হয় না?"

বাবাজী। বেশ ত! আমিও মনে মনে করিতেছিলাম।

ঘটক। কি কি যোগাড় করিতে হইবে? একটী ফর্দ্দ করিলে ভাল হয় না কি?

বাবাজী। ভাই! ফর্দ্দ কি হইবে? তোমার ত সমস্তই জানা আছে; এক রকম করিয়া লইবে, আজই অধিবাস হইবে। আমি ঠিক সন্ধ্যার সময় খোল করতাল লইয়া উপস্থিত হইব।

ঘটক। রাত্রে মহাপ্রসাদ পাইবার যোগাড় করিতে হইবে ত?

বাবাজী। কি দরকার! সর্ব্বদাই ত বাবাজীরা তোমার উপর জুলুম করিয়া থাকে।

ঘটক। তাহা হইলেও ছেলেপিলে নাম করিয়া শুধু মুখে যাইবে, ইহা আমার সহ্য হইবে না।

বাবাজী। আচ্ছা, তোমার যাহা ইচ্ছা কর।

এই বলিয়া আশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে ঘটক মহাশয় পরমানন্দে নানারূপ যোগাড় করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বাবাজী মহাশয় সগণে নাম করিতে করিতে ঘটক মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়া অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। লোকে লোকারণ্য! আনন্দের পাথার বহিয়া যাইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনের এই একটু বিশেষত্ব যে যখন যে ভাবের বা যে রসের কীর্ত্তন করিবেন, তখন ঠিক সেই ভাব বা রস মূর্ত্তিমান্ করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের বোধগম্য করিয়া দিয়া থাকেন। আজও তাহাই হইল। শান্তিপুরের অদ্বৈতগৃহে যেন মহাপ্রভু সীতাঠাকুরাণীর সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছেন। বহুক্ষণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া উদ্দণ্ড নাম আরম্ভ করিলেন। বাজারের অনেক দোকানী পসারীগণ আসিয়া নামে যোগ দিতে লাগিল। রাত্র প্রায় এগারটার সময় নাম সমাপ্ত করিয়া মহপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিবস প্রাতে নাম আরম্ভ হইল। অপূর্ব্ব নামের রোল উঠিয়া নানা জাতীয় লোকদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বেলা অনুমান নয়টার সময় নিত্যরাধানন্দদাস বাবাজী এবং আরও পাঁচ ছয় মূর্ত্তি বাউল সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মূর্ত্তিকয়েকটীকে দর্শন করিবামাত্রই যেন ভক্তির উদ্রেক হয়।

সকলেই দীর্ঘাকার। সকলের অনাভিলম্বিত শ্মশ্রু। উঁহারা সংকীর্ত্তনের এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মঙ্গলময়ের কি ইচ্ছা! ঠিক ঐ সময় বাবাজী মহাশয় উপসনাতত্ত্ব, ভক্তি পথের কন্টক, আহারাদির সহিত উপাসনার অতি নিকট সম্বন্ধ, শ্রীমূর্ত্তির নিত্যত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে গান ধরিয়াছেন। সঙ্গিগণ "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" এই ধুয়া দ্বারা দোহারকী করিতেছেন। বাবাজী মহাশয়ের মুখে ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় পদস্ফূর্ত্তি হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছেন, আর চোখের জলে উঁহাদের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। উঁহাদের মধ্যে নিত্যরাধা বাবাজী ক্রমে বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। এক একবার এতই আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছেন যে, শুনিবামাত্র অতিবড় পাষণ্ডেরও হৃদয় দ্রব হইয়া যায়। তখন বাবাজী মহাশয় আবিষ্টভাবে পদ ধরিলেন—

যা গেছে যা গেছে যা, যা আছে সামাল তা,
এখনও সময় আছে ভাই।
পূর্ব্ব দোষ পরিহরি, মন প্রাণ এক করি,
ভজ ভজ গৌরাঙ্গ নিতাই॥
ধন্য কলি যুগ ধন্য, যাহে হইলা অবতীর্ণ,
নিতাই গৌরাঙ্গ দুটী ভাই।
পাপ তাপ মেগে নেয়, প্রেম ধন যেচে দেয়,
হেন দাতা আর ভবে নাই॥
জাতি কুল নাহি বাছে, যারে দেখে আপন কাছে,
প্রেমভরে দেয় আলিঙ্গন।
হেন প্রভু পরিহরি, মিছে অভিমান করি,
আপনাকে বাস একজন॥
নিশিতে মরিয়া যাও, দিবসে পরাণ পাও,
তিলে তিলে কত ভাব হয়।

ত্রয়াত্মিক-ব্যাধি যত, বেড়িয়া আছয়ে কত,
কি জানি কখন কিবা হয় ॥
হেন নর দেহ ধরি, দাস ভাব পরিহরি,
আপনাকে আপনি ভজাও।
বাসনার দাস হইয়া, মিছা লোক ভুলাইয়া,
রৌরব মাঝারে কেনে যাও ॥
কপটতা পরিহরি, ভজ নিতাই গৌরহরি,
অপরাধে পাবে পরিত্রাণ।
চিত্ত সন্ধ তম যাবে, প্রেমের উদয় হবে,
তবে তোর হইবে কল্যাণ ॥

এইরূপ যে কত পদ গাহিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? বেলা প্রায় বারটা হইল, কাহারই খেয়াল নাই। সকলেই প্রেমে মাতোয়ারা। সকলেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হঠাৎ গোপাল ঘটক মহাশয় বলিলেন, "দাদা! অনেক বেলা হইয়াছে। ছয় ঘণ্টা নাম করা হইল, এইবার স্নানাদি করিলে ভাল হয় না কি ?" বাবাজী মহাশয় যেন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় 'আচ্ছা ভাই তাহাই হউক' বলিয়া স্নানে যাইবেন, এই সময় নিত্যরাধাবাবাজী ইঁহার চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলে ইনি শশব্যস্তে উঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করত বলিলেন, "ভাই! ভয় কি ? পরম দয়াল অবতার। আমরা যতই স্বতন্ত্র হই না কেন, তিনি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।" এই হইতেই বাবাজী মহাশয়ের সহিত নিত্যরাধাবাবাজী মহাশয়ের ভ্রাতৃভাব জন্মিল। ক্রমে তিনি বিশুদ্ধাচারে নিজের আখড়ায় নিতাই গৌরাঙ্গ সেবা স্থাপন পূর্ব্বক একটী আদর্শ মহাপুরুষ হইলেন। এমন কি, উপাসনা সম্বন্ধে যখন যে সন্দেহ মনে উদয় হইত, বাবাজী মহাশয়ের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া সন্দেহ দূর করিতেন। এইরূপ পরমানন্দে সেদিন কাটিয়া গেল, পরদিবস বেলা আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় নগরকীর্ত্তন বাহির করিলেন। সেদিনকার

সে আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। যথাসময়ে নগর ভ্রমণ করতঃ বাড়ীতে আসিয়া নামযজ্ঞ সমাপনান্তে স্নানাদি কৃত্য সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

———

পুরী প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীধাম নবদ্বীপে বাবাজী মহাশয় সগণে এইরূপ নানাভাবের সংকীর্ত্তনানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন আশ্রমে বসিয়া আছেন, এই সময় হঠাৎ কটক হইতে আনন্দ মিত্রের অসুখ বলিয়া একখানি টেলিগ্রাম আসিল। ইঁহাকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীও ইঁহাকে কটক যাইবার জন্য বিশেষ জেদ করিতেছেন; কিন্তু ইনি কেবলমাত্র বলিতেছেন, "নিতাইর ইচ্ছায় যাহা হয় হইবে, আমি চেষ্টা করিয়া এ স্থানে আসিও নাই, যাইতেও পারিব না; তাঁহার কোন প্রয়োজন হয় পাঠাইবেন।" পূর্ব্ব হইতেই রামদাদা এবং নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বেলা তিনটার সময় ষ্টীমার ছাড়িবে। ঠাকুরের ভোগ রাগ হওয়ার পর পঙ্গত হইয়া গেল। ঠাকুরদের সেদিন পায়স ভোগ লাগিবার জন্য কিছু দুধ মিষ্টি প্রভৃতি যোগাড় হইয়াছে। ললিতা দাসীর ইচ্ছা যে সন্ধ্যার পর নিকুঞ্জ ভোগে পায়স করা ভাল; কারণ ঠাকুরের ভোগের পর বৈষ্ণবগণ সুস্থভাবে রাত্রে প্রসাদ পাইবেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "না, শ্রীরাধাকুণ্ড মিলনে ভোগ দেওয়া চাই! কারণ রাম এবং বটুর যাইবার পূর্ব্বে একটু মিষ্টিমুখ করিয়া যাওয়া ভাল।" শুনিয়া ললিতাদাসী বিশেষ উদ্‌যোগের সহিত শ্রীকুণ্ডে পায়সভোগ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আদেশে সকলকে বসাইয়া পঙ্গত করাইতেছে। এদিকে বাবাজী মহাশয়ও যেন

একটু ব্যস্ততা সহকারে প্রসাদ পাইলেন। যথাসময়ে সকলের প্রসাদ পাওয়ার পর রামদাদা এবং নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী রওনা হইবেন বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইতেছেন। যেমন উঁহারা বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক রওনা হইলেন, ইনিও অমনি চাদরখানি বগলে করিয়া উঁহাদের সঙ্গে রওনা হইলেন। সঙ্গিগণের মনে ধারণা যে বাবাজী মহাশয় কৌতুক করিতেছেন। ক্রমে যখন বাহিরে বাহির হইলেন, তখন ললিতাদাসী বলিল, "আজ্ঞে! যথার্থই কি আপনি রওনা হইবেন? কাল গ্রহণ গিয়াছে, সাতদিন যাত্রা নাই; এই অবস্থায় আপনি আমাদিগকে এইস্থানে রাখিয়া কিরূপে যাইবেন?" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অতি অল্পদিনে তোমাদের যেরূপ ব্যবস্থা হয় নিতাইচাঁদ করিবেন। তোমরা সাবধানে থাকিবে।" এই বলিয়া দ্রুতপদে ষ্টীমার-ঘাটের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ সকলেই চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় ইঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন এবং বিস্মিতভাবে পরস্পর বলাবলি করিতেছেন, "হ্যাঁগা সত্য সত্যই কি বাবাজী মহাশয় চলিয়া গেলেন? কি আশ্চর্য্য! একবার কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রকাশ নাই, কোনও বন্দোবস্ত নাই, কিছু বলা কহা পর্য্যন্তও নাই", কেহ বলিলেছেন, "বোধ হয় এইরূপ ভাবে ইনি কোথাও যাইবেন না; কেবল আমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন।" ইত্যাদি নানারূপ সমালোচনা হইতেছে, ইত্যবসরে রামদাদা, নিত্যস্বরূপ এবং বাবাজী মহাশয় গিয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। দেখিয়া সকলেই নিরাশপ্রাণে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয়, রামদাদা এবং নিত্যস্বরূপকে সঙ্গে লইয়া একদিন কলিকাতায় অবস্থান পূর্ব্বক কটক আনন্দ মিত্রের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। আনন্দবাবু পীড়িত হইলেও বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইবামাত্র আনন্দোৎফুল্লভাবে উঠিয়া ইঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত নিজ নিকটে বসাইলে ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা আনন্দ! কেন অসুখ হইল?"

আনন্দ। বাবা! আপনিই জানেন, আমি ত আপনার সন্তান, আমি আর কি বলিব!

বাবাজী। আচ্ছা, এই অসুস্থ হওয়ার দরুণ তোমার মনে কি হইতেছে?

আনন্দ। বাবা! আমার মনে হয় আমি অনেক পাপ ও অপরাধ করিয়াছি বা করিতেছি। সেই সমস্ত সংশোধন করিবার জন্য আপনি একটু মাত্র তাপ দিয়া আমার চৈতন্য করিতেছেন। কিন্তু আমি এমনই পাষণ্ড যে কিছুতেই আমার চৈতন্যলাভ হইল না।

বাবাজী। বাবা! চিন্তা কি! নিতাইর কৃপায় অনেক হইয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকী আছে, তাহাও তিনি অচিরাৎ সংশোধন করিয়া দিবেন।

আনন্দ। বাবা! ঔষধাদি অনেক খাইয়াছি এবং খাইতেছি; কিন্তু এইবার আমাকে কৃপা করুন, একমাত্র চরণামৃত অধরামৃত ছাড়া আর যেন কিছুই খাইতে না হয়।

বাবাজী। ভয় কি? সাধু ইচ্ছা যাহার, ভগবান তাহার সহায় হইবেনই হইবেন। জীবের সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে তাঁহার সত্তা নিত্যবিরাজমান। তিনি না থাকিলে জগৎ থাকিতে থাকিতে পারে না; কিন্তু জগৎ না থাকিলেও তিনি থাকিতে পারেন। তাই বলি, অভাব অভিযোগ তাঁহারই নিকট জানাও, তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল বৈ অমঙ্গল করিবেন না। তবে ঔষধ খাওয়া না খাওয়া নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর। নিজেতে প্রাকৃত মানুষভাব বজায় রাখিবার জন্য অনেক মহাত্মাকে দেখা যায়, তাঁহারা ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সেই ঔষধাদি ব্যবহার করিবার দরুণ তাঁহাদিগের ভগবানে বিশ্বাস বা ভক্তির হ্রাস না হইয়া বরং আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার ঔষধ খাওয়ায় যাহার সেই বিশ্বাস বা ভক্তির কোনও-রূপ হ্রাস দেখা যায় বা

নিষ্ঠার কোনও হানি জন্মে, তাহার পক্ষে না খাওয়াই বিধেয়। তবে আর একটী কথা— সাবধান! নিজে ঔষধ খাইবে না বলিয়া যেন কোন সাধু বা মহতের ঔষধ খাওয়া দেখিয়া কটাক্ষ বা অবজ্ঞাবুদ্ধি না আসে।

আনন্দ। আজ্ঞে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন সেই সমস্ত না আসে। আর আমার আত্মীয়-স্বজনগণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিন যে তাঁহারা যেন আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে আরও দুর্ব্বলতা জন্মাইয়া না দেন। আমার হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, যে মুহূর্ত্তে আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সকল অসুখ ভাল হইয়া গিয়াছে।

বাবাজী। বাবা! নিতাইচাঁদকে জানাও, তিনি মঙ্গলময়— মঙ্গল করিবেন।

এই বলিয়া আনন্দবাবুকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। আনন্দবাবুও বাবাজী মহাশয়ের অশেষ তাপহারী পরম মঙ্গলময় আলিঙ্গন প্রাপ্তে নিজেকে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে মুক্ত মনে করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। স্ত্রীকে ডাকিয়া নিজে বলিলেন, "দেখ, আজ আমি বাবার অধরামৃত পাইব এবং যে কিছু ঔষধ পত্র আমার ঘরে আছে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া দাও।" এ দিকে বাবাজী মহাশয়ের জন্য ঠাকুরের ভোগের যোগাড় করিয়া দেওয়া হইল। ইনি স্নান আহ্নিকাদি শেষ করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

অপরাহ্নে সব্‌ডেপুটী বালমুকুন্দ বাবুর বাড়ী হইতে লোক আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে লইয়া গেল। বালমুকুন্দবাবুর মাথা খারাপ হইয়াছে — তিনি উৎকট পাগল, এমন কি সম্পূর্ণ জ্ঞানচৈতন্যহীন। লোকের উপর নানারূপ অত্যাচার করেন বলিয়া হাত পা বাঁধা। উঁহার কাছে কাহারও যাইবার সাধ্য নাই। বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিবামাত্র ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "বাবা! আমি পাগল হইয়াছি, আমায় উদ্ধার করুন। আমি বড়ই অপরাধী, অনেক লোকের

মনে কষ্ট দিয়াছি, অনেকের উপর অত্যাচার করিয়াছি। বাবা! অনেক দিন আপনার দর্শন পাই নাই, আপনি একবার আমাকে কোলে নিলেই আমি ভাল হইয়া যাইব।” তখন বাবাজী মহাশয় উহার বন্ধন খুলিয়া দিতে বলিলেন। সকলে অতিশয় ভীত হইতেছেন ; কারণ একবার ছাড়া পাইলে হয়ত লোকের উপর অত্যাচার করিবে। বালমুকুন্দবাবু চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, “তোরা আমাকে একবারমাত্র খুলে দে, আমি প্রাণ ভ'রে বাবার কোলে যাইয়া পরম শান্তি পাই।” এইরূপ কাতর উক্তি শ্রবণে বাবাজী মহাশয় সকলকে বলিলেন, “বাবা! উহাকে একবার খুলে দাও, ও কোনই অত্যাচার করিবে না।” তখন উহাকে খুলিয়া দিবামাত্র অতি দ্রুতবেগে গিয়া বাবাজী মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিলে বাবাজী মহাশয়ও দৃঢ়-আলিঙ্গনদানে উহার পাপ তাপ দূর করত উহাকে বিশুদ্ধ করিলেন। কোল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র যেন একেবারে স্থির হইয়া গেলেন। আর সে ঔদ্ধত্য নাই, বাচালতা নাই। ঠিক পূর্ব্বের মত শান্ত ভাবে বাবাজী মহাশয়ের নিকটে বসিয়া আছেন। তখন বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা! বল দেখি কিরূপে তোমার এই অবস্থা হইল?”

বালমুকুন্দ। আজ্ঞে! আমি সেটেলমেণ্টের কার্য্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে নিমাপাড়া যাই। উক্ত নিমাপাড়ার আখড়ায় জরিপাদি করিতে গিয়া সেই সমস্ত বাবাজীদের সঙ্গে একটু মনোমালিন্য হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই আমার মনে হয় যেন অপরাধ হইয়াছে, তাই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

বাবাজী। বাবা! বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। আমি তোমাকে প্রথম যখন দেখি, তখনই আমার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, কোনওরূপ বৈষ্ণব অপরাধ ঘটিয়াছে। তাই তোমাকে এই সমস্ত কথা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, নিতাইর ইচ্ছায় যাহা হইবার হইয়াছে; এখন সাবধান হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণবেতে ঘটে যদি ক্ষুদ্র অপরাধ।
মহা মহা ভজনেতে প'ড়ে যায় বাদ ॥" ইত্যাদি—

কেবল বৈষ্ণব বলিয়া নয়, প্রাণিমাত্রে কোনরূপ উদ্বেগ দিলেই তাহার নিকট অপরাধ হইবে এবং সেই অপরাধে নিজের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল হইবে একথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কায়মনোবাক্যে সকলের সন্তোষ বিধান করিবে। আমার মতে তুমি একবার সেই স্থানে গিয়া যথাসম্ভব তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, পরম মঙ্গল হইবে। তখন বালমুকুন্দবাবু বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলে বাবাজী মহাশয় উহাকে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক নানারূপ সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করত শ্রীধামপুরী রওনা হইলেন।

যথাসময়ে ট্রেন পুরী ষ্টেশনে পোঁছিলে বাবাজী মহাশয় যেমন নামিয়াছেন, অমনি ষ্টেশনমাষ্টার এবং অন্যান্য রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নানারূপ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে যতই সহরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন, ততই লোকজন বেশী আকৃষ্ট হইয়া কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে নানারূপ সুখদুঃখের কথা বলিতেছে এবং শুনিতেছে। বাবাজী মহাশয় ঐ অবস্থাতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিয়া ঝাঁজপিটা মঠে গমন করিলেন। সঙ্গিগণ প্রায় অনেকেই শ্রীধাম নবদ্বীপে রহিয়াছে, কাজেই আশ্রমে লোকসংখ্যা কিছু কম। তবুও আশ্রমে ত্রিসন্ধ্যা নিয়মিত কীর্ত্তন এবং জগন্নাথের মন্দিরে কীর্ত্তন চলিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েকদিন যায়। একদিন কেন্দ্রাপাড়া হইতে শ্যামসুন্দরবাবু প্রভৃতি আসিয়া সগণে বাবাজী মহাশয়কে কেন্দ্রাপাড়া লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "সকলে শ্রীধাম নবদ্বীপ রহিয়াছে, আমি একমাত্র পুরীতে আসিয়াছি। উহারা সকলে আসিলে তবে নিতাইর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে! আমাদের ইচ্ছা যে শ্রীবলদেবজীউর চন্দনযাত্রা

একবার দেখা হয়। যদি আদেশ করেন তবে উঁহাদের সকলকে আনিবার জন্য কিছু খরচ পাঠাইয়া দিই।

বাবাজী। বলদেবজীউর চন্দনযাত্রা দর্শন করিয়া পুরীতে মদন-মোহনের চন্দনযাত্রা দর্শন করা সম্ভব হইবে কি ?

শ্যামসুন্দর। আজ্ঞে স্বচ্ছন্দে দুইস্থানের চন্দনযাত্রা দর্শন হইবে। একবার অনুমতি করুন, শ্রীধামনবদ্বীপ হইতে কতজনের আসিবার কথা।

বাবাজী। তোমাদের যখন একান্তই চেষ্টা তাহাদিগকে শ্রীধাম-নবদ্বীপ ছাড়া করিবে, তখন আমি আর বাধা দিব কেন! সকলকেই ত তোমরা জান, তাহাদের নাম ধরিয়া ধরিয়া চিঠিতে লিখিয়া দাও তাহা হইলেই সুবিধা হইবে।

শুনিয়া শ্যামসুন্দরবাবু নাম ধরিয়া নবদ্বীপে পত্র লিখিলেন এবং উঁহাদের আসিবার জন্য একশত টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন। বাবাজী মহাশয়ও একখানি পত্রদ্বারা সকলকে পুরী আসিতে আদেশ করিলেন। পুরী যাইবার আদেশ পাইয়া সঙ্গিগণের মনে আনন্দ আর ধরে না। মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের ন্যায় আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে ষ্টীমার যোগে কলিকাতা এবং তথা হইতে রেলে পুরী রওনা হইলেন। যথাসময়ে পুরী পৌঁছিয়া নাম করিতে করিতে ঝাঁজপিটা মঠে গমন করিলেন। মঠে উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইবামাত্র সকলে সমকালীন উচ্চৈঃস্বরে ঠিক বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে ইঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। তখন বাবাজী মহাশয় উঁহাদিগকে ফেলিয়া আসিবার দরুণ একটু লজ্জিতের ন্যায় সাশ্রুগদগদকণ্ঠে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে উঁহাদিগকে আশ্বস্ত করতঃ আলিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। এদিকে কেন্দ্রাপাড়ার শ্যামসুন্দরবাবু উঁহাদের আসিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; যেমন উঁহারা পৌঁছিয়াছেন, অমনি বাবাজী মহাশয়কে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইনি তিনদিন পরে যাইবার আদেশ করিলে

তদনুযায়ী কার্য্য হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্টদিনে সগণে কেন্দ্রাপাড়া রওনা হইলেন। যথাসময়ে বলদেবজীউর চন্দনযাত্রা উৎসব আরম্ভ হইল। আনন্দের অবধি নাই। কীর্ত্তনানন্দে কেন্দ্রাপাড়া টলমলায়মান। বহুদিন পরে আবার কেন্দ্রাপাড়াবাসী-বাসিনীগণ ইঁহাদের মধুময় সঙ্গ প্রাপ্তে যেন দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিত হইল। এইরূপ পরমানন্দে কয়েকদিন কেন্দ্রাপাড়ায় অতিবাহিত হইল। পুরী মদনমোহনের চন্দনযাত্রা আগতপ্রায়; তজ্জন্য আর বেশীদিন তথায় থাকা হইল না। কেন্দ্রাপাড়াবাসীদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। শ্যামসুন্দরবাবু এবং গোকুলবাবু বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে পুরী আসিলেন।

বিবিধ ঘটনা

শ্রীধাম পুরীতে আজ আনন্দের আর সীমা নাই। চন্দনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন নরেন্দ্রসরোবরে কেলি করিতে গমন করিতেছেন। পুরীবাসীবাসিনীগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া চন্দনমালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। বাবাজী মহাশয় সপরিকরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে আপামর সাধারণের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া বেড়াইতেছেন। শ্রীল মদনমোহন শ্রীমতীকে সঙ্গে লইয়া নৌকাকেলি করিতেছেন, ইঁহারাও ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া পরমানন্দে জলকেলি করিতেছেন। এইরূপে একুশ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অতি সমারোহের সহিত পরমানন্দে চন্দনযাত্রা উৎসব সমাধা হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা এবং সুদর্শন এই চারিজন স্নানবেদীতে শুভবিজয় করিলেন। বাবাজী মহাশয় গণসহ পরমানন্দে নানারূপ পদপদাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকে

লোকারণ্য! আনন্দের অবধি নাই। আগন্তুক যাত্রিসকলের পক্ষে যেমন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনের বিষয় হইয়াছেন, তেমনি বাবাজী মহাশয়ও দর্শনীয় হইয়াছেন। লোকসকল ঠেলাঠেলি করিয়া সংকীর্ত্তনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করত অনিমেষনয়নে বাবাজী মহাশয়কে নিরীক্ষণ করিতেছে, আর ইঁহার শ্রীমুখনির্গত অপরূপ পদাবলী শ্রবণে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছে। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার উপলক্ষে পুরীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের লোকই অধিক পরিমাণে উপস্থিত হইয়া থাকে। উহারা কোনও বাড়ীঘর ভাড়া করে না, প্রায় জগন্নাথের মন্দিরেই সময় কাটাইয়া দেয়; সুতরাং উহারা পিছনটান রহিত হইয়া অনন্যমনে সংকীর্ত্তনে যোগ দিতেছে। মাতামাতি কীর্ত্তন। স্নানাদি শেষ হইয়া গেল, তথাপি কীর্ত্তনানন্দ সমান ভাবেই চলিতে লাগিল। এইরূপ পরমানন্দে অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কীর্ত্তন সমাপ্ত করত ঐ স্নানবেদীর উপরেই সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাত্রে হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের একটু জ্বর হইল। ইঁহার জ্বর হইলে প্রায়ই বুকে বেদনা হয়, এবারও তাহাই হইল। বুকে এবং উভয় পার্শ্বে ভয়ানক শ্লেষ্মার বেদনা হইল। ইঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও সঙ্গিগণ রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত মাগুণী মিশ্র মহাশয়কে আনিয়া ইঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় বাবাজী মহাশয়কে গুণ্ডিচাবাড়ী যাইতে নিষেধ করিলে ইনি বলিলেন, "বাবা! আমি কেবল দর্শনমাত্র করিয়া আসিব। মার্জ্জন ক্ষালনলীলা এবং কীর্ত্তন প্রভৃতি ইহারাই করিবে।" কবিরাজ মহাশয় যাহাতে কোনও-রূপ ঠাণ্ডা না লাগে, সেইরূপ ভাবে চলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "সে জন্য আপনার কোনও-রূপ ভাবিতে হইবে না, আমি কেবল মাত্র দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিব।"

সংকীর্ত্তন বাহির হইলে ইনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিছুদূর যাইতে

না যাইতেই কি মন হইল, একেবারে সংকীর্ত্তনের মধ্যে গিয়া নাম ধরিলেন। আনন্দের আর অবধি নাই! কে কাহার কথা শুনে? সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক মার্জ্জন আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববৎ অতিশয় আনন্দের সহিত গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা শেষ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সঙ্গিগণ মনে মনে বড়ই আশঙ্কিত; কারণ অতিশয় ঠাণ্ডা লাগিয়াছে; পাছে বাবাজী মহাশয়ের শরীর বিশেষরূপ অসুস্থ হয়; কিন্তু প্রভুর কি ইচ্ছা! বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা সেদিন বেশ সুস্থ রহিলেন; এমন কি, কোনও দিন যে ইঁহার শরীর অসুস্থ ছিল, এরূপ কোনও চিহ্ন রহিল না।

পরদিবস প্রভাতে নিজ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করত নাম করিতে করিতে সঙ্গিগণসহ জগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন করিলেন। যথাসময়ে বলদেব, সুভদ্রা, সুদর্শন এবং জগন্নাথদেবের পহুণ্ডীবিজয় হইল। সেদিন আর রথ বেশী দূর টান হইল না। পরদিবস অতি প্রত্যূষে বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে স্নান করিবার আদেশ করিয়া নিজেও স্নানাদিকৃত্য শেষ করত নাম করিতে করিতে জগন্নাথদেবের রথাগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রাণের আবেগে জগন্নাথকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বেলা অনুমান সাড়ে এগারটার সময় জগন্নাথদেবের রথ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ও আত্মহারাভাবে রথাগ্রে ইঁহার প্রাণের প্রাণ নিতাই গৌরাঙ্গকে সঙ্গে লইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পুরীর তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাকউড সাহেব ইঁহার কীর্ত্তনে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। সাহেবটী অতি সদাশয় এবং শান্তস্বভাব। একটী বালকের সহিতও হাসিমুখে কথা কহেন। তাঁহার ব্যবহারে বোধ হয় যে, অভিমান-মদিরা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহারই বিশেষ যত্নে জগন্নাথের রথ সেদিন জগন্নাথবল্লভ পর্য্যন্ত পহুঁছিল। পরদিবস যাহাতে সকাল সকাল রথটান হইয়া একেবারে গুণ্ডিচামন্দিরে ঠাকুর প্রবেশ করেন, সাহেব

সেই বিষয়ে সকলের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন আপনি অতি সকালে সংকীর্ত্তন লইয়া আগমন করিবেন ; কারণ আপনার নৃত্য ও কীর্ত্তন না হইলে জগন্নাথের রথ কখনই চলিবে না।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বাবা! সে আমাদের নয়, আমাদের প্রভু নিতাই গৌরাঙ্গের নৃত্য-কীর্ত্তন, জগন্নাথের রথচালক বটে।" সাহেব বলিলেন—"সে যাহা হউক, আমি ত দেখি আপনি যখন যেরূপ ভাবে অর্থাৎ ধীরে বা দ্রুতগতি কীর্ত্তন লইয়া চলেন, জগন্নাথও ঠিক সেইরূপ ভাবে চলেন।" এইরূপ নানা কথোপকথনের পর সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস প্রথম বলভদ্র ও সুভদ্রার রথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গুণ্ডিচাবাড়ী গিয়া পহুঁছিল। জগন্নাথদেবের রথ টান আরম্ভ হইল। চলিতে চলিতে পুলের নিকট গিয়া রথ এরূপ ভাবে দাঁড়াইল যে, বহু চেষ্টা করিয়াও এক পা চালাইবাব সামর্থ্য হইতেছে না। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া রাস্তার একপার্শ্বে বসিয়া আছেন, এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গিয়া বলিলেন, "আপনি একবার চলুন, আমার বিশ্বাস, আপনি রথ টান দিলেই রথ চলিবে।" বাবাজী মহাশয় তখন আরক্তিম ছলছল নয়নে, গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! আমি জীব, আমার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু একবার মাত্র স্পর্শ করিলেই রথ চলিবে। চলুন লীলাময় শ্রীজগন্নাথের এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলামাধুরী প্রত্যক্ষ দেখিয়া জীবন ধন্য করি।" বলিয়া **বোল শ্রীনিত্যানন্দ** বলিতে বলিতে আবিষ্ট ভাবে স্খলিত গতিতে একেবারে রথের পশ্চাৎভাগে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রথের অগ্রভাগে গিয়া খুব উৎসাহের সহিত রথ টানিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে রথের পশ্চাৎ ভাগে মাথা দিয়া ঠেলিতে লাগিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় রথ চলিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়

তখন হৃষ্টচিত্তে রথের অগ্রে গিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইচ্ছাময় প্রভুর গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? অতি অল্পসময়ের মধ্যেই রথ গুণ্ডিচাবাড়ীর দ্বারদেশে গিয়া উপনীত হইল। জগন্মোহনের জগজন-মনোমোহিনী লীলাখেলা দর্শনে আপামর সাধারণ জনগণ আনন্দে বিভোর হইলেন।

পরদিবস জগন্নাথদেব যথাসময়ে গুণ্ডিচামন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরমানন্দে সেবাদি চলিতে লাগিল। হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের বুকে পূর্ব্ববৎ ভয়ানক বেদনা এবং জ্বর হইয়া পড়িল! আশ্রমবাসী সকলে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে ইঁহাকে সুস্থ করিবেন এই চেষ্টায় সকলে ব্যগ্র! নানারূপ গরম কাপড় প্রভৃতি দ্বারা বুক বাঁধিয়া রাখিলেন। সকাল বেলা রাজবৈদ্য মাগুনী মিশ্র মহাশয় আসিয়া বিশেষ সাবধানে থাকিবার ব্যবস্থা দিলে বাবাজী মহাশয় ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিলেন।

বেলা অনুমান এগারটা, এই সময় নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাক্‌চী, শিতিকণ্ঠ গোস্বামী প্রভৃতি চারি পাঁচজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের শরীর অসুস্থ শুনিয়া উঁহারা ইঁহাকে সংবাদ দিতে অনিচ্ছুক হইলেও ইনি শশব্যস্তে বাহির হইয়া উঁহাদের সহিত নানারূপ ইষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আপনারা স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করুন, পরে বৈকালে দর্শনাদি করিবেন।" তখন তারাবাবু বলিলেন, "দেখুন, আমি একবার ধুলো পায়ে দর্শন না করিয়া কিছুই করিব না।"

বাবাজী। দেখুন, এ ধামে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যই প্রধান! অগ্রে মহাপ্রসাদ পাইলে ভাল হইত নাকি? বিশেষতঃ জগন্নাথদেব সম্প্রতি গুণ্ডিচা-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। গুণ্ডিচামন্দির এখান হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এই দুই প্রহরের সময় অত দূর যাইতে বড়ই কষ্ট হইবে।

তারাবাবু। আজ্ঞে! কষ্ট ত হইবেই, তবে মনে প্রবোধ মানা চাই ত? শাস্ত্র, যুক্তি প্রভৃতি যাহাই হউক না কেন, মন মানা চাই ত? সুতরাং আপনি আমাদের সঙ্গে একটী লোক দিন, আমরা একবার দর্শন করিয়া তবে অন্যান্য যাহা কিছু হয় করিব।

বাবাজী মহাশয় তারাবাবুর নিষ্ঠা দেখিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "দেখুন, আর লোক কি হইবে? চলুন, আমিই আপনাদের সঙ্গে যাই।"

তারাবাবু। আজ্ঞে না, আপনার শরীর অসুস্থ; আপনার যাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে রাস্তাটা দেখাইয়া দিবে, যে কোনও একটী ছেলে হইলেই হইবে।

বাবাজী মহাশয় সে কথা না শুনিয়া বুকের ফ্লানেল প্রভৃতি খুলিয়া যখন ইঁহাদের সঙ্গে বাহির হইলেন, তখন শিতিকণ্ঠ গোস্বামী বলিলেন, "দাদা! তুই এক যোড়া করতাল নিলে ভাল হইত নাকি?"

বাবাজী। ভাই! সে ত নিতেই হইবে; কারণ আমরা কলিহত দুর্ব্বল জীব; কোনও যান আরোহণে ভিন্ন অতদূর রাস্তা কিরূপভাবে যাইব? গেলেও অত্যন্ত কষ্টবোধ হইবে ত! সুতরাং নামের রেলে চড়িয়া যাওয়াই বিশেষ প্রয়োজন।

এই বলিয়া "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম ধরিয়া বাহির হইলেন। সঙ্গে খোল করতাল চলিল। অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! সংকীর্ত্তন ক্রমে হেরাগৌরীসাহি দিয়া যখন বড় রাস্তায় পঁহুছিল, তখন আর কাহারই দেহস্মৃতি নাই। লোকে লোকারণ্য। সকলেই বিভোর, সকলেই হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর মুখে নাম করিতেছেন। যখন বাবাজী মহাশয় মূলে কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন শিতিকণ্ঠদাদা নৃত্য করিতেছেন, আবার যখন শিতিকণ্ঠদাদা মূলে কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন ইনি নৃত্য করিতেছেন। উভয় দেহে সাত্ত্বিকবিকারগণ

সমকালীন সমানভাবে খেলা করিতেছে। তারাবাবু প্রভৃতি এক একবার বিভোরভাবে গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন, "আমরা নবদ্বীপবাসী; বহু বহু সংকীর্ত্তন শুনিয়া থাকি; কিন্তু আমার জন্মে এরূপ আনন্দ আর কখনও উপভোগ করি নাই।" দেখিতে দেখিতে সংকীর্ত্তনদল গিয়া গুণ্ডিচাবাড়ী প্রবেশ করিল। মধ্যাহ্নধূপের অনুরোধে জগন্নাথের দরজা বন্ধ হইতেছিল, বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া স্থগিত রহিল। মনের আনন্দে ইঁহারা সকলে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলেন। তারাবাবু কিছু ক্লান্ত হইয়াছেন দেখিয়া ঐস্থানেই মহাপ্রসাদের বন্দোবস্ত হইলে চিরপ্রচলিত ভেদাভেদবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক সকলে একত্রে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া নাম করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন! তারাবাবু প্রভৃতি সকলেই পরিশ্রান্ত; সুতরাং আশ্রমবাসিগণ নানারূপ সেবাশুশ্রূষা দ্বারা সকলকে সুস্থ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা আরত্রিক প্রভৃতি কীর্ত্তন অন্তে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ পাইয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস কেন্দ্রাপাড়ার জমীদার বাবু রাধাশ্যাম নরেন্দ্রের 'জেনামঠ' নামক স্থানে আশ্রমবাসী সকলের নিমন্ত্রণ। বলরামবাবু এবং শ্যামসুন্দর বাবু আসিয়া তারাবাবু প্রভৃতিকে বিশেষ আগ্রহের সহিত লইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আনন্দের অবধি নাই। শিতিকণ্ঠ গোস্বামী, বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেছেন। উঁহার দেহে অপূর্ব্ব ভাবের বিকাশ; এক একবার যেন শিমূলের কাঁটার ন্যায় অঙ্গসকল রোমাঞ্চিত হইতেছে। অশ্রু কম্প যেন অঙ্গের ভূষণ হইল; লোকে লোকারণ্য— সকলেই আনন্দে বিভোর। তারাবাবু প্রভৃতি যেন কেমন একরূপ হইয়া গেলেন। কখনও নৃত্য, কখনও হাসি, কখনও কান্না; আজ যেন সকলেই নূতন জীবন লাভ করিলেন।

বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর রাত্র অধিক হইয়াছে দেখিয়া বলরামবাবুর অনুরোধে সকলে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের

দক্ষিণদিকে তারাবাবু এবং বামদিকে শিতিকণ্ঠ গোস্বামী বসিয়াছেন। যেমন মহাপ্রসাদ পাতায় পড়িল, অমনি বাবাজী মহাশয় নানারূপ ডাল তরকারী মিশ্রিত করিয়া একগ্রাস তারাবাবুর মুখে দিয়া অর্দ্ধাংশ শিতিকণ্ঠ গোস্বামীর মুখে দিলেন এবং তদবশেষ ক্রমে নবদ্বীপ হইতে আগত ব্রাহ্মণ কয়েকটীর মুখে প্রদানপূর্ব্বক নিজমুখে দিলেন। সকলেই মহাপ্রসাদ পাইতে আরম্ভ করিলেন। জানি না তারাবাবুর মনে কি ভাবের উদয় হইল। হঠাৎ উঠিয়া পরিবেশনকারী এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটী খালি ডালের হাঁড়ি লইয়া সকলের পাতা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধরামৃত তুলিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদের কৃপা! তারাবাবু যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। নবদ্বীপস্থ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলাভিমান যেন ভয়ে কোথায় লুক্কায়িত, পদমর্য্যাদা যেন সুদূরে পলায়িত! গৃহাভ্যন্তর হইতে বারান্দায়, ক্রমে বারান্দা হইতে অঙ্গণে, অঙ্গণ হইতে বাহিরের ঘরে, তৎপর রাস্তায় যাহারা নীচজাতি, দুঃখী-কাঙালী বসিয়াছিল, তাহাদের পাতা হইতেও অধরামৃত তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত হাঁড়িতে রাখিলেন। অবশেষে একটী কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পাতা হইতে অধরামৃত তুলিতে গিয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া গেলেন। এদিকে দর্শকবৃন্দ নবাগত বিশিষ্ট ভদ্রবাবুর ঐরূপ অবস্থা দর্শনে মহাপ্রসাদের কৃপার জয় দিতে লাগিলেন। ক্রমে তারাবাবু ঐ সমস্ত মহাপ্রসাদ মাখিয়া পূর্ব্বানুক্রমে অর্থাৎ নিম্নদিক্ হইতে সকলের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া, যখন বাবাজী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন বাবাজী মহাশয় সাশ্রুগদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন— "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে। আহা মরি কি অপূর্ব্ব কৃপা! কৃষ্ণ যখন কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখান আপনে॥ স্বতঃপ্রকাশ এই বিশ্বাসের বালাই যাই।" বলিয়া উক্ত অধরামৃত একগ্রাস লইয়া তারাবাবুর মুখে কিঞ্চিৎ অর্পণপূর্ব্বক নিজে অবশেষ পাইলেন। তারাবাবুও

একগ্রাস লইয়া বাবাজী মহাশয়ের মুখে কিঞ্চিৎ প্রদান করত অবশেষ নিজমুখে দিলেন। চারিদিকে সকলে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল। এইরূপ পরমানন্দে মহাপ্রসাদ পাওয়া শেষ হইলে পূর্ব্ববৎ নামকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে মঠে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। তিনদিনকাল এরূপ নানা-ভাবের আনন্দে কাটাইয়া তারাবাবু প্রভৃতি কয়েকজন নবদ্বীপ গমন করিলেন।

* সঙ্গিগণের উপর বাবাজী মহাশয়ের আদেশ যে "মঠে ত্রিসন্ধ্যা নাম-কীর্ত্তন, সমুদ্রস্নান, জগন্নাথদর্শন ও জগমোহনে সংকীর্ত্তন করা চাই।" ঝাঁজপিটা মঠের ভিক্ষার ভার প্রায়ই মধুদাদার উপর থাকে। কখনও বা বাবাজী মহাশয় যাহাকে আদেশ করেন সেই করে। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই নবদ্বীপদাদা ও গোবিন্দদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এই পুরী সহরের প্রত্যেক গলি গলি তোমরা দুইজনে ভিক্ষা করিবে এবং উক্ত ভিক্ষায় যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবে সমস্ত আনিয়া আমার হাতে দিবে।" উভয়ে তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। যথাসময়ে উঁহারা ভিক্ষা করিয়া আশ্রমে আসিবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয় নিজে ঝোলা গ্রহণ করিয়া তবে ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েকদিন যায়, একদিন ভিক্ষা শেষ করিয়া নাম করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ গোবিন্দদাদার নিকট হইতে যেমন ঝোলাটী গ্রহণ করিলেন, অমনি সখ্যভাবে নিমগ্ন সুরসিক গোবিন্দদাদা কতকগুলি কটুভাষা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ সকলেই অবাক্! বাবাজী মহাশয়ও বিস্মিতভাবে ঝোলাটী মাথায় ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রায় দশ মিনিট সময় এইরূপ অবস্থার পর গোন্দিদাদা বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক পঙ্গত ঘরের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন ইনি

* এই ঘটনাটী ৩য় খণ্ডে ছাপা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যথা সময়ে সংগ্রহ না হওয়ার দরুণ এইস্থানে দেওয়া হইল।

ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে গোবিন্দ ! তোর কি মাথা খারাপ হইয়াছে ?"

গোবিন্দ। কেন, কি হইল ?

বাবাজী। আমি ঝোলা নিলাম বলিয়া ঐরূপ গালাগালি করিলি কেন।

গোবিন্দ। কৈ আমি ত গালাগালি করি নাই, তবে আপনি আদেশ করিয়াছিলেন, যে 'ভিক্ষায় যাহা কিছু পাইবে সমস্ত আনিয়া আমাকে দিবে।' সুতরাং যাহা পাইয়াছি সমস্তই দিতে হইবে ত ! চা'ল ডা'ল প্রভৃতি আপনাকে দিলাম, আর ঐ গালাগালিগুলি যদি আমরা রাখি, তবে হজম করিতে পারিব কেন ? হয়ত সে ভর্ৎসনাকারী ব্যক্তিকে কখন দেখিলে মনে প্রতিহিংসা ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে। তাই ওগুলিও যথাস্থানে অর্পণ করিলাম।

শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় গোবিন্দদাদাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাশ্রু গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "ধন্য রে গোবিন্দ ! এই নিষ্কপট বিশুদ্ধ ব্যবহারে আমি তোর নিকট বিক্রি হইলাম। এই অভিপ্রায়েই আমি তোদের উপর ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলাম। এইরূপভাবে নানা কথাবার্ত্তার পর সকলে নিজ নিজ সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

কয়েক দিন যায়, একদিন রাজবাড়ীর গলি-রাস্তার মধ্যে দুইজনে ভিক্ষা করিতে প্রবেশ করিয়াছেন, হঠাৎ একটী লোক আসিয়া বলিল, "ওহে বাবাজী ! এ রাস্তায় নাম করা নিষেধ, তোমরা ফিরে চলে যাও।" নবদ্বীপদাদা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন বাবা ! এস্থানে কি কালের অধিকার নাই ? কংস রাজার পরে আজি পর্য্যন্ত এমন কথা ত কখনও শুনি নাই।" বলিয়া নাম করিতে লাগিলেন। রাজকর্ম্মচারীটী নিজ প্রভুত্বের হানিতে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'হ্যাঁরে ! ফের যদি নাম করবি, তবে উপযুক্ত শাস্তি পাবি। জানিস্ না রাজনহরের ভিতর গলিতে

নাম করা নিষেধ ?” ইঁহাদের কিন্তু সে কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই, স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী নাম করিতে করিতে যাইতেছেন। কর্ম্মচারীটী যথেষ্ট গালাগালি করিতে লাগিল, এমন কি মারিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইল। ইঁহারা সে বিষয়ে খেয়াল না করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

দয়াময় প্রভু সকল সহ্য করিতে পারেন। এমন কি, নিজের উপর অত্যাচার অপচারগুলিও অবাধে সহ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু নামের অপমান বা ভক্তের অপমান কখনই সহ্য করিতে পারেন না। হঠাৎ পুরীতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল। বড় রাস্তার উপরে এবং রাজবাড়ীর চতুষ্পার্শ্বেই খুব বেশী আরম্ভ হইল। তিন চারিদিন যায় একদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় হঠাৎ রাজা মুকুন্দদেবের দাস্ত এবং বমি হইতে লাগিল। মহা হুলুস্থূল ব্যাপার! ডাক্তারগণ নানারূপ চিকিৎসা করিতেছেন। এদিকে নানারূপ শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, মন্ত্রজপ, হোম, জগন্নাথের আরাধনা প্রভৃতি বহু বহু উপায় হইতে লাগিল; কিন্তু মহারাজ বড়ই চিন্তিতভাবে রাজগুরু শ্রীপাদ রঘুনাথদেব গোস্বামীকে বলিলেন, “দেখুন, আমার প্রাণে বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, কি উপায়ে এ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইব, আপনারা আজ্ঞা করুন।” তখন গোস্বামী প্রভু এবং রাজদেওয়ান কালী-বাবু প্রভৃতি বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকসকল বলিলেন, “আমাদের মতে একবার সহরের ভিতর নামসংকীর্ত্তন করান প্রয়োজন। কারণ এই পুরীতে যখন কলেরা বা বসন্তরোগ আবির্ভূত হয়, তখন একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন বা সপ্তাহ ভাগবতপাঠ ছাড়া আর কোনও উপায়ে নিবৃত্তি হয় না। অতএব একবার ভগবানের মঙ্গলময় নাম কীর্ত্তন করাইলে ভাল হয় না কি? মণিমার যদি হুকুম হয় তবে আমরা চেষ্টা করি।” শুনিবামাত্র মহারাজ বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিলেন, “এ অতি সদ্‌যুক্তি; আপনারা সত্বর ব্যবস্থা করুন।” রঘুনাথদেব গোস্বামী, মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য দেওয়ান কালীবাবু এবং উপস্থিত লোকসকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

"কোন্ দল আনা যায়? উড়িষ্যাবাসী আনা হইবে, না বাঙ্গালীর দল আনা হইবে? এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কি?" তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, আমাদের বিশ্বাস যে সেই বড় বাবাজী মহাশয় আসিয়া সদলে যদি একবার কীর্ত্তন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব বিঘ্ন দূরে যাইবে; এখন আপনার মত।" গোস্বামী প্রভুরও সেই মত হইল; সুতরাং গোস্বামী প্রভু, দেওয়ানবাবু এবং আর দুই একটী কর্ম্মচারী মিলিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট ঝাঁজপিটা মঠে আসিলেন। মহারাজ অসুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া বাবাজী মহাশয় ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, "আপনারা অগ্রসর হউন, আমি যাইতেছি।" কালীবাবু বলিলেন, "মহারাজ বড়ই উৎকণ্ঠিত; আর কালবিলম্ব হইলে চলিবে না, আপনি আমাদের সঙ্গেই চলুন।" তখন বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপদাদাকে বলিলেন, "অতিসত্বর খোল করতাল লইয়া প্রস্তুত হও। রাজনহরে কীর্ত্তন করিতে হইবে!" শুনিবামাত্র নবদ্বীপদাদা আনন্দোৎফুল্লচিত্তে খোল করতাল আনিলেন। বাবাজী মহাশয়, "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই নাম করিতে করিতে যেমন রাজবাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, অমনি সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ আসিয়া সংকীর্ত্তনের দল বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সংকীর্ত্তনের দুই পার্শ্বে দুইটী মশাল জ্বলিতেছে। যে ঘরে মহারাজ পীড়িত আছেন, সেই ঘরের সম্মুখে সংকীর্ত্তন উপস্থিত হইবামাত্র মহারাজ বলিলেন, "দেখ, আমাকে ধরিয়া ঐ কীর্ত্তনের মধ্যে লইয়া চল।" প্রথম রাজমাতা একটু আপত্তি করিলেন, কিন্তু মহারাজের অত্যাগ্রহ জানিয়া আর বাধা দিলেন না। দুইজনে মহারাজের দুই হাত ধরিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে লইয়া গেলে মহারাজ উঁহাদের অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ত্তনে প্রণাম করতঃ এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তনসহ নৃত্য করিতে করিতে মহারাজের চারিদিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে মহারাজ দুইহাত উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ধীরে

ধীরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল ঢুলুঢুলু, আজানুলম্বিত বাহু দুইটী ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক একবার বাম চরণের উপর দেহভার অবলম্বন করতঃ দক্ষিণ চরণে নৃত্য করিতেছেন, আবার দক্ষিণ চরণের উপর দেহভার অবলম্বন করতঃ বাম চরণে নৃত্য করিতেছেন। যদিও মহারাজ কৃশকায় এবং ব্যাধিযুক্ত, তথাপি কেমন অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্ময়! এমন কি, দেখিবামাত্রই যেন কেমন একটী আনন্দময় ঐশ্বর্য্যবান্ মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীতি হয়। সংকীর্ত্তনে অপার আনন্দ হইতে লাগিল। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। রাজকর্ম্মচারিগণ হাতে তালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর নাম করিতেছেন! মহারাজ কিন্তু মধ্যস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতেছেন! খোল করতাল এবং গগনভেদী সংকীর্ত্তনধ্বনি ও হরিধ্বনিতে রাজভবন আজ যেন আনন্দ-ভবন হইল। কিছুক্ষণ পরে বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে সকলে হরি হরিবোল ধ্বনি করিয়া উঠিল। সংকীর্ত্তনকারী বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ-দাদা উচ্চৈঃস্বরে জয় নিতাই, জয় নিতাই বলিয়া হুঙ্কার করতঃ জোরে জোরে লম্ফ দিয়া নৃত্য করিতেছেন। এইরূপ কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া বাবাজী মহাশয় যেমন মহারাজকে কোল হইতে ছাড়িয়া দিলেন অমনি মহারাজের দেহ অশ্রুকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক ভূষণে ভূষিত হইল। তখন তিনি গদগদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি ধন্য হইলাম! মঙ্গলময় জগন্নাথদেব এই ব্যাধির ছলে আমার মঙ্গলই করিয়াছেন! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আজ আমার সকল রকমের অশুভ দূরে গেল" বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে আদেশ করিলেন, "দেখ, এই ওয়াসের প্রতি ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন লইয়া যাও।" সেও তাহাই করিতে লাগিল। মশাল ধরিয়া অন্তঃপুরের প্রতি ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করাইয়া পুনর্ব্বার মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে

মহারাজ সেই সংকীর্ত্তনস্থানে গড়াগড়ি দিয়া প্রতিদিন একবার করিয়া সংকীর্ত্তন করিবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ও "নিতাইচাঁদের ইচ্ছা" বলিয়া নাম করিতে করিতে অনুমান রাত্র এগারটার সময় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সে রাত্রে আর মহারাজ কোনও ঔষধ ব্যবহার করিলেন না। শরীর সুস্থ ও নীরোগ হইয়া গেল। সেই দিন হইতে প্রত্যহই সন্ধ্যার পর লোক পাঠাইয়া সংকীর্ত্তনসহ বাবাজী মহাশয়কে ডাকাইয়া নিতে লাগিলেন। ইনিও তিন দিন গিয়া আর নিজে গেলেন না। সাতদিন পর্য্যন্ত রাজনহরে খুব সংকীর্ত্তন হইল। সেই হইতে আর কখনও রাজকর্ম্মচারিগণ নামের অবজ্ঞা বা সাধুমহাত্মাদিগকে অপমানসূচক কোনও কথা বলিতেন না। এমন কি বাবাজী মহাশয়ের কোনও সঙ্গীকে দেখিবামাত্র উঁহারা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন এবং যত্ন করিতেন।

দিনের পর দিন যায়, একদিন আহারাদির পর বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিঠা মঠের পশ্চাদ্ভাগস্থ দোতলা কোঠার নীচের ঘরে শয়ন করিয়া আছেন, কেহ বাতাস করিতেছে, কেহ বা চরণসেবা করিতেছে, ইনি নিদ্রিত, এই সময় অনুমান পনের ষোল বৎসর বয়স্ক একটী বালক ঝাঁজপিঠা মঠে উপস্থিত হইয়া বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকেই বলিতেছেন, "বাবাজী মহাশয় নিদ্রাগত, উঠিলে তবে দেখা হইবে।" ছেলেটী কিন্তু বড়ই উৎকণ্ঠিত। বিশেষ করিয়া বলিতেছে—"একটীবার মাত্র তাঁহাকে আমি দর্শন করিব। তাহা না হইলে আমার মন কিছুতেই স্থির হইবে না। আপনারা একবার মাত্র তিনি কোথায় আছেন আমাকে বলিয়া দিন, আমি একবার সেইখানে যাইব।" ছেলেটী যতই বলিতেছে, উঁহারা কিন্তু ততই আপত্তি করিতেছেন। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের অন্তরের ভাব অবগত হইয়াই যেন শয়ন অবস্থাতে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ একটী ছেলে এই মঠে

আসিয়াছে, তাহাকে শীঘ্র এইখানে লইয়া আইস ত! সে এতক্ষণ আসিবার জন্য অত ব্যস্ত হইতেছিল, তোমরা কেন তাহাকে আসিতে দিলে না?" তখন শশব্যস্তে একজন গিয়া ছেলেটীকে ডাকিয়া আনিলেন! ছেলেটী আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। ইনিও আগ্রহের সহিত উহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার নাম কি?"

বালক। আজ্ঞে! আমার নাম ফণিভূষণ দাস।

বাবাজী। তোমার নিবাস?

ফণি। আজ্ঞে! তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে।

বাবাজী। কি উদ্দেশ্যে ধামে আসিয়াছ বল দেখি! তুমি ছেলেমানুষ, বাড়ীতে না বলিয়া আসিয়াছ কি?

ফণি। বাবা! আমি কলকাতায়ই থাকিতাম। যখন আপনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন আপনার দর্শন পাইয়াই আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, আমি ইঁহারই আশ্রমে জীবন যাপন করিব। কিন্তু এতদিন আপনার কোনই সন্ধান পাই নাই। আজ কয়েকদিন হইল নবদ্বীপদাস নামক একটী মহাপুরুষের দর্শন পাই, তাঁহারই কৃপায় আপনার দর্শন পাইয়াছি। আমাকে জন্মের মত অঙ্গীকার করুন, আমি আর সংসারে যাইব না।

এই বলিয়া আবার ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল।

বাবাজী মহাশয় ছেলেটীকে কোলে উঠাইয়া সান্ত্বনা করতঃ বলিলেন, "ভয় কি বাবা! বেশ ত থাকিবে, তাহার জন্য চিন্তা কি? তোমার বাড়ীতে আর কে আছে?"

ফণি। আজ্ঞে! মাতা পিতা কেহই নাই, কেবল একটী সহোদর ভাই আছেন। তাঁহারও শরীর খুব খারাপ।

বাবাজী তবে ত প্রভু পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

এই বলিয়া ললিতাদাসীকে বলিলেন, "ইহাকে মহাপ্রসাদ দাও ত।" ললিতাদাসীও বিশেষ আদর করিয়া ছেলেটীকে মহাপ্রসাদ দিলেন। এই হইতেই ফণি বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে রহিল। ফণি সাতগাছিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল গোস্বামী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য।

দিনের পর দিন যায়, একদি ঝাঁজপিটা মঠে মহোৎসব। নানারূপ সামগ্রী রান্না হইয়া ঠাকুরের ভোগ লাগিল। যদিও বিশেষভাবে কোনও লোক নিমন্ত্রিত হয় নাই, তথাপি পাড়া প্রতিবেশী এবং দুঃখী-কাঙ্গালী প্রায় দুইশত আড়াইশত লোক প্রসাদ পাইতেছে।

বাবাজী মহাশয় যথাসময়ে মহাপ্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর রোয়াকের উপর বসিয়া আছেন। বেলা অনুমান চারিটা, ললিতাদাসী প্রভৃতি দুই একজন ছাড়া আর সকলের প্রসাদ পাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। ললিতাদাসী রান্নাঘর হইতে যাবতীয় বাসনপত্র বাহির করিয়া একটা স্থানে রাখিতেছে; হঠাৎ কিরূপ মন হইল, ঐ প্রসাদী বাসনের কাছেই পায়ে জল ঢালিয়া দিবামাত্রই বাবাজী মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। অমনি লজ্জিতভাবে শশব্যস্তে সে স্থান হইতে অন্যত্র গিয়া পা ধুইল বটে; কিন্তু মনে মনে নানারূপ আন্দোলন হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নিজে প্রসাদ পাইয়া বাবাজী মহাশয়ের এবং ঠাকুরের নিত্যসেবার কার্য্যে ব্রতী হইল। বাবাজী মহাশয়ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর ললিতাদাসী আর উঠিতে পারিতেছে না। নিজের দক্ষিণ পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল। হঠাৎ এইরূপ যন্ত্রণার কারণ যে কি, কেহ ঠিক করিতে পারিতেছে না। রাত্রে বাবাজীমহাশয় আশ্রমে আসিলে কেহ কেহ ললিতার অসুস্থতার কথা ইঁহাকে বলিলে, ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পায়ে ব্যথার কারণ কি সে নিজেও কিছু বুঝিতে পারিতেছে না?" সকলেই বলিল, "আজ্ঞে! না, সে নিজেও কিছু বুঝিতে পারিতেছে না! এমন কি এক পাও চলিবার ক্ষমতা নাই।" ইনি সে কথাটায় কাণ

না দিয়া নানারূপ হাঁটা চলার কার্য্যে উহাকে ফরমাইস্ করিতে লাগিলেন। সেও অতিশয় কষ্ট হইলেও সেটাকে গোপন করতঃ অবিচারে সেই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। এইরূপে দুইদিন কাটিয়া গেল ; কিন্তু পায়ের যন্ত্রণা তিলমাত্রও কমে নাই। তৎপরে আবার বাবাজী মহাশয় নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছেন। তিনদিনের দিন রাত্রি অনুমান বারটা, এই সময় ললিতাদাসী একাকী ঘরে বসিয়া ভাবিতেছে— "তাই ত আমার পায়ে এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা হইবার কারণ কি ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কোনওরূপ অপরাধ হইয়াছে। এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আজ দুই তিনদিন যাবৎ এক-তিলও কমিতেছে না বা অপরাধের কথা কিছুই মনে হইতেছে না !" এই বলিয়া বিশেষভাবে চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ মনে পড়িল যে "নিশ্চয়ই আমি যে সেই ঠাকুরের রান্নার বাসনের উপর পা ধুইয়াছিলাম এবং তাই বাবাজী মহাশয়েরও দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই এইরূপ যন্ত্রণা হইতেছে।" কি আশ্চর্য্য ! এই কথা মনে হইবামাত্রেই পায়ের ব্যথা যেন কমিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয় পূর্ব্ববৎ ডাকিলে ললিতাদাসী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পায়ের ব্যথা অনেকটা কম হইয়াছে দেখিয়া বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে তোর পায়ের ব্যথা কি ঔষধে ভাল হইল ?'

ললিতা। ঔষধের মধ্যে কারণ অনুসন্ধান ভিন্ন আর ত আমি কিছুই দেখি না।

বাবাজী। প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান হইল ?

ললিতা। আজ্ঞে ! আমি যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে সেই দিনকার বাসনের উপর পায়ের জল যাওয়া ভিন্ন আর ত কিছুই আমার মনে হয় না।

বাবাজী। প্রকৃত কারণ তাহাই বটে। একে ত বস্তুমাত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিলেই ভগবানের অবজ্ঞা করা হয়, এইটী সাধারণ নিয়ম। তৎপর

ভক্তিরাজ্যের কথা ভাবিয়া দেখ। ঐ জিনিষগুলি যখন কৃষ্ণসেবার সাহায্যকারী, তখন উহারা কতদূর উচ্চগুণসম্পন্ন! জগতের দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থ হইতেই নিজেকে হীন মনে করিতে হইবে অর্থাৎ মহাপ্রভু যে তৃণাদপি শ্লোক বলিয়াছেন, ঐ কথাটী যে অন্ধ-বিশ্বাসের কথা ইহা মনে করিবে না। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রতি পদার্থের গুণ অনুভব করাই সাধনা। শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক্, স্বাভাবিক যুক্তিতেই দেখ না কেন, তুমি বড়, কি সেই পাত্রগুলি বড়? তোমার দেহদ্বারা জগতের কিংবা ভগবৎ-সেবার কতদূর আনুকূল্য হয়, আর উহাদের দ্বারাই বা জগতের কিংবা ভগবৎ-সেবার কতদূর আনুকূল্য হয়। প্রথমতঃ তাহাকে তোমার ইষ্টদেব অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর তোমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন কি না তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সামান্য একটু তাত লাগিলে বা কেহ কোনরূপ কটু কথা বলিলে তুমি অস্থির। আর উহার উপরে কতই তাত কতই আঘাত লাগিতেছে ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন কি জীবনপাত করিয়াও পরের উপকার করিতেছে। তৃণগুচ্ছ দ্বারা পর্য্যন্ত যেরূপ উপকার সাধিত হয়, তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বস্তুর নিকট মনুষ্যের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা বা সকল পদার্থ হইতে নিজেকে হীন মনে করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ভগবৎসেবার আনুকূল্যকারী যাবতীয় পদার্থই চিন্ময়। স্বভাবতঃ সংসারী জীব যাহারা, তাহাদেরও যদি কোনও জিনিষে পা লাগে তবে অমনি তাহারা প্রণাম করিয়া থাকে। অশক্তপক্ষে অন্ততঃ মাথায় স্পর্শ করাইয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিয়া থাকে।

ললিতা। এ ব্যবহার ত আমাদেরও আছে। সেদিনকার সেই ব্যবহার যে কোনও-রূপ অবজ্ঞা করিয়া বা নিজ জ্ঞান স্বরূপে হইয়াছে তাহা নহে। পাগুলি জ্বালা করিতে লাগিল এবং নানারূপ মহাপ্রসাদ লাগিয়াছিল; সুতরাং তাড়াতাড়ি জল ঢালিয়া দিয়াছিলাম। এক পা ধুইতে ধুইতে যেমন মনে অনুভব হইয়াছে, অমনি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলাম। আচ্ছা

না হয় আমার ভ্রম হইয়াছে, কিন্তু আপনি ত দেখিয়াছিলেন, এই তিন দিন পর্য্যন্ত যেমন আমার শারীরিক কষ্ট, তেমনই সেবার অসুবিধা হইল, ইহাতে একবার একটু বলিলেই ত আমার চৈতন্য হইত।

বাবাজী। আমি যদি তোমাকে বলিয়া দিতাম, তাহা হইলে হয়ত অনুমানে তোমার ততদূর বিশ্বাস হইতে নাও পারিত। এখন হইতে যখনই এইরূপ ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা হইবে, অমনি চৈতন্য হইবে। আর এই কষ্টের কথা মনে পড়িবে। কারণ এরূপ অপরাধ একমাত্র আত্মচৈতন্য দ্বারা তাপ অনুভব করত কৃপাদণ্ড স্বরূপে স্বীকার করা ভিন্ন অন্য কোনও ঔষধ বা প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাহা না হইলে দেখ এই তোমার পায়ের এত যন্ত্রণা! একমাত্র অপরাধের কথা স্মরণ হইবামাত্র বিনা চেষ্টায় কিরূপে ভাল হইল? সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এইটী সম্পূর্ণ কৃপা।

এইরূপ পরমানন্দে দিন যায়, একদিন ললিতাদাসীর শরীর অসুস্থ— ঠাকুরের রান্না করার লোক অভাব দেখিয়া বাবাজী মহাশয়েরই শিষ্য একমূর্ত্তি বৈষ্ণব নিজ ইচ্ছামতে রান্না করিতে গেলেন; ইতিপূর্ব্বে উক্ত বাবাজীটীর ব্যবহারে বাবাজী মহাশয়ের গুরুদেব শ্রীগৌরহরিদাস মহান্ত বাবাজী মহাশয় একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই কারণে কোনরূপ ভগবৎসেবার কার্য্যে উঁহাকে নিযুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু যখন নিজেই ইচ্ছাপূর্ব্বক সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন পাছে বৈষ্ণবের মনে কোনও-রূপ ব্যথা হয়, এই ভয়ে কেহই কিছু বলিলেন না। এ দিকে রান্না প্রায় শেষ হইল, এই সময় হঠাৎ একটা বড় বিড়াল রান্না ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্ন, ডাল, তরকারী যাহা যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল, সমস্ত হইতে কিছু কিছু খাইয়া যেমন বাহিরে আসিবে, এই সময় বাবাজী মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িল। অমনি ললিতাদাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যারে ঠাকুরের ভোগ হইয়াছে কি?" ললিতাদাসী শশব্যস্তে রান্নাঘরে গিয়া বলিল, আজ্ঞে না, এখনও রান্না শেষ হয় নাই?

বাবাজী। রান্নাঘরে বিড়াল ঢুকিয়াছিল, কিসে মুখ দিয়াছে দেখ ত ?

ললিতাদাসী ঘরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে, যে যে বস্তু রান্না হইয়াছে সমস্ত বস্তুতেই বিড়াল মুখ দিয়াছে। তখন অতিশয় দুঃখিতচিত্তে বাহিরে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে! যে সমস্ত রান্না হইয়াছে সমস্ত বস্তুতেই বিড়াল মুখ দিয়াছে। একমণ চাল রান্না হইয়াছে, সে সমস্ত কি করা হইবে ?"

বাবাজী। কি আর হইবে ? যখন ভোগ হইবে না, তখন মাটিতে একটা গর্ত্ত করিয়া সমস্ত পুঁতিয়া ফেল এবং বেশ ভাল করিয়া রান্নাঘর পরিষ্কার করতঃ আবার নিজে রান্না করিয়া তবে ঠাকুরের ভোগ দাও। তোমাদের সম্পূর্ণ বুঝিবার ভ্রম। কারণ মহাত্মা বৈষ্ণবগণ যাহার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্রও অসন্তুষ্ট হন, তাহার হাতে কোনও-রূপ ভগবৎসেবার কার্য্য হইতে পারে না। "বৈষ্ণবেতে ঘটে যদি ক্ষুদ্র অপরাধ। মহা মহা ভজনেতে প'ড়ে যায় বাদ।"

ললিতা। আমি কি করিব ? সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া গেল ; আমার কি তাহাকে বারণ করা উচিত ?

বাবাজী। যাক্ ও সমস্ত আলোচনা করা বৃথা! এখন কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ কর।

তখন ললিতাদাসী অন্যান্য বাবাজীগণকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমের একপার্শ্বে একটী গর্ত্ত করাইয়া তাহার মধ্যে ঐ সমস্ত ডাল তরকারী ঢালিয়া উপরে মাটি চাপা দেওয়াইলেন এবং রান্নাঘর অতি সন্তর্পণে পরিষ্কার করত নিজে স্নান করিয়া ঠাকুরের ভোগ রান্না করিলেন। বাবাজী মহাশয়ের এইরূপ মর্য্যাদা রক্ষা এবং শাসনে সকলেরই বৈষ্ণব-অপরাধের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়া গেল। সকলে মিলিয়ে উক্ত বাবাজীটীর জন্য পরমগুরুদেব শ্রীগৌরহরিদাস মহান্ত মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করতঃ তাঁহাকে সুপ্রসন্ন করিলেন।

একদিন বেলা অনুমান দুইটা, আশ্রমবাসী সকলের প্রসাদ পাওয়া শেষ হইয়াছে। ললিতাদাসী, কুসুমমঞ্জরী প্রভৃতি সখী কয়েকজন রান্নাঘরের মধ্যে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে এবং নানারূপ লীলাকথা-আলোচনা হইতেছে। এই সময় হঠাৎ একটা বিড়াল উক্ত রান্না ঘরের মধ্যে উহাদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বের সেই ঘটনা হইতে সকলেরই মনে বিড়ালের উপর একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; সুতরাং যেমন বিড়ালটী নিকটে গিয়াছে, অমনি ললিতাদাসী বাম হাতে উহার মাথার উপর একটা চাপড় মারিল। যদিও আস্তে মারিল; কিন্তু উহার মুখখানি নীচের পাথরে সংলগ্ন হওয়ায় মুখে বড়ই আঘাত পাইল। তখন সে ঘাড় কাত করিয়া অতি কাতরকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় নিদ্রাভঙ্গের পরে রোয়াকে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ বিড়ালটীর ঐরূপ আর্ত্তনাদটা ইঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

সকলেই স্ব স্ব সেবাকার্য্যে ব্যস্ত। অপরাহ্ণ অনুমান সাড়ে পাঁচটার সময় ললিতাদাসীর বামহস্ত একেবারে অচল হইয়া গেল। কেবল যে অচল, তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। আশ্রমের অধিকাংশ সেবাকার্য্যের ভারই ললিতাদাসীর উপরে; কাজেই অকস্মাৎ এরূপ যন্ত্রণাদায়ক পীড়া উপস্থিত হওয়ার দরুন সেবার অনেকটা অসুবিধা হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন না; এমন কি, একজন গিয়া ইঁহার নিকট ঐ সমস্ত কথা জানাইয়া অন্য কাহাকেও ঠাকুরদের নিকুঞ্জ ভোগের যোগাড় করিতে বলিবার অনুরোধ করিলে ইনি বলিলেন, "কেন, হাতে সামান্য একটু ব্যথা হইয়াছে, ইহাতে সেবাকার্য্য বন্ধ করিবার দরকার কি? নিজকৃত কর্ম্মের ফলে যে সমস্ত ভোগ হয়, তাহা ভোগ না করিলে চলিবে কেন? তাহাকে বল সেবাকার্য্য যেন পরিত্যাগ না করে।" সে লোকটী সমস্ত কথা গিয়া ললিতাদাসীকে

বলিলে সেও যথাসাধ্য সেবাকার্য্য করিতে লাগিল! দুইদিন যায়, যন্ত্রণারও কিছু লাঘব হয় না, ইনিও কোন ব্যবস্থা করেন না। কেহ কিছু বলিলে বলেন, "আত্মচৈতন্য না হইলে ঔষধে কি করিবে? যদি ঔষধেই সমস্ত রোগ ভাল হইত, তবে আর জগতের লোক এত কষ্ট পাইত না। ভগবৎ-সংসারে থাকিয়া নিজেকে কর্ত্তা বা শাস্তা মনে করিলে তাহার কষ্টভোগ অবশ্যম্ভাবী। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিয়া চলিতে না পারিলে ভগবৎ-সংসারে থাকা বা আনন্দ পাওয়া কঠিন। প্রভু যখন এ সব চৈতন্য করাইয়া দিবেন, তখনই ভাল হইয়া যাইবে।" এদিকে ললিতাদাসী মনে মনে ভাবিতেছে, "তাইত, আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে আজ দুইদিন যাবৎ সেবাকার্য্য হইতে বঞ্চিতা হইলাম! আবার অসহ্য যন্ত্রণাও ত ভোগ হইতেছে। কৈ, প্রভু ত আমার স্বকৃত-কর্ম্মের জন্য নিজেকে চৈতন্য করাইয়াও দিতেছেন না" মনে মনে এইরূপ সমালোচনা করিতে করিতে নিদ্রা গেল। রাত্র অনুমান তিনটা এই সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া মনে ভাবিল, "আমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস সে দিন আমি যে বিড়ালটীকে মারিয়াছিলাম, তাহাতেই বোধ হয় আমার হাতের এইরূপ বেদনা হইয়াছে।" যেমন এই কথা মনে হওয়া, অমনি হাতের ব্যথা অন্ততঃ বার আনা কমিয়া গেল এবং হৃদয়ের অবসাদও দূর হইয়া গেল। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই বেশ সুস্থভাবে সেবার কার্য্যাদি করিতে লাগিল দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "এই যে হাতের ব্যথা বেশ ভাল হইয়াছে; কি ঔষধে ভাল হইল?"

ললিতা। গৃহস্থ যতক্ষণ নিদ্রা যায়, ততক্ষণই চোরে চুরি করে, জাগিলে কি আর চুরি করিতে পারে?

বাবাজী। বেশ জেগেছ? চৈতন্য হইল কি? কোন্ অপরাধে ঐরূপ হইয়াছে, নিজ ধারণায় আসিল কি?

ললিতা। আজ্ঞে! আমার বিশ্বাস, সেদিন আমরা যখন মহাপ্রসাদ

পাইতে বসিয়াছিলাম, তখন একটী বিড়াল ডাকিতে ডাকিতে আমার কাছে আসিলে আমি বামহাতে উহার মাথার উপর একটা চাপড় মারিলাম। সেটা উচ্চ কণ্ঠে মেঁও মেঁও করিতে করিতে চলিয়া গেল। তাই বোধ হয় এইরূপ হইয়াছে।

বাবাজী। বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই সেই জন্য এত ভোগ।

ললিতা। আচ্ছা, বিড়ালকে যখন কৃষ্ণসেবার বাদী বলিয়া রাধারাণী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাহাকে তাড়াইলে অপরাধ হইবে কেন? এইত সেদিন ঠাকুরের ভোগ নষ্ট করিল; তবুও কি তাহাকে আদর করিতে হইবে?

বাবাজী। বিড়াল কৃষ্ণসেবার বাদী হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া সে কৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের অধরামৃতের ভাগী হইবে না এ কোথায় পাইলে? বল দেখি সে দিন তুমি নৃশংসতার কার্য্যই করিলে। তোমরা উদর পূরণ করিয়া মহাপ্রসাদ পাইতেছ, আর ক্ষুধার্ত্ত একটা জীব তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাকে খাইতে দেওয়া ত দূরে থাকুক, এরূপভাবে আঘাত করিলে যে বোধহয় তিন চারিদিন তাহার মুখে ব্যথা থাকিবে। উহারা এক মুষ্টির প্রত্যাশী, লোকালয়েই যদি উহারা ঐরূপে বিতাড়িত হইবে, তবে উহাদের উপায় কি? জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। দাসের কষ্টে প্রভুর কি কষ্ট হইবে না? আবার শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুক্কুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥"

তাহা হইলে ইহার মধ্যে বিড়ালটাকে বাদ দিয়া বৈষ্ণববুদ্ধি করিতে হইবে কি? তোমরা ঘোর স্বার্থপর; তোমরা মনে কর "আমরা যাহা দ্বারা উপকার পাইব, তাহাকে এক মুষ্টি প্রসাদ দিলে কার্য্য হইবে, উহাকে

দিলে কি ফল হইবে?" এইটাই জীবের ভ্রম; কারণ ভগবৎ ইচ্ছায় সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনও বস্তু আমাদের প্রতিকূলকারী হইতে পারে না! প্রাণী মাত্র দ্বারা কোন না কোন আনুকূল্য হইবেই হইবে। হয়ত এমন কোনও কার্য্য আছে, যাহা ঐ সমস্ত প্রাণী না হইলে কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। আর যদি বা ঐ সমস্ত প্রাণী কোনও কার্য্যের সহায়তা না করুক, তথাপি ভগবৎপ্রেরণায় সৃষ্ট জীব মাত্রে অবজ্ঞা করিলে ভগবানকে অবজ্ঞা করা হয় না কি? আসক্ত, বিরক্ত এবং অনাসক্ত এই ত্রিবিধ আশ্রম। আসক্ত অর্থাৎ অশেষ মায়াবদ্ধ সংসারী। বিরক্ত অর্থাৎ মায়াসংসারের ক্লেশ অনুভব করিয়া উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল ভাবে এক এক রাত্র এক এক বৃক্ষতলে বাস, অসংগ্রহী এবং অযাচক বৃত্তিদ্বারা উদর পূরণ প্রভৃতি। আর অনাসক্ত অর্থাৎ পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত-ভাবে সংসার করা। রজোগুণ বা তমোগুণ অবলম্বন এই সংসারের সম্পূর্ণ অনিষ্টকর। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"নিন্দা শূন্য নম্র ভাবে সবারে স্তবন।
অভ্যাগত আহূত ব্যক্তির চরণ বন্দন॥
প্রাণিমাত্রে কোনরূপ উদ্বেগ না দিবে।
কায়মনোবাক্যে সবায় সন্তোষ করিবে॥
যথা লাভে সন্তুষ্ট সদা নিষ্ঠা পরায়ণ।
ত্রিবিধ রূপেতে সদা শ্রীকৃষ্ণ সেবন॥"

প্রভৃতি এই ভগবৎ-সংসারী ব্যক্তিদের নিত্য আচরণীয়। রাজর্ষি জনক, রাজা অম্বরীষ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বিলাসী কৃষ্ণদাস প্রভৃতি এই সংসারের সংসারী।

ললিতা। এরূপ ভাবের সংসারী হওয়া ত আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব; আশা করাও বোধ হয় অনুচিত।

বাবাজী! ইহাকেই বলে কৃপা। প্রভুর কৃপায় সম্পূর্ণ অসম্ভবও সম্ভব

হইতে পারে। তিনি যখন তোমাদিগকে তাঁহার নিজ সংসারের সংসারী করিয়াছেন, তখন তোমাদের যোগ্যাযোগ্যতা তিনি বুঝিবেন, তবে তোমাদের কর্ত্তব্য প্রাণপণে তাঁহার আদেশ পালনের চেষ্টা করা। যাঁহারা কৃপাসিদ্ধের গণ তাঁহাদের ইহাই সাধন।

ললিতা। সাধনই যদি করিতে হইল, তবে আর কৃপা কি হইল? লোক সাধনভজনে অসমর্থ বলিয়াই ত কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকে?

বাবাজী। কৃপার সাধনভজনে এবং সাধনের সাধনভজনে অনেক পার্থক্য। কৃপার সাধনভজন,— যেমন কোন এক রাজা বহু বহু সম্পত্তির অধীশ্বর, রীতিমত বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্; কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও বিদ্যাবুদ্ধিহীন। পিতা উহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কোনরূপ ফল লাভ করিতে না পারায় হতাশ হইয়া মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদ্‌বর্গকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় সকলেই বলিলেন, "দেখুন, আপনারই ত পুত্র, উহারা কোথায় যাইবে? আপনি কৃপা করিয়া উহাদের একটী উপায় করিয়া দিন।" তখন তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া যাবতীয় সম্পত্তি উহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ, বাবা সকল! তোমরা এই অপার সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী হইলে। তোমাদের উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করার কোনই প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র এই উপার্জ্জিত সম্পত্তি যাহাতে নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা কবিবে।" এই বলিয়া তাহাদিগকে কয়েকটী উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তিনি নিশ্চিন্তমনে নিজ পরমার্থ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই যে পুত্রগণের, পিতার আদেশগুলি পালন করা বা তাঁহার উপদেশ ছাড়াও অন্যান্য অনেক সদুপদেশ অনুসারে কার্য্য করা, ইহাও যেমন কৃপালব্ধ সম্পত্তি রক্ষার জন্য হইয়া থাকে, কৃপাসিদ্ধ সাধকগণের সাধনও সেইরূপ। এই সাধন, বস্তুপ্রাপ্তির জন্য নহে, প্রাপ্তবস্তুর রক্ষার জন্য। আর সাধনসিদ্ধ সাধকগণের সাধন, বস্তু উপার্জ্জনের জন্য। যেমন গরিবের ছেলে, পৈতৃক কোনই সম্পত্তি নাই,

নিজে চাকরী প্রভৃতি করিয়া বা যে কোন উপায়েই হউক, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করে। তাই বলি তোমাদের উপার্জ্জন করিবার কোনই চেষ্টা করিতে হইবে না বা অভাবও হইবে না, কেবল কৃপালব্ধ জিনিষটী যাহাতে রক্ষা হয়, সেই অনুযায়ী অনুকূল ভাব গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিলেই যথেষ্ট। ইহাকে সাধন বলে না, ইহাকে রক্ষণ বলিয়া থাকে।

তখন ললিতাদাসী প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আমরা ত কিছুই জানি না বা করিতে পারিব না; তবে যাহাতে আপনার কৃপাদত্ত ধন অযথা নষ্ট না হয় তাহা করিতে হইবে। যেমন কৃপা করিয়া অমূল্য সম্পত্তি দিয়াছেন, তেমনি যাহাতে নষ্ট না হয়, রক্ষা করিয়া ভোগ করিবার সামর্থ্য হয়, সে শক্তিও দিতে হইবে।" ইত্যাদি নানারূপ কাতরোক্তি শ্রবণে বাবাজী মহাশয় মিষ্টবাক্যে সকলকে আশ্বস্ত করতঃ স্ব' স্ব নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার আদেশ করিয়া নিজে নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগন্নাথদেবের সেবার বড়ই বিশৃঙ্খলতা। এমন কি সব দিন শয়ন পর্য্যন্ত হয় না। পুরীধামের সমস্ত ব্যাপারই বাবাজী মহাশয়ের বেশ আনন্দপ্রদ; কিন্তু জগন্নাথদেবের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া যেন বড়ই মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। রথ আসিয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। বেলা প্রায় বারটা বাজিল; কিন্তু জগন্নাথের রথে উঠিবার কোনরূপ ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না, দেখিয়া বাবাজী মহাশয় কোনও রাজকর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনারা সমস্ত ভক্তিমান্ কর্ম্মচারী থাকিতে জগন্নাথদেবের এইরূপ অবস্থা, ইহাতে কি আপনাদের প্রাণে একটুও দুঃখ জন্মে না? যে জগন্নাথের ছয়খানা রথ একদিন গুণ্ডিচাবাড়ী গিয়া পৌঁছিত, সেই জগন্নাথের আজ রথে উঠাই ঘটে কিনা

সন্দেহ।” কর্ম্মচারীটী অতিশয় দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, “দেখুন বাবা! সেবার প্রতি রাজার একেবারেই লক্ষ্য নাই; যদি বা কেহ লক্ষ্য করিতে যায়, তাহার উপর সকলের কটাক্ষ পড়িয়া যায়। কাজেই চাকরীর ভয়ে আর কেহই কিছু বলিতে বা করিতে ইচ্ছা করে না।”

বাবাজী। আমি বলি, আজকার এই ঘটনাটী আপনি একবার রাজাকে যদি জানান, আমার বিশ্বাস তাহা হইলে নিশ্চয়ই কার্য্য হইবে।

কর্ম্মচারীটী আর কিছুই না বলিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক রাজার নিকট বলিতে গেলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় কাতরকণ্ঠে প্রাণের আবেগে নাম ধরিলেন। জানি না নামেরই গুণ, কি ভগবদিচ্ছা! অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই যেন সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। সকলেই শশব্যস্ত! সকলেরই মুখে এক বুলি—‘তাইত এত বেলা হইয়া গেল—পহুণ্ডী হইল না!’ ইত্যাদি নানারূপ সমালোচনা হইতে লাগিল। এদিকে রাজবাড়ী হইতে সেবক পাণ্ডাদের উপর এবং দয়িতা পাণ্ডাদের উপর জুলুম চলিতে লাগিল যে, কেন এত বেলা পর্য্যন্ত জগন্নাথের পহুণ্ডী বিজয় হয় নাই? চারিদিকে মহাহুলুস্থূলু ব্যাপার! ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন এবং জগন্নাথ রথে উঠিলেন। সেদিন আর রথ টানা হইল না। বাবাজী মহাশয়ও আশ্রমে গেলেন না। সেই রথের নীচেই শয়ন করিয়া রহিলেন।

পর দিবস বেলা অনুমান দশটার সময় বলরামের রথটান আরম্ভ হইল। তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলে সুভদ্রাদেবীর রথ তথায় পহুঁছিল; কিন্তু জানি না, লীলাময় জগন্নাথদেবের কি ইচ্ছা! যেন অতিশয় মন্থরগতি। বহুলোকের যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিন রথ রাজবাড়ী পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিল না। সকলের মনেই যেন কিরূপ একটা বিমর্ষ ভাব। কোথায় জগন্নাথ রথে চড়িয়া গুণ্ডিচাবাড়ী যাইবেন, সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা হইবেন, নানারূপ পীঠাপানা জগন্নাথের ভোগ হইবে, না আজ কেবল ঘসাচিড়া

ভোগ খাইয়া সেই রথের উপরে রাস্তায় দিন কাটাইতেছেন। রোজই রথ টান হইতেছে; কিন্তু অতি সামান্য দূর গিয়াই আবার সেদিনকার মত স্থগিত থাকিতেছেন। এইরূপে পাঁচদিন অতীত হইল। ছয়দিনের দিন বাবাজী মহাশয়ের প্রতি জগন্নাথের কি আদেশ হইল ইনিই জানেন। জগন্নাথের অবকাশ হইতেছে, ইনি নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন, অবকাশ অন্তে জগন্নাথদেবের দাঁতন কাঠিখানি তুলিয়া সেবক পাণ্ডা, বাবাজী মহাশয়ের হাতে দিলেন। ইনিও কম্পাশ্রু-পুলক-পরিব্যাপ্ত শরীরে উৎফুল্লহৃদয়ে সেই কৃপালব্ধ বস্তু মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ঝাঁজপিটা মঠে উপস্থিত হইলেন! বাবাজী মহাশয়কে দেখিয়া সকলেই সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ললিতাদাসী একটু বিস্মিত ভাবে বলিল, "এ কি রকম! জগন্নাথ মাথায় কেন?" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয়ের দুইটী চক্ষু হইতে দরদরিতধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ঠাকুরমন্দিরের পার্শ্বস্থ ঘরখানি নির্দ্দেশ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, অতি শীঘ্র এই ঘর পরিষ্কার করিয়া দাও, এইখানে জগন্নাথের সেবা বসিবে! তাঁহার আদেশ যে অনেক দিন অন্ন ভোগ বন্ধ হইয়াছে। এইস্থানে অন্ন ভোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" শুনিয়া সকলেই অতি ক্ষিপ্রহস্তে ঘর পরিষ্কার করিয়া একখানি আসনে জগন্নাথের বিজয়মূর্ত্তি স্বরূপ সেই বস্তুটী স্থাপন করিলে পর বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ, জগন্নাথের যেরূপ মাটির হাঁড়িতে রান্না হয় এবং ভোগ লাগে, ঠিক সেই রকম ভাবে এখানেও ভোগ লাগাইতে হইবে।"

ললিতা। আজ্ঞে আমাদের হাতে জগন্নাথ খাইবেন ত?

বাবাজী। দয়াময়ের সে অনুগ্রহ না হইলে এখানে আসিবেনই বা কেন? কোন সন্দেহের ভাব মনে না আনিয়া কৃপাময়ের কৃপার কথা স্মরণ করতঃ শুচি শুদ্ধভাবে গিয়া রান্না কর।

তখন ললিতাদাসী বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে

লাগিল। জগন্নাথের নিয়মানুসারে ভোগরাগ চলিতে লাগিল। পরদিবস আবার পূর্ব্ববৎ সুভদ্রাদেবীর অবকাশের সময় বাবাজী মহাশয় রথের অগ্রে উপস্থিত হইবামাত্র, পাণ্ডা সুভদ্রাদেবীর দাঁতন কাঠিখানি বাবাজী মহাশয়ের হস্তে দিলেন। ইনিও পূর্ব্ববৎ উহা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক আশ্রমের দ্বারদেশ পার হইতে না হইতেই ভিতর হইতে কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আজ সুভদ্রাদেবী আগমন করিলেন।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে জগন্নাথদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিন দিনে তিন মূর্ত্তি আসিয়া স্থাপিত হইলে রীতিমত ভাবে সেবা চলিতে লাগিল। এদিকে জগন্নাথদেব অতিকষ্টে নবনীর দিন একবার মাত্র গুণ্ডিচামন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনরায় দশমীর দিনে রথে উঠিলেন। আবার উল্টা রথ টান আরম্ভ হইল। যাইবার সময় অপেক্ষা আসিবার সময় যেন একটু দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন। সকলেই মনে মনে ভাবিলেন যে হয়ত দুই এক দিনের মধ্যেই জগন্নাথ গিয়া মন্দিরে পহুঁছিবেন। বলদেব এবং সুভদ্রাদেবীর রথ অনেক দূর অগ্রসর হইলে সকলেরই অভিমত হইল যে, জগন্নাথের রথ আসিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিত হইলে তবে ইঁহাদের রথটান হইবে। তাহাই হইল, সকলে একত্রিত হইয়া জগন্নাথের রথ টানিতে লাগিলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে কাহার সাধ্য? রথ আসিয়া পুলের উপর বক্রভাবে দাঁড়াইল। বহু চেষ্টা করিয়াও একতিল স্থানান্তরিত করিবার কাহারও সাধ্য হইতেছে না। পুরীবাসী সকলেই হতাশ হইলেন। এমন কি অনেকে মনে করিলেন, বোধ হয় এবার জগন্নাথ মন্দিরে আসিবেন কি না সন্দেহ। এইরূপ ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল। বাবাজী মহাশয় এক একবার দর্শনে যান, আবার ব্যথিতহৃদয়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। দুঃখী কাঙ্গালীগণ হাহাকার করিতেছে। সকলেই বলে, "হায় রে! আর বুঝি আমরা বাঁচিব না; কারণ কলির জীবের অন্নগত প্রাণ। আজ কত দিন যে অন্নপ্রসাদের মুখ দর্শন করি নাই কি জানি।

জগন্নাথও চিড়া খাইতেছেন, আর আমরাও সেই চিড়া প্রসাদ পাইতেছি।" বাবাজী মহাশয় উহাদের সেইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করতঃ আশ্রমে আসিয়া বলিলেন, "দেখ, আজ হইতে তোমরা প্রসাদ পাও চাই নাই পাও, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত যে আসিবে, তাহাকে এক মুষ্টি দিতেই হইবে।" সঙ্গিগণও তাহাই করিতে লাগিলেন। আশ্রমে প্রায় দুইশত লোক রোজ প্রসাদ পাইতেছে। কেহ বাবাজী মহাশয়কে যদি জিজ্ঞাসা করে "আজ্ঞে এই এত লোক কিরূপে প্রসাদ পাইতেছে? ইহার ব্যয়ভারই বা কে বহন করিতেছেন?"

বাবাজী। বাবা! নিতাইচাঁদের সংসার তিনি নির্ব্বাহ করিতেছেন; আমার উপর জমাখরচের ভার দেন নাই। কোথা হইতে কিরূপে চলিতেছে তিনিই জানেন। তবে পরমানন্দে চলিয়া যাইতেছে, সঞ্চয়ও নাই, অভাবও নাই।

কয়েক দিন পরে আবার দুইবেলা রান্নার ব্যবস্থা হইল। সঙ্গিগণের উপরেও এমনই কৃপাশক্তি সঞ্চার করিলেন যে, উঁহারা দুই বেলায় প্রায় সাড়ে তিন শত লোকের রান্না, পরিবেশন এবং তদুপযোগী আনুষঙ্গিক কার্য্যসকল অতিশয় উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। আশ্রমে কোনও চাকর-চাকরাণী বা পূজারীর বন্দোবস্ত নাই। সমস্তই আশ্রমবাসীদিগের উপর নির্ভর; কিন্তু অতি সুচারুরূপে সমস্ত কার্য্য চলিয়া যাইতেছে—সকলেই আনন্দিত।

এইরূপে কয়েক দিন যায়, একদিন বেলা অনুমান চারিটা, বাবাজী মহাশয় বাহিরে বসিয়া আছেন, হঠাৎ ললিতাদাসী আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে! বাজার করিবার কিছুই নাই; কাল সকালকার বাজার আজ না করিলে বেলা অতিরিক্ত হইয়া যাইবে।"

বাবাজী। বেশ ত, বাজার করিতে হইবে, তাহা আমার নিকট বলিবার প্রয়োজন কি? যাঁহার সংসার তাঁহার নিকট বল, তিনি বন্দোবস্ত করিবেন।

ললিতা। আজ্ঞে! আমি আর কাহাকে বলিব? আমি ত আপনাকে দেখিতেছি, আপনাকে বলিলাম। প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া অনুমান কোথায় যাইয়া খুঁজিব?

বাবাজী। আমিও ত তাই বলি, প্রত্যক্ষ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অনুমানকে বলা কেন? তবে তোমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ বল, ও ত কিছুই নয়; কারণ আজ যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছ, কাল হয় ত মরা বলিয়া সেই দেহটীকে আগুনে পোড়াইয়া ফেলিবে। এমন কি, আজ যাহাকে স্পর্শ করিয়া অতি পবিত্র বোধ করিতেছ, কাল হয়ত তাহাকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র বোধে স্নান না করিলে চলিবে না। কেন যাহাকে তোমাদের মতে প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলে, সে ত বর্ত্তমানই রহিয়াছে। তবে তাহাকে ফেলিয়া দাও কেন? যাহাকে যত্ন চেষ্টা করিতে, ভাল ভাল বস্তু প্রস্তুত করিয়া দাদা, বাবা, মা বলিয়া ডাকিয়া খাওয়াইতে, সে ত তোমার কাছেই শুইয়া আছে। তবে তুমি 'দাদা কোথায় গেলে, বাবা আমাকে অনাথা করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে' ইত্যাদি বলিয়া কাঁদিতেছ কেন? বর্ত্তমান বর্ত্তমানই রহিয়াছে। এই স্থূল দেহকে চৈতন্যবান্ প্রত্যক্ষ বস্তু বলিতে হইলে আর অচেতন বলিয়া পরিত্যাগের কোন বস্তু থাকে না। এইটীই তোমাদের ভুল। যাঁহার সত্তায় জগতের সত্তা, তাঁহাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা কখনই সম্ভবে না। বিশেষতঃ ভক্তিরাজ্যে ত সম্পূর্ণই অন্যায়। যদিও দর্শন-শাস্ত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানসিদ্ধ বলিয়াছেন, কিন্তু দৃশ্যাদৃশ্য জগতে ওতঃপ্রোত ভাবে সর্ব্বদা যে বস্তু বর্ত্তমান তাহার আবার অনুমান, একথাটা আমার যেন ভাল লাগে না; কারণ গৌরলীলা, কৃষ্ণলীলা সর্ব্বদা সর্ব্ব-নয়নগোচর হইতেছেন। অতএব ভ্রম ছাড়, নিতাইচাঁদের সংসারে বাস করিতেছ, অভাব অভিযোগ তাঁহার নিকট প্রকাশ কর, তিনি পূরণ করিবেন।

ললিতা। কিরূপে কোথায় জানাইতে হইবে বলিয়া দিন।

বাবাজী। কেন, আমি ত একথা বহুবার তোমাদিগকে বলিয়াছি যে শ্রীমূর্ত্তি নিত্য, উহার সেবা নিত্য, সেবক নিত্য। অতএব শ্রীমন্দিরে গিয়া না হয় আমারই নাম করিয়া বল যে, "তিনি পাঠাইয়াছেন আপনার সংসারে দুবেলায় প্রায় চারি পাঁচশত লোক উপস্থিত, বাজার খরচ নাই, যেরূপ করিতে হয় করিবেন।"

ললিতাদাসী বাবাজী মহাশয়ের কথামত বলিবার জন্য গেলেন বটে, কিন্তু মনটা তত প্রসন্ন নহে; কারণ উহার মনে ধারণা যে, হয়ত বাবাজী মহাশয় আমাকে একটা স্তোক বাক্যে প্রতারিত করিলেন। আচ্ছা, আমিও ইঁহার কথানুযায়ী মন্দিরে একবার বলিয়া ঘরে বসিয়া থাকি, দেখা যাক কতদূর কি হয়! নিতাই নিজে হাতে করিয়া আনেন কি অন্য কিরূপে করেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে গিয়া যেন একটু অবহেলা ভাবেই বলিলেন, "নিতাই, তোমার সংসারে দুবেলায় প্রায় চারি পাঁচশত লোকের উপযোগী প্রসাদ দরকার, বাজার খরচমাত্রই নাই, যাহা হয় করিবে।" বলিয়া নিজ ঘরে গেলেন। বাবাজী মহাশয় একাকী বসিয়াই ছিলেন। অনুমান বিশ মিনিট পরেই বাবাজী মহাশয় ললিতা-দাসীকে ডাকিলে সে যাইতে লাগিল বটে; কিন্তু যেন একটু অসন্তুষ্ট ভাবে। কারণ ইতিপূর্ব্বে বাজার খরচ সম্বন্ধে বলিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছে, অগত্যা না গেলে নয় তাই ধীরে ধীরে যাইতেছে, আর ভবিষ্যৎ চিন্তা (অর্থাৎ এত লোক, কি করিয়া চলিবে, বাবাজী মহাশয় উদাসভাব ধারণ করিলেন, আজ যদি বাজার না হয় তবে কাল আর কি করিয়া এত লোকের সংস্থান হইবে ইত্যাদি) করিতেছেন। ক্রমে অতি বিমর্ষভাবে নিকটে গিয়া দেখেন যে বাবাজী মহাশয়ের আসনের সম্মুখে দুইটী থাকে অনুমান শতাবধি টাকা রহিয়াছে, আর নিকটে একটী সাধারণ ভাবের ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এই টাকা কি উদ্দেশ্যে দিতেছ?"

ভদ্র। আজ্ঞে! শুনিলাম নাকি ঠাকুরের সংসারে বাজার খরচ ইত্যাদির টাকা নাই, তাই এই যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিলাম। আমি ত দিবার উপযুক্ত লোক নই!

বাবাজী। কেন কাল না হয় এই টাকা দ্বারা বৈষ্ণবসেবা করিয়া দেই?

ভদ্র। আজ্ঞে! আমার সেরূপ কোনও অভিলাষ নাই, আশ্রমে অনেক মূর্ত্তি বৈষ্ণব এবং দুঃখী কাঙ্গালী প্রসাদ পাইয়া থাকেন, যদি ইহা দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহায্য হয় করিবেন।

এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে বলিলেন, "নাও, অভীষ্ট বস্তু লাভ হইয়াছে, আর বিলম্ব কেন? নিতাই বাঞ্ছাকল্পতরু, যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন।" ললিতাদাসী এতক্ষণ সেই বাবুটীর কথা শুনিয়া এবং উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া বিস্মিতভাবে নিজের মানসিক সংকীর্ণতা এবং অবিশ্বাস বুদ্ধিকে মনে মনে ধিক্কার দিতেছিলেন; হঠাৎ বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আজ্ঞে! আমি ত তখন আপনার কথা শুনিয়া কোনরূপ বিশ্বাস বা ভক্তিসহকারে নিতাইকে বলি নাই; বরং আমার অন্তরে একটু রাগই হইয়াছিল এবং ভাবিতেছিলাম যে— আপনি ত ঐরূপ উদাস হইলেন, এদিকে সংসারেও কোনরূপ সুবিধা নাই, কি করিয়া কাল ঠাকুরসেবা এবং বৈষ্ণবসেবা হইবে!"

বাবাজী। তবেই ভাবিয়া দেখ, অবহেলা করিয়া বলায় যখন এইরূপ দৃষ্টি ও কৃপা, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বলিলে কি না হইতে পারে? জীবের এই সংকীর্ণবুদ্ধি এবং অবিশ্বাসই নিজ দুঃখের কারণ। ইহাতেই ক্রমে ভগবদ্-বৈমুখ্য আসিয়া পড়ে।

ললিতা। প্রত্যক্ষ দেখিয়া শুনিয়াও যে বিশ্বাস জন্মে না, তবে আমাদের গতি কি হইবে? যাঁহার সংসারে বাস করিতেছি এবং যিনি

সর্ব্বদা আমাদের ভরণপোষণের জন্য ব্যতিব্যস্ত, আমরা যদি তাঁহাকে না চিনি বা তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি, তবে আমাদের ন্যায় প্রবঞ্চক, অকৃতজ্ঞ আর জগতে কে আছে ? এরূপ অনধিকারীর ত ভগবৎ-সংসারে বাস হওয়াই অসম্ভব ! আমার বিশ্বাস আমাদের ন্যায় মানুষ অপেক্ষা পশু অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। কুক্কুরগুলি তাহাদের প্রভুর মুখাপেক্ষী হইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে; যখন সে এক মুষ্টি অন্ন দিবে তখন খাইবে। আবার যথালাভে সন্তুষ্ট। কিন্তু আমাদের ত তৃষ্ণার কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। প্রভু যতই যোগাইতেছেন আমাদের তৃষ্ণা ও অভিমান ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই বিশ্বাস জন্মে ?

বাবাজী। বিশ্বাস জন্মাইবার মূল কারণ শরণাগতি। অনন্যমনে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেই বিশ্বাস জন্মে। এই শরণাগতি ছয় প্রকার—

"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ॥"

অর্থাৎ যে যে বিষয়গুলি আমার অনুকূল, বিশেষ ভাবে বিচার পূর্ব্বক হৃদয়ে অবধারণ করতঃ সেই সেই বিষয় গ্রহণের দৃঢ় সংকল্প এবং কায়মনোবাক্যে প্রতিকূল বিষয়গুলির সংসর্গ পরিত্যাগ করার সংকল্প। মোট কথা যে যে বিষয়গুলি আমার অনিষ্টকারী, তাহাদিগকে আমি প্রাণান্তেও গ্রহণ করিব না এবং যে যে বিষয়গুলি আমার ইষ্টকারী, তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, ইহাতে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আমায় পৃথক্ থাকিতে হয় সেও ভাল। এই যে দৃঢ়তা এইটীই শরণাগতির প্রধান সোপান। এই সোপানে আরোহণ করিলেই তিনি রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস জন্মিবে। যেমন বিশ্বাস জন্মিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে রক্ষাকর্ত্তৃত্ব পদে তাঁহাকে বরণ করা এবং বরণ করিয়াই তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদনকেই শরণাগতি বলে। এই শরণাগত ব্যক্তির কখনই বিনাশ নাই। শরণাগত ব্যক্তির রক্ষার জন্য তিনি

নিজে সর্ব্বদা ব্যস্ত। নিজের মনেই ভাবিয়া দেখ না, এই যে চারি পাঁচ শত লোক এই স্থানে প্রসাদ পাইতেছে, ইহাদিগকে কি তুমি খাইতে দিতেছ? প্রভু যদি না দেন তুমি দিতে পার কি? অপরের কথা ত দূরে থাকুক, তোমাকে যদি তিনি খাইতে না দেন তুমি খাইতে পার কি? আজই না হয় নিজেকে বেশ কার্য্যক্ষম বিচারশক্তি-সম্পন্না বা বুদ্ধিমতী মনে করিতেছ; যখন গর্ভস্থাবস্থায় ছিলে, তখন কোন্ বিদ্যাবুদ্ধির বলে জীবন রক্ষা করিয়াছিলে? আবার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কোন্ বিচার বা কৌশলবলে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়াছিলে? আবার সংগৃহীত অন্নই যদি তিনি খাইতে না দেন, তবে তোমার খাইবার সাধ্য আছে কি? সুতরাং সর্ব্বদা প্রভুর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নাচের পুতুলের ন্যায় সংসারে চলিতে হইবে। তাঁহার উপর নির্ভয় করিয়া বসিয়া থাকিলে কখনই অভাব হইতে পারে না, এ কথা ধ্রুব সত্য। এই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেব সঃ কিং ভক্তানুপেক্ষতে?"

মনে মনে এই ধারণা দৃঢ় করিয়া ভগবৎ-আশ্রমে বাস করা উচিত। সতী স্ত্রীর ধর্ম্ম অবলম্বন করাই সাধকের কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সতী স্ত্রী যেমন পতিপরায়ণা, পতির সুখে সুখী, পতি যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিবেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার দ্বারাই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, অসতীর ন্যায় সর্ব্বদা "এ চাই ও চাই, এইরূপ বস্তু আনিয়া না দিলে চলিবে না" ইত্যাদি ভাবে জ্বালাতন করা কখনই উচিত নহে। যদিও তাঁহার সেবার জন্য চেষ্টা বা ইচ্ছাকে স্বতন্ত্র চেষ্টার মধ্যে নাও ধরা হউক, তথাপি তাঁহাকে যদি বেগ দিয়া সেবা করা যায়, তবে সে সেবায় লাভ কি? সেবা অর্থ সুখ প্রদান করা। সুখময়কে সুখী করিতে হইলে আনুগত্যভাব ও নিষ্ঠা চাই। তিনি ভাবের ভুখা। ভাবমাখান সামান্য বস্তুকেও অতিশয় আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর ভাবশূন্য অতি উপাদেয় বস্তুকেও অতি

তুচ্ছজ্ঞানে দূরে পরিহার করিয়া থাকেন। তাই কোন সাধক বলিয়াছেন—"চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চাও না চতুর্ব্বিধ রস। তুমি কেবল ভাবগ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাবেই বশ॥ একা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশিদিন। ভাব ক'রে ডাকিলে পরে ভাবনাক দীনহীন॥"

ইত্যাদি নানারূপ উপদেশ প্রদানের পর বাজার করিবার আদেশ করিলে ললিতাদাসী সেই টাকা দুইথাক গণিয়া দেখে যে একাশী টাকা রহিয়াছে। তখন বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ কি করিতে হইবে? বাবাজী মহাশয় সম্পূর্ণ ভার উহার উপর দিয়া বলিলেন, "তোমাদের হাতে টাকা না রাখিয়া, যাহা যাহা বিশেষ প্রয়োজন যোগাড় কর।" বলিয়া নিজে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে গমন করিলেন। ললিতাদাসীও হৃষ্টচিত্তে প্রয়োজনমত নানারূপ দ্রব্য বাজার হইতে আনাইতে লাগিল। এইরূপে অনেকদিন পরে জগন্নাথদেব শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববৎ সেবাপূজাদি চলিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ও কীর্ত্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদিন বাবাজী মহাশয় বলরাম বাবুর বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এই সময় বলরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জগবন্ধু আসিয়া প্রণাম করিল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই জগবন্ধুর শরীরে মহাব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে; ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়া বই হ্রাস হইতেছে না। যদিও বহুদিন হইতেই বাবাজী মহাশয় উহাকে দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আজ যেন কি শুভ মুহূর্ত্তে উহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল। বলরামকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলরাম! জগুর ত শরীরটা দিন দিন বড়ই খারাপ হইতেছে, ইহার কোনরূপ উপায় করিতেছ না কেন?"

বলরাম। আজ্ঞে! উপায় আমি আর কি করিব? চিকিৎসা যত প্রকার হইতে পারে, আমার সাধ্য মতে আমি চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু ক্রমিক বৃদ্ধি ভিন্ন বিন্দুমাত্র কম হইতেছে না, সুতরাং আমি আর কি করিব?

বাবাজী। দেখ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত গুরুতর অপরাধের ফলে এই সমস্ত

ব্যাধি জন্মে। কাজেই প্রায় দেখা যায় কোনও দৈববল ভিন্ন ইহার আর অন্য ঔষধে ফল দর্শায় না। শ্রীরাধাকুণ্ডে একমূর্ত্তি বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁর দক্ষিণ হস্তের কব্‌জিখানি খসিয়া গিয়াছিল; তিনি সেই হাতের সঙ্গে ঝাড়ু বাঁধিয়া শ্রীকুণ্ডের চতুর্দ্দিক ঝাড়ু করিতেন। একদিন কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব বসিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছিলেন, হঠাৎ ঐ বৈষ্ণবের উপর দৃষ্টি পতিত হইলে সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আহা মরি এই বৈষ্ণবটীর কি একান্ত অনুরাগ! না জানি কি অপরাধে ঐরূপ ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস একমাত্র রজরাণীর কৃপা হইলেই সমস্ত ভাল হইয়া যায়।" প্রভুর ইচ্ছায় ঐ কথাটী বাবাজী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। সেই দিন হইতেই উক্ত বাবাজী মহাশয় সর্ব্বদার তরে কেবল রজ মাখিতে লাগিলেন। কখনও শ্রীকুণ্ডের জলে রজ গুলিয়া তাই মাখিতে লাগিলেন, কখনও বা শুষ্ক রজ মাখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই বাবাজী মহাশয়ের শরীর নির্ব্ব্যাধি হইয়া অতিশয় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিল। এইরূপ অনেক স্থলে দেখা যায়।

বলরাম। আজ্ঞে! দৈববল হইতে আর বল নাই, একথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু দৈব একমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ত! সেই বিশ্বাসটী ত আর অপরের হাতে নহে?

বাবাজী। সে কথা ঠিক, "বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর"; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে অনেকটা তোমাদের উপর নির্ভর করে। কারণ এ যখন ছেলেমানুষ, তখন পিতা মাতা যদি ইহাকে ভক্তি বিশ্বাসের পথে অগ্রসর করিবার চেষ্টা করে তবে অনেকটা আনুকূল্য হয়।

বলরামবাবু তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখুন, আমি নিজে ঘোর অবিশ্বাসী, আমি আর উহার কি বিশ্বাস জন্মাইব? তবে আজ হইতে উহাকে আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন।"

বাবাজী। নিতাই! নিতাই! আমার নিকট দিলে কি হইবে! নিতাইচাঁদকে দাও, তাঁহার দাস তিনি রক্ষা করিবেন!

বলরামবাবু জগবন্ধুর হাত ধরিয়া বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে অর্পণ পূর্ব্বক সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আমি আর কিছু জানি না, আমি আপনার চরণে অর্পণ করিলাম, আজ হইতে আমাদের সহিত ইহার সংস্রব রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আপনার নিকটে সর্ব্বদা থাকিবে, আপনার আদেশ অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিবে, আপনার ইচ্ছা হয় ভেক দিয়া দিন। আমাদের আর ইহার উপর কোনও দাবী দাওয়া নাই।"

বাবাজী। কেবল তুমি একাই ত আর ইহার অধিকারী নও? তোমার স্ত্রীর কি মত একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

বলরাম। আজ্ঞে! আমি সে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এমন কি পাড়া প্রতিবেশী অভিভাবকস্থানীয় যাহারা, সকলেরই মত যে ইহাকে আপনার চরণে অর্পণ করা উচিত। আজ হইতে আমি ইহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম।

এই বলিয়া জগবন্ধুকে বলিলেন, "বাবা! আজ হইতে তুমি আর আমাদের নও, সম্পূর্ণভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণে আত্মসমর্পণ কর, প্রাণপণে ইঁহার আদেশ প্রতিপালন কর, তোমার ইহকাল পরকালের গতি হইবে। এমন কি জন্মজন্মান্তরীয় অপরাধসকল নিবৃত্তি হইয়া পরম সুখ লাভ করিতে পারিবে।" জগবন্ধুও বাবাজী মহাশয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বেশ বাবা! নিতাই-চাঁদের সংসারে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন কর, পিতা মাতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর। তোমার এই স্থূল শরীরের উপর উঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার, উঁহারা সরল প্রাণে আদেশ করিলে তোমার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার সুযোগ ঘটিবে।" জগুও তাহাই করিল। বলরামবাবু সরল প্রাণে বলিলেন, "বাবা! তুমি অকাতরে গিয়া ভগবৎ ভজন করতঃ জীবন ধন্য কর, তোমার

দ্বারা আমরাও কৃতার্থ হইতে পারিব।" জগু তখন পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক মাতার নিকটে গিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলে মা সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! তোমার যেরূপ শরীরের অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আমরা মায়া করিয়া রাখিলে কি হইবে। এতদিন কত চেষ্টা করা হইল, যখন কোনই ফল ফলিল না, তখন বাবাজী মহাশয়ের নিকট থাক, ইঁহার কৃপায় তোমার মঙ্গল হইবে।" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জগুও মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে ঝাঁজপিটা মঠে গমন করিল। এই হইতে জগবন্ধু বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গেই রহিল। বাবাজী মহাশয় উহাকে ঠাকুরের সম্মুখে ত্রিসন্ধ্যা আটাশটী করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম, রজে গড়াগড়ি, বৈষ্ণব-অধরামৃত, চরণামৃত সেবা, সাধ্যানুসারে অঙ্গনে ঝাড়ু করা, সমুদ্রস্নান এবং জগন্নাথদেবের মন্দিরের ভিতর বাহির চারিবার করিয়া পরিক্রমা এই সমস্ত যাজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জগুও অনন্যভাবে ইঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে জগুর শরীর ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। আর জগু যেন সে জগু নাই। গায়ের রং পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দেখিয়া সকলে অবাক্! যেই জগুকে দেখিতেছে সেই উচ্চকণ্ঠে বাবাজী মহাশয়ের জয় দিতেছে। বাবাজী মহাশয় যখন যে স্থানে যাইতেছেন, জগুও সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। ইনি যখন সদলে কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন, তখন জগুও সঙ্গে সঙ্গে ছিল। জানি না প্রভুর কি ইচ্ছা! জগুর শরীর একেবারে সুস্থ হইয়া গেল। কখনও যে তাহার শরীরে ব্যাধি ছিল, এরূপ চিহ্ন রহিল না। কিন্তু মানসিক গতির একটু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেরূপ গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, আদিষ্ট যাজনে বিশেষ নিষ্ঠা ছিল, অধরামৃত চরণামৃতে বিশ্বাস ছিল, ক্রমিক যেন তাহার হ্রাস হইতে লাগিল, কেহ কিছু বলিলেই তাহার উপর আক্রোশ। একদিন কুসুমমঞ্জরীদাসী বলপূর্ব্বক উহাকে রজে গড়াগড়ি দেওয়াইলে, সে উঠিয়া তাহাকে যথেষ্ট গালাগালি

দিতে লাগিল। "স্বকর্ম্ম-ভুক পুমান্।" মানসিক বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। আবার যেন ধীরে ধীরে রোগের সঞ্চার হইতে লাগিল। যখন সদলে বাবাজী মহাশয় বাবু প্রসন্নকুমার রায়বাহাদুরের দক্ষিণেশ্বরের বাগানে ছিলেন, তখন একদিন জগুর অবস্থা দেখিয়া ললিতাদাসী কাতর ভাবে উহাকে লইয়া গিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট সমস্ত জানাইলে ইনি বলিলেন, "দেখ, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত গুরুতর অপরাধের ফলে এই ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। সুতরাং সহস্র চেষ্টা করিলেও ভক্তি বিশ্বাস রাখিতে দেয় না; আমি কি করিব?"

ললিতা। আজ্ঞে! বিপদে পড়িয়াই ত লোক শরণাপন্ন হইয়া থাকে? ভক্তিবিশ্বাসপূর্ব্বক যে লোক কোন যাজন করিতে পারিবে, সে আর মহৎ আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইবে কেন? যাহার কিছু নাই তাহাকে যদি উদ্ধার করিতে পারেন তবেই ত জানি কৃপা!

বাবাজী। কৃপা কথার প্রকৃত অর্থ তাহাই বটে, কিন্তু কৃপালব্ধ বস্তু যদি রক্ষা করিতে না পারে তবে কি করা যাইবে? প্রভু প্রতিমুহূর্ত্তে কৃপা করিতেছেন; জীব যদি গ্রহণ না করে, অনুভব না করিয়া নানারূপ দুষ্কৃতি করিতে থাকে তবে প্রভু কি করিবেন? একজন তোমারই উপকারের জন্য তোমার নিকট আসিল, আর তুমি যদি তাহাকে দাঁড়াইতে না দাও, নানারূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া দূরে তাড়াইয়া দাও, তবে সে কি করিবে? কৃপার প্রাণ একমাত্র বিশ্বাস। কৃপা পাইবার পূর্ব্বে জীব যতই কেন অবিশ্বাসী, ভক্তি-শ্রদ্ধাবিহীন, দুরাচার থাকুক্ না তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই; কিন্তু কৃপা প্রাপ্ত হইবার পরও যদি সে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না করে তবে কৃপা মরিয়া যায়। কাজেই প্রাণহীন বস্তু অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। এজন্য এই সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত লোক প্রায়ই ভাল হয় না— ক্বচিৎ দুই একটী। এই ছেলেটীর প্রথম যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, এখন আর সে সমস্ত যাজন বা গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা একেবারেই নাই; কাজেই এত কষ্ট।

ললিতাদাসী তখন সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিল, 'যাহা হইয়াছে, এখন হইতে আবার যাহাতে পরিবর্ত্তন হয় সেই কৃপা করুন। এই দেখুন, কি দুরবস্থা হইয়াছে' বলিয়া ক্ষত স্থান দেখাইল। দেখিয়া বাবাজী মহশয়ের চোখে জল আসিল— বলিলেন, "আমি আর কি বলিব! যাও, প্রথমে গঙ্গার রজ লাগাইয়া বেশ উত্তমরূপে ধুইয়া ফেল। পরে একবার কিঞ্চিৎ সরিষার তৈল মাখাইয়া তারপর আবার গঙ্গার রজ মাখাইয়া দাও এবং পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব-চরণামৃত অধরামৃত পাইতে থাকুক্। নিতাইচাঁদের কৃপায় ভালও হইতে পারে।" ললিতাদাসী বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। বলিতে কি একদিন ধুইবার সময় ক্ষত স্থান হইতে দুই তোলা আড়াই তোলা পচা মাংস খসিয়া পড়িতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! প্রভুর কৃপায় সাত দিনে ক্ষত স্থান শুষ্ক হইয়া গেল। পনের দিনে একেবারে নির্দ্দোষভাবে রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। এইরূপে প্রায় তিন চারি বৎসর কাল ইঁহার সঙ্গে থাকিয়া একেবারে নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য লাভ করিল। দেহ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন হইল। বিধির বিড়ম্বনায় এত কৃপার পরেও তাহার চৈতন্য আসিল না। ক্রমে মহৎসঙ্গ ছাড়িয়া সংসারে যাতায়াত করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপ দুইদিকে থাকিয়া অবশেষে একেবারে মায়ার করাল কবলে পতিত হইয়া সংসারে ঝাঁপ দিল। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ অনেক সময় জগুকে সৎপথে অগ্রসর করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হওয়ায় একদিন বাবাজী মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, "আজ্ঞে! এত কৃপার পরেও এরূপ পরিবর্ত্তন হয় কেন?"

বাবাজী। পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অভিমান। ঘৃণা, লজ্জা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা প্রভৃতি যাহা কিছু অনিষ্টের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মূলে একমাত্র অভিমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহার ইহজন্মে যতটুকু হইবার হইয়াছে, ইহার অতিরিক্ত তোমরা চেষ্টা করিতে গেলে ক্রমে তোমাদের প্রতি উহার অশ্রদ্ধা আসিবে। সুতরাং যাহাতে অনুরূপ অপরাধ সঞ্চয় না

হয়, সে বিষয়ে তোমাদের চেষ্টা করা উচিত। উহার মানসিক বৃত্তির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া তোমাদের সম্পূর্ণ অন্যায়; বরং প্রাণে প্রাণে নিতাইচাঁদকে জানাও, যাহাতে উহার ভবিষ্যৎ জন্মের ফল ভাল হয়।

—

গুণসিন্ধু

একদিন বাবাজী মহাশয় ঠাকুরমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তি একটী স্থানে বসিয়া আছেন, আশ্রমবাসী দুই চারিজন নিকটে বসিয়া নানারূপ তত্ত্বকথা শুনিতেছেন—বেলা অনুমান চারিটার সময় হরিনামের ঝোলা হাতে একটী ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তটীর বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ ছচল্লিশ বৎসর হইবে।

ভক্তটীর দর্শনমাত্র বাবাজী মহাশয় যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু ভক্তটী শশব্যস্তে মালার ঝোলাটী রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুইটী চোখের জল উঁহার গণ্ডদেশ দিয়া লম্বিত শ্মশ্রু বহিয়া পড়িতেছে। বাবাজী মহাশয় নানারূপ সান্ত্বনা বাক্যে নিজ নিকটে বসিবার জন্য বলিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই না বসিয়া কেবল গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন, "বাবা! আমায় কৃপা করুন, আমি ঘোর পাষণ্ড, অবিশ্বাসী পামর— আমায় শ্রীচরণে স্থান দিন।" বলিয়া পুনরায় ইঁহার শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ইনি তাঁহার হাত ধরিয়া নিজ আসনের নিকট বসাইলেন। ক্রমে নানারূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভক্তটী বলিলেন, "আমার নাম আপনাদের দাস শ্রীগুণসিন্ধু রায় চৌধুরী, নিবাস বাখরগঞ্জ জেলা। আজ কয়েকদিন হইল শ্রীধামে আসিয়াছি। যদিও আমি আপনার

সংকীর্ত্তনাদি প্রায়ই শ্রবণ করিয়া থাকি, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার চরণে উপস্থিত হইবার ভাগ্য এতদিন আমার ঘটে নাই। ইচ্ছা থাকিলেও আমি ঘোর পতিত— আপনাদের নিকট আসা আমার পক্ষে বামনের চাঁদধরার ন্যায় সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে যখন একবার আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিয়াছেন, তখন চিরজীবনের মত আশ্রয় দিতে হইবে! আমি আপনার ছেলে। আমাকে যেরূপ ভাবে চলিতে হইবে বা যাহা যেরূপ করিতে হইবে আদেশ করিবেন।

বাবাজী। বাবা! কোথায় বাসা করিয়াছ?

গুণ। আজ্ঞে! এই কুণ্ডাইবেণ্টসাহী বানাম্বর গলির মধ্যে একটী বাড়ী ভাড়া নেওয়া হইয়াছে।

বাবাজী। বাবা! সঙ্গে আর কে কে আছে?

গুণ। আজ্ঞে! একমাত্র আপনার শ্রীচরণ ভরসা। আমি সঙ্গে প্রায় কাহাকেও রাখি না। আপনি যে যে তীর্থস্থানে কৃপা করিয়া ঘুরাইয়াছেন সর্ব্বত্রই একাকী। তবে একটা বাসা না করিলে চলে না তাই করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া যেন আমায় দূর করিয়া দিবেন না।

বাবাজী। সে কি বাবা! তোমরা পরম ভক্ত, প্রভুর অন্তরঙ্গ। তোমাদের ভয় কি?

গুণ। আজ্ঞে! আমার মনের অভিলাষ, যে কয়েকমূর্ত্তি বৈষ্ণব আশ্রমে আছেন, সকলে একবার চরণধূলি দিয়া সেই বাসাটী পবিত্র করেন। এ বিষয়ে আপনার কি মত?

বাবাজী। নামকীর্ত্তন করিতে যাইবে, না মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য বলিতেছ?

গুণ। বাবা! প্রায় সেই রকম; কারণ দাসকে যেরূপ ভাবে ধামে আনিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রসাদ নাম মাত্র।

ইত্যাদি নানারূপ দৈন্যসূচক কথাবার্ত্তা বলিয়া চলিয়া গেলেন। যথা—

সময়ে বাবাজী মহাশয় সগণে গুণসিন্ধুবাবুর বাসায় মহাপ্রসাদ পাইতে গমন করিয়া দেখেন যে প্রচুর পরিমাণে যোগাড় করা হইয়াছে। আর গুণসিন্ধুর চোখে জল যেন সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। সকলেই উঁহার ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

এইরূপে কয়েকদিন যায় একদিন গুণসিন্ধু বাসায় বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, এই সময় বাবাজী মহাশয় ভ্রমণ করিতে করিতে গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র গুণসিন্ধু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। শশব্যস্তে আসন দিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক নানারূপ স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবা! এস্থানে হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইবার সুবিধা আছে কি?"

বাবাজী। তা বলরামকে দিলে সে ভাঙ্গাইয়া দিবে; সে জন্য কোনই চিন্তা নাই।

গুণ। আজ্ঞে! কিছু কিছু জিনিষপত্রের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বাবাজী। আচ্ছা, তার জন্য চিন্তা কি? আমি এখনই বলরামকে ডাকাইয়া ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া বাড়ীর ঝিকে বলিলেন, "হ্যাঁগা! তুমি বলরামবাবুর বাড়ী জান কি?" সে বলিল "আজ্ঞে! হ্যাঁ, জানি বৈ কি! আমি এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি।" বলিয়া বলরামকে ডাকিয়া আনিলে বাবাজী মহাশয় তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। বলরাম বলিল, "আজ্ঞে! হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইতে হইলে কাছারীতে না গেলে হইবে না।"

গুণ। আচ্ছা, আপাততঃ বাজার হইতে কিছু পিতল কাঁসার বাসনপত্র আনা যাইতে পারিবে কি? তৎপর নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা দেওয়া যাইবে।

বাবাজী। হ্যাঁ, তা কেন হবে না? বলরাম কোনও দোকান

পরিচয় করাইয়া দিবে। টাকার জন্য ভাবনা কি? একমাস পরে দিলেও কোন আপত্তি নাই।

এই বলিয়া বলরামের সহিত গুণসিন্ধুকে দোকানে পাঠাইয়া দিলেন। বলরামও সরলপ্রাণে শ্রীজগন্নাথদেবের সিংদরজায় হরি পাট্রা নামক জনৈক দোকানীর সহিত উহার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ হরি! ইনি যখন যে সমস্ত কাপড় কিংবা বাসনপত্রাদি চাহিবেন, তোমার নিকট না থাকিলেও তুমি অন্য দোকান হইতে আনিয়া নিঃসঙ্কোচে ইঁহাকে দিবে। টাকা পয়সার জন্য কোন ভাবনা নাই। সে জন্য আমি দায়ী রহিলাম।"

গুণ। না দাদা! আপনার দায়ী হইবার কোন প্রয়োজন নাই, আমি টাকা ভাঙ্গাইয়াই ইহাদের দিয়া দিব।

দোকানীও অতিশয় আগ্রহ সহকারে তিনি যাহা যাহা চাহিতেছেন, তাহাই দিতেছে। সেইদিনই কাপড় এবং অন্যান্য বাসন পত্রাদিতে প্রায় পঞ্চাশ ষাট্ টাকার জিনিষ লইলেন। এইরূপ ভাবে ক্রমে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণের সঙ্গে খুব মেশামেশি করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব চতুরতা! হয়ত একজনের নিকট হইতে পঁচিশটী টাকা ধার আনিয়া বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিগণের মধ্যে কোনও গৃহস্থ ভক্তের নিকট রাখিয়া দিলেন। তাহার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচয় না থাকায় সে রাখিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিলে, গুণসিন্ধু অমনি বলিল, "সে কি ভাই! টাকা পয়সা অতি তুচ্ছ জিনিষ; তোমাদের ন্যায় ব্যক্তির প্রতি যদি সামান্য টাকা পয়সাতেই বিশ্বাস না করিব, তবে আর পরমার্থ-ধন পাইব কিরূপে?" এইভাবে হয়ত পাঁচদিন তাহার নিকট রাখিয়া দিল। কোনও দিন দুই, কোনও দিন পাঁচ, কোনও দিন দশ, এরূপ ভাবে দেওয়া নেওয়া করিতে লাগিল। হয়ত একদিন নিষ্কারণে আসিয়া বলিল "দাদা! পঞ্চাশটী টাকা দাও ত, আমি কাল আবার তোমাকে দিয়া যাইব!" সে মনে

করিল প্রায়ই ত এইরূপ দেওয়া নেওয়া হয়, আচ্ছা দিই না কেন এই ভাবিয়া দিল। আবার সন্ধ্যার সময় হয়ত সেই টাকাই আনিয়া বলিল, "ভাই! মনে করিয়াছিলাম কালই দিব, কিন্তু আজ যখন হাতে আসিল, তখন মনে করিলাম, দাদা হয়ত আমায় অবিশ্বাস করিবে যাই এখনই দিয়া আসি।" ইত্যাদিরূপে সকলের সহিত একটা বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য ব্যবহার করিতে লাগিল। নিজের যে পাণ্ডা তাহার নিকট হইতে একশত টাকা ধার করতঃ একদিন জগন্নাথের ভোগ দিয়া ঐ পাণ্ডাদিগকেই ভোজন করাইল। চার আনা করিয়া ভোজন দক্ষিণা, নিজের পাণ্ডাকে একযোড়া কাপড়, এইরূপ যাহার যাহা যোগ্য তাহাকে সেইরূপ সম্মান করিতে লাগিল। দুইদিন চারিদিন পরেপরেই বলরামবাবুর নিকট দশ পাঁচ টাকা লইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু নোট ভাঙ্গাইবার কথা কেহ উপস্থিত করিলেই বলে, "হ্যাঁ তাইত কাল পাণ্ডা বলিয়াছিল যে তাহার একখানা নোট দরকার। আমি যোগাড় করিতেছি।"

গুণসিন্ধুর বাসায় প্রায়ই বৈষ্ণবসেবা ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে। বিশেষতঃ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গিদিগের ত কথাই নাই। কোনও দিন জলখাওয়া, কোনও দিন জগন্নাথের মহাপ্রসাদ, কোন কোনও দিন বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিশেষ অনুনয় পূর্ব্বক ইঁহার সঙ্গিগণের দ্বারা বাসায় রান্না করাইয়া সকলকে সেবা করাইতে লাগিল।

কয়েকজন ভক্তের অনুরোধে এক সময় বাবাজী মহাশয় কটক গিয়াছেন; সঙ্গিগণ বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। ললিতাদাসী বিশেষ কাতরতার সহিত যাকে তাকে বলিতেছে, "কেহ যদি কটক যাইত, তবে বড়ই ভাল হইত।" শুনিয়া গুণসিন্ধু বলিল, "বেশ ত! আমারও কাজ হইবে, আমি হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া আনিব; বাবাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব। আপনি আমাকে দশটী টাকা দিন ত, আমি আসিয়া দিব।" ললিতাদাসী উহার কথামত দশটী টাকা উহাকে দিল।

সে কটকে গিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিল, "বাবা! আমি কেবল এই নোট ভাঙ্গাইতেই আসিয়াছি।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "বেশ বাবা! এই স্থানে ভাঙ্গানই ভাল হইবে।" গুণসিন্ধু বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গেই আছে; কিন্তু নোট ভাঙ্গাইবার নাম গন্ধও নাই। একদিন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "কৈ গুণসিন্ধু! নোট ভাঙ্গাইতে এসেছ বুঝি ?"

গুণ। আজ্ঞে! তাইত ভাবিতেছি, এখান হইতে অতগুলি টাকা লইয়া যাইব, সেটা বড়ই অসুবিধা হইবে; চলুন, পুরীতে গিয়াই ভাঙ্গান হইবে।

এই বলিয়া সেইদিনই বাবাজী মহাশয়ের সহিত পুরী চলিয়া আসিল। কয়েকদিন যায় একদিন বাবাজী মহাশয় বেড়াইতে যাইতেছেন, এই সময় গুণসিন্ধুর সহিত দেখা হইলে সে বলিল, "বাবা! এই মনে করি, এতগুলি টাকা এখানে রাখা ঠিক নয়; অতএব আপনার ওখানে রাখিয়া দেওয়াই উচিত।" বাবাজী মহাশয়ও সরলভাবে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা? যাহাতে তোমার কোনও রূপ অসুবিধা না হয়, তাহাই কর।" তখন গুণসিন্ধু হৃষ্টচিত্তে একটী কাপড়ের পুঁটুলী খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী গেঁজিয়া দুই হাতে ধরিয়া বলিল, "বাবা! এই ইহার মধ্যে দুই হাজার টাকার দুইখানি নোট আছে। এই কাপড়ের বোচকাটী শুদ্ধ আপনার আশ্রমে রাখিয়া দিন।" বাবাজী মহাশয়ও একটী ছেলের হাতে ললিতাদাসীর নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে, তাহাকে বলিবে, "অতিযত্নে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিবে, যেন কেহ না খুলে।" ছেলেটী ললিতাদাসীকে সেইরূপ বলায় সেও অতি যত্নে একটা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিল। এদিকে ৺দুর্গাপূজার সময় গুণসিন্ধু মহাধুমধামের সহিত সমস্ত বাবাজীদিগকে খাওয়ান দাওয়ান করিতে লাগিল। আশ্রমবাসী বাবাজীদিগকে একখান করিয়া চাদর ও বহির্ব্বাস এবং ললিতাদাসীকে একখানি বোম্বাই শাড়ী, কুসুমমঞ্জরীদাসীকে একখানি ভাল শাড়ী, এই-

রূপে প্রায় শতাবধি টাকা খয়চ করিল। সমস্তই সেই হরির দোকান হইতে ধারে আনা হইতেছে। আর হাত খরচার জন্য যাহা প্রয়োজন, অমনি বলরামের কাছ থেকে আনা হইতেছে। গুণসিন্ধুর অন্য সমস্ত ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট; কিন্তু টাকাকড়ির ব্যাপারে যেন অনেকেই একটু কেমন কেমন হইয়া পড়িতেছেন। ললিতাদাসী একদিন বাবাজী মহাশয়কে বলিল, "আজ্ঞে গুণসিন্ধু যেন কেমন কেমন কথাবার্ত্তা বলে বা ব্যবহার করে, লোকটী কিরূপ আমরা ত কিছুই বুঝিতেছি না ?" বাবাজী মহাশয় একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তোমাদের ঐ এক কুৎসিত প্রকৃতি যে, লোকের দোষ ভিন্ন কখনও গুণ চোখে পড়ে না! যে লোকটা দুই ঘণ্টাকাল আহ্নিক পূজায় অতিবাহিত করে, আর যাহার সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-সেবাগত প্রাণ, সে লোকের উপর তোমাদের সন্দেহ হইবার কারণ কি বল দেখি! সে ত তোমাদের নিকট কোনও কিছু প্রার্থী নহে! তবে মিছামিছি এ মক্ষিকাবৃত্তি কেন ?"

শাস্ত্রে যে বলিয়াছেন—

গৃহ্লাতি সাধুরপরস্য গুণং ন দোষান্।
দোষান্বিতো গুণিগুণান্ পরিহায় দোষং ॥
বালঃ স্তনাৎ পিবতি দুগ্ধমসৃক্ বিহায়।
ত্যক্ত্বা পয়ো রুধিরমেব পিবেজ্জলোকা ॥

এই দৃষ্টান্ত দেখিতে হইলে একমাত্র তোমাদের নিকট আসিতে হয়। বেশ প্রকাশ্য শত শত গুণ রহিয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত চাপা দিয়া দোষ না থাকিলেও একটা সম্ভাবনা করিয়া দোষের সৃষ্টি করার কি দরকার? ইত্যাদি নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এদিকে গুণসিন্ধু দোকানে, বাজারে, পাণ্ডাদের নিকট, বলরামের নিকট এবং বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গী অন্যান্য বাবু-ভায়াদিগের নিকট হইতে প্রায় নয় শত সাড়ে নয় শত টাকা ধার করিয়াছে, তবুও ধারে বিরত নহে। একদিন বলরামবাবুর

নিকট চল্লিশটী টাকা চাহিলে তিনি বলিলেন, "দাদা! আজ আমার নিকট টাকা নাই; আপনার নোট আনুন, আমি ভাঙ্গাইয়া দিই।" গুণসিন্ধু ঐ কথাটা বাবাজী মহাশয়কে বলায়, ইনি বলরামকে যে কোনও-রূপে হউক অন্ততঃ ধার করিয়াও গুণসিন্ধুকে চল্লিশটী টাকা দেওয়ার আদেশ করিলেন। বলরামবাবু বড়ই বিব্রত হইয়া পরদিবস প্রাতে ললিতাদাসীকে আসিয়া বলিলেন যে, "দিদি! আমি ত আর টাকা যোগাড় করিতে পারিতেছি না, এদিকে গুণসিন্ধুর নিকট নোট চাহিলে সে দিতেছে না। এখন কি করা যায়? আপনি একবার বাবাজী মহাশয়কে বলিয়া একখানা নোট আমাকে আনাইয়া দিন আমি আজই ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।" বাবাজী মহাশয় ক্ষৌর হইতে ছিলেন, ললিতাদাসী সমস্ত কথা ইঁহাকে বলায় ইনি একটু কড়া ভাবে বলিলেন, "নোট ত তোদের ঘরেই রহিয়াছে! লোককে ত আর তোদের বিশ্বাস হইবে না। সে ত আজ কতদিন হইতে নোট আমার কাছে দিয়াছিল, আমি ফণির দাদার হাতে তোর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। আচ্ছা সেই কাপড়ের পুঁটলীটী বাহির কর্ ত! তাহার ভিতর হইতে একখানা নোট বলরামকে ভাঙ্গাইতে দেওয়া যাক্।" ললিতাদাসী তখন শশব্যস্তে গিয়া সেই কাপড়ের পুঁটলীটী বাহির করতঃ তাহার মধ্য হইতে একটী গেঁজিয়া বাহির করিল। তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "কেমন! এখন বিশ্বাস হইয়াছে ত?" ললিতা-দাসী আর কিছু না বলিয়া বলিল, "তবে এটা খুলি?"

বাবাজী। হ্যাঁ খুলিবে বই কি? উহার মধ্যে দুইখানা নোট আছে সে বলিয়াছে। উহার একখানা বলরামকে দাও।

ললিতাদাসী বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে গেঁজের গাঁট খুলিয়া দেখে দুই দিক্ খুব কড়া ভাবে সেলাই করা। বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ দূরে ক্ষৌর হইতেছিলেন, ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে! এ যে খুব আঁটা সেলাই করা?"

বাবাজী। হউক, তুমি খুলিয়া ফেল।

তখন ললিদাসী ছুরি দ্বারা সেলাই কাটিয়া তাহার ভিতরে দেখে দুইখানি ফুল্‌সক্যাপ কাগজ। একখানিতে সামান্যাকারে আহ্নিকপূজার পদ্ধতি লেখা, আর একখানিতে গুরুবন্দনা লেখা। বলরামবাবু নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় বিস্ময়জনক এই ঘটনায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ললিতাদাসী বিস্ময়-বিগলিত-কণ্ঠে বাবাজী মহাশয়কে বলিল, "আজ্ঞে নোটের নম্বর শুনুন; একখানা 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥' ইত্যাদি। দ্বিতীয়খানা বৈষ্ণবোচিত আহ্নিক পদ্ধতি।" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় অতিশয় বিস্মিতভাবে সেই স্থানে আসিয়া যথাযথ বিবরণ অবগতি-মাত্র প্রায় পনের মিনিট কাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা যাহা হইবার হইয়াছে, এখন ঠিক পূর্ব্ববৎ সেলাই করিয়া রাখিয়া দাও!" কালা-কৃষ্ণদাস নামক একটী ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তুমি শীঘ্র গুণসিন্ধুর নিকট যাইয়া সে যে অবস্থায় থাকে তাহাকে বলিবে যে— তোমার বাবা তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই এক বার ডাকিতেছেন। এ দিকে ললিতাদাসী পূর্ব্ববৎ গেঁজে সেলাই করিয়া কাপড়ের পুঁটুলীর ভিতর করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাখিয়া দিল। এদিকে গুণসিন্ধুর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বাবাজী মহাশয় আর একজনকে পাঠাইলেন। গুণসিন্ধু তখন আহ্নিক করিতে বসিবার আয়োজন করিতেছিল। ডাকের উপর ডাক আসিতেছে দেখিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "এত তাড়াতাড়ি বাবা আমারে ডাক্‌ছেন কেন কও দেখি?" ভাষার ছটায় লোকটী যে বরিশাল জেলার লোক তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে; এবং পরিচয়েতেও সে বরিশালের সন্নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের কথা বলিয়াছে। আসিতে বিলম্ব দেখিয়া পুনর্ব্বার লোক পাঠাইবেন, এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিতেই

বাবাজী মহাশয় অতি যত্নের সহিত বসাইলেন। তাহার কিন্তু ঐ এক বুলি, "তা নয় বোঝ্‌লাম্‌ আমারে ডাক্‌ছেন কেন কন্‌চেন্‌ ?"

বাবাজী। দেখ বাবা! এই বলরাম বলিতেছে যে নোট পাইলে আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাঙ্গাইয়া দিতে পারি। তাই বলি, উহাকে একখানা নোট ভাঙ্গাইতে দেওয়া যাক্‌; কারণ বাজারে অনেক দেনা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ললিতাদাসীকে বলিলেন, "হ্যাঁরে সে দিন যে ফণির দাদার হাতে কাগড়ের বোচকাটা দেওয়া হইয়াছিল, সেইটা দে ত ?" সেও ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কম্পিতকলেবরে সেই বোচ্‌কাটা আনিয়া গুণসিন্ধুর সম্মুখে রাখিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "যাহা হউক বাবা! তুমি একখানা নোট ভাঙ্গাইতে দাও ত ?" সেও একবার বোচ্‌কাটা খুলিয়া সেই গেঁজেটী হাতে লইয়াই বলিল, "এডা যেন কেডা খোল্‌ছে বল্যা মোনে লাগছে।" আবার কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া বোঁচকাটী বাঁধিতেছে আর পূর্ব্ববৎ নিজ ভাষায় আমাকে কেন ডাকা হইয়াছে এইকথা বলিতেছে। বাবাজী মহাশয় যতই বলিতেছেন যে—"কেবলমাত্র এই নোট ভাঙ্গাইবার জন্যই তোমাকে ডাকাইয়াছি।" সে কথায় কান নাই। কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবে প্রলাপ করিয়া পরে বলিল, "আচ্ছা, কালপাণ্ডা নোটের টাকা দিতে চাহিয়াছে, আমি সত্বরই নোট ভাঙ্গাইয়া আনিতেছি।" তখন বলরাম বাবু বলিলেন; "কেন দাদা! আমাকে দিন না, আমি ভাঙ্গাইয়া দেই।" তখন বাবাজী মহাশয় বলরামের উপর একটু কপট ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "কেন বাধা দিচ্ছ, ও হয় ত পাণ্ডাকে কথা দিয়াছে, তাহাকে না দিয়া তোমার হাতে দেওয়া কি উচিত ? একি তোমাদের কথা" বলিয়া গুণসিন্ধুকে বলিলেন, "বাবা। আচ্ছা তুমি তবে এখন গিয়া আহ্নিকাদি কর, বৈকালে কিম্বা কাল যেরূপ ভাল বিবেচনা কর সেইরূপ করিও।" সেও কৌশলে বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পাইয়া, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বোচ্‌কাটী হাতে লইয়া বাসায় গমন করিল।

এ দিকে বাবাজী মহাশয় বলরামকে বলিলেন, "বলরাম! মনে কিছু ক্ষোভ করিও না; এত টাকাই গিয়াছে, আরও পাঁচ সাতটী টাকা উহার বাসায় দিয়া আইস। নচেৎ উহার যাইবার বড়ই কষ্ট হইবে।" বলরামবাবু বাবাজী মহাশয়ের অদোষদর্শিতা এবং অলৌকিক উদারতা-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি আমাকে যদি কিছু না বলেন, তবে আমি উহাকে কিঞ্চিৎ চৈতন্য করিয়া দেই।" বাবাজী মহাশয় বলরামের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "ছি ছি বলরাম। অমন কথা তোমার ন্যায় ব্যক্তির মুখে আনা উচিত হয় নাই। যে যে লোক টাকা পাইবে সে সব ব্যবস্থা পরে করা যাইবে, আগে তুমি উহাকে পাঁচটী টাকা দিয়া বলিবে যে—'আপনি চল্লিশ টাকা চাহিয়াছিলেন, আমার হাতে টাকা না থাকায় এই পাঁচ টাকা এখন দিলাম পরে দেখা যাইবে।' অর্থাৎ এমন ভাবে ব্যবহার করিবে যেন এ সমস্ত ব্যাপার যে তোমরা টের পাইয়াছ, ইহা যেন সে বুঝিতে না পারে; আর একটী কথা— ভাবিয়া দেখ, টাকাটা লইয়া সে ত কোনও অসৎ কার্য্য করে নাই। তবে তোমাদের তাহার প্রতি ক্রোধ করা কেন? ক্রোধ করিতে হয় আমার প্রতি কর; কারণ আমিই তোমাদিগের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছি!" ইত্যাদি নানারূপ উপদেশ দানে সকলেরই মনের বিকার শান্ত করিয়া নিজে স্নানাদি করিতে গেলেন। বলরামবাবুও বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুযায়ী পাঁচটী টাকা গুণসিন্ধুকে দিয়া ইঁহার শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করতঃ গুণসিন্ধুর বিশেষ উপকার করিলেন। যথাসময়ে গুণসিন্ধু প্রসাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে মালা এবং তিলকের ঝোলাটী সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। বাসাস্থ লোকেরা জানে বাবু দর্শন হইতে আসিবেন; কিন্তু বাবু আর আসিলেন না দেখিয়া বাড়ীওয়ালা বাড়ীভাড়ার জন্য বাসনপত্র সমস্ত আটক করিয়া পাঁচ সাত দিন রাখিল; পরে সে সমস্ত আত্মসাৎ করিল। দোকানের টাকা এবং অন্যান্য যে সমস্ত টাকা সমস্তই বাবাজী মহাশয়

বলরামের সহযোগে সরবরাহ করিলেন এবং যাহাতে এই ঘটনা লইয়া বিশেষ কোনও-রূপ সমালোচনা না হয়, সেইরূপ চেষ্টা বা সঙ্গিগণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলরামকে বলিলেন, "দেখ বলরাম! এইরূপ প্রতারণার কথা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর কোনও বিদেশী লোক আসিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না; সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা গোপন রাখাই কর্ত্তব্য। মনে কর যেন এই সমস্ত বৈষ্ণবসেবা তোমরাই করিয়াছ।"

—

ফণীর নবজীবন লাভ

এক সময় শ্রীধাম পুরীতে ভয়ানক কলেরার উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। চারিদিকে হা হুতাশ! যে পাড়ায় ব্যারাম আরম্ভ হইতেছে, সে পাড়ার লোক ভয়ে বেলা চারিটার পর আর বাহিরে বাহির হইতে পারে না। উড়িষ্যাদেশের স্বাভাবিক নিয়ম যে, কোনও-রূপ সংক্রামক (কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি) রোগ উপস্থিত হইলে সপ্তাহ ভাগবত পাঠ,* নগরকীর্ত্তন, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এবং পানা প্রভৃতি দ্বারা গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের মহাস্নান এবং ষোড়শ উপচারে অর্চ্চনা করিলেই শান্তি হইয়া থাকে। যদি বা কোনও বারে অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, তবে সমস্ত সেবক পাণ্ডা এবং অন্যান্য ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা জগন্নাথের সিংহ-দ্বারে কুণ্ড প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এ বৎসর জগন্নাথদেবের কি ইচ্ছা! কিছুতেই কিছু হইতেছে না। ক্রমেই যেন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

* উড়িয়া জগন্নাথদাস-কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের উড়িষ্যা ভাষায় অনুবাদ।

বাবাজী মহাশয় এই সময় দুই একজন সঙ্গিসহ কটকে গিয়াছেন। এত বিপদের সময় বাবাজী মহাশয় পুরীতে না থাকায় অনেকেই বিশেষ ভাবিত হইয়াছেন। কয়েকদিন পরে পরস্পরের নিকট পুরীর অবস্থা শ্রবণ করিয়া বাবাজী মহাশয় পুরী আগমন করিলেন। প্রায় প্রত্যহই ইঁহারা মন্দিরে সংকীর্ত্তন করিতে যান। ঐ সময় অনেকেই বলাবলি করেন যে, অন্য সময় প্রায়ই দেখা যায়, বাবাজী মহাশয় নগর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; কিন্তু এই মহামারি উপস্থিত, কৈ এসময় ত একদিনও বাবাজী মহাশয় কীর্ত্তন বাহির করিতেছেন না, ইহার কারণ কি? কেহ বা বাবাজী মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কৈ বাবা! এসময় নগরকীর্ত্তন বাহির করিতেছেন না কেন?" ইনি বিনীতভাবে বলেন, "বাবা! যাঁহার কীর্ত্তন তিনি বাহির না করিলে আমি কি করিব? তোমরা তাঁহাকে বল, তাঁহার ইচ্ছা হইলেই হইবে।"

এইরূপে কয়েকদিন যায়, একদিন জগমোহনে খুব কীর্ত্তন হইতেছে। সকলেই বিভোর। এদিকে মাধব পশুপালক জগন্নাথের অবকাশ এবং প্রথম পূজা শেষ করিয়া জগন্নাথকে প্রণাম করিবার সময় কি মনে করিলেন জানি না— হঠাৎ জগন্নাথের কণ্ঠমালা ছড়াটী একেবারে দুই পাশ হইতে খসিয়া পড়িল। পশুপালক প্রেমগরগর-ভাবে উক্ত মালাগাছটী লইয়া সংকীর্ত্তনের নিকট আসিলেন। ভগবদিচ্ছায় বাবাজী মহাশয়ও কীর্ত্তন হইতে আল্‌গা ভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। পশুপালক আসিয়া সেই মালাগাছটী ইঁহার গলায় দিয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "জগন্নাথ আপনাকে নগর কীর্ত্তন বাহির করিবার আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার সেবকগণ বড়ই হতাশ হইয়াছে। কাজেই প্রভুর প্রাণে ব্যথা জন্মিয়াছে।" বাবাজী মহাশয় করযোড়ে বলিলেন, "কিরূপে আদেশ করিলেন?"

মাধব। আমি পূজা শেষ করিয়া যখন নমস্কার করি, তখন মনে মনে ভাবিলাম, "হা প্রভু! পুরীবাসী সমস্তই তোমাগত প্রাণ, তবে তাহাদের

এত কষ্ট, এত হা হুতাশ, এত ব্যকুলতা দেখিয়াও কি তোমার প্রাণ কাঁদে না ? আমাদের বিশেষ চেষ্টা হোম, তাহাও ত হইয়া গেল, কৈ কিছুই ত কমিল না। নামসংকীর্ত্তন ? সেও ত পাড়ায় পাড়ায় হইতেছে। তবে একমাত্র বড় বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন বাকী আছে, সে যদি তুমি আদেশ কর তবেই হইতে পারে।" এই ভাবিতেছি এই সময় নিজ কণ্ঠমালা ফেলিয়া দিলেন। এখন আপনার মনে যে বিচার হয় করুন।

ইহা শুনিয়া বাবাজী মহাশয় অশ্রুকম্প-পুলকাবলি-বিভূষিত-কলেবরে কীর্ত্তনের মধ্যে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনে যেন ক্রমেই আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ জগমোহনে সংকীর্ত্তন করতঃ মন্দিরের পশ্চিম দরজা দিয়া বাহির হইয়া মার্কণ্ডেশ্বরসাহি দিয়া বরাবর নরেন্দ্র সরোবর পরিক্রমা পূর্ব্বক হেরাগৌরীসাহি দিয়া ঝাঁজপিটা মঠে পৌঁছিলেন। পর দিবস প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক সকলকে বলিলেন, "দেখ, আজ সংকীর্ত্তন-মহাসমর উপস্থিত। সাবধান! কেহ যেন এই সমরে পরাঙ্মুখ হইও না। আর একটী কথা— এই সংকীর্ত্তন-সমরে সৈন্যমণ্ডলীমধ্য হইতে যিনি আলাহিদা হইবেন, অর্থাৎ মণ্ডলী-ছাড়া হইবেন, তাহার জন্য নিতাইচাঁদ দায়ী নহেন।" বলিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন :—

শমন তুই পালা পালারে চাঁদনিতাই এল।
নিতাই এল, গৌর এল, সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত এল ॥
(যে দেশে) নিতাই গৌর নাইরে, সেই দেশে তোর যাওয়া ভাল।
আমরা গৌর খাতায় নাম লিখেছি, তোর অধিকার উঠে গেল ইত্যাদি।

আজকার সংকীর্ত্তনের সুর বা ভাবভঙ্গী যেন অন্যরকম। আজ আর বাবাজী মহাশয়কে দেখিলে প্রেমের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইতেছে না। এক একবার মদমত্ত সিংহের ন্যায় 'জয় নিতাই' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন,

আর মনে হইতেছে যেন পৃথিবী কম্পিতা হইতেছেন। সিংহদ্বারে গিয়া এমনই ব্যাকুলতার সহিত নাম করিতে লাগিলেন যে, দোকানী পসারী নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই নামের মধ্যে উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই আজ প্রাণের আবেগে নাম করিতেছে। সেবক, পাণ্ডা, পূজারী প্রভৃতি যে যেখানে ছিলেন, সকলেই আসিয়া নামে যোগ দিতে লাগিলেন। সকলেরই মনে দৃঢ় ধারণা যে, আজিকার এই সংকীর্ত্তন-সমরে প্রাণনাশক দুর্জ্জয় সংক্রামক ব্যাধিরূপ শত্রু নিশ্চয়ই পরাভূত হইয়া দূরে পলায়ন করিবে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন— "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥" আজকার সকলের ব্যাকুলতা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ইহারা প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ আর্ত্ত ভক্ত। আর্ত্ত ভক্তের যেরূপ সহজে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, অন্য ত্রিবিধ ভক্তের সেরূপ হওয়া কঠিন। মদমত্ত প্রবলপরাক্রম সিংহের ন্যায় সংকীর্ত্তনের দল হরচণ্ডী-সাহির ভিতর প্রবেশ করিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ লোকসকল সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া নিজ নিজ কার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উধাও হইয়া ছুটিতেছে। বালক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী সকলেরই হতাশ প্রাণে আজ যেন নব আশার সঞ্চার হইল। আজ বহুদিন হইতে কাহারও মুখে এরূপ আনন্দের হাসি দেখা যায় নাই। সংক্রামক ব্যাধির অত্যাচারে সকলেই সশঙ্কিত ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। প্রায় প্রত্যহই নাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল ; কিন্তু এতদিন কাহারও প্রাণের ভয় দূর হয় নাই। জানিনা আজ কে যেন অলক্ষিতভাবে সকলকে সাহস প্রদান করিতেছে। সকলে একবাক্যে বলিতেছে "আর ভয় নাই ; আজ হইতে আমরা নির্ভয়। জগন্নাথের ইচ্ছায় যাহারা রোগী তাহারা বাঁচিয়া উঠিবে, যাহারা সুস্থ তাহাদের আর কিছুই হইবে না" ইত্যাদি। বাবাজী মহাশয় অগ্রে অগ্রে চরণে চরণ রাখিয়া নৃত্য করিয়া যাইতেছেন। ক্রমে সংকীর্ত্তনের বেগ

এতই প্রবল হইল যে কে কোথায় পড়িতেছে, কে কাহাকে ধরিতেছে তাহার ঠিক নাই।

এ দিকে সংকীর্ত্তনের পরিশ্রমেই হউক বা কোনওরূপ সময়ের ফেরেই হউক, ফণী একটু একটু করিয়া পাশ কাটিয়া সংকীর্ত্তনের দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। যে লোক বাবাজী মহাশয়ের কথা ছাড়া এক পা নড়ে না, সে আজ একেবারে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনের দল ছাড়িয়া একাকী ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই ফণীর পেটবেদনা আরম্ভ হইল। অতি দ্রুতগতি আউলিয়া মঠে গিয়া বাহ্যে গেল। একবার দাস্ত হইবা মাত্রই চোখমুখ কাল হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি মঠে আসিয়া ললিতাদাসীকে আমূল বৃত্তান্ত বলিল। উহার মুখের চেহারা দেখিয়াই সকলের মনে ভাবনা জন্মিল। ক্রমে আরও দুইবার দাস্ত এবং বমি হইতে না হইতেই চলৎশক্তি রহিত হইয়া গেল। এমন কি ঘরের মধ্যেই বাহ্যে করিতে লাগিল। এ দিকে সাতসাহি ঘুরিয়া সংকীর্ত্তন আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাধাকান্ত দেবের সম্মুখে বহুক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য ও কীর্ত্তনের পর কীর্ত্তনসমাপ্তি হইল। তখন ললিতাদাসী ধীরে ধীরে বাবাজী মহাশয়ের কাছে গিয়া বলিল, "আজ্ঞে! ফণীর ভয়ানক অসুখ। কয়েকবার দাস্ত এবং বমি হইয়াছে, অবস্থা অতীব শোচনীয়।"

বাবাজী। বেশ হইয়াছে; কেন, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, যিনি সংকীর্ত্তন-মণ্ডলী ছাড়িয়া পৃথক হইবেন, তাঁহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

ললিতা। আজ্ঞে বালক, শরীর অসুস্থ বোধ হইয়াছিল, তাই বোধ হয় সঙ্গছাড়া হইয়াছে।

বাবাজী। এ অসম্ভব কথা; নিতাইচাঁদের গণ্ডীর ভিতরে থাকিলে কখনই বিপদ আসিতে পারিত না। তাহাতে আবার আউলিয়া মঠে

গিয়া খিচুড়ী প্রসাদ পাইয়াছে। যেমন লোভী তেমনি তাহার ভোগ হইবে আমি আর কি করিব ?

ললিতা। একে বালক তাহাতে আবার রোগী, এখন তাহাকে বলাও যা আর কাঠের পুতুলকে বলাও তাই ! অতএব আপনি একবার চলুন।

এই বলিয়া যে ঘরে ফণী ছিল ঐ ঘরে লইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় ফণীর অবস্থা দেখিয়া বিমর্ষভাবে সেস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "অবস্থা অতীব শোচনীয়, প্রাণের আশা আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। তবে তোমাদের কর্ত্তব্য অনুসারে তোমরা যত্ন কর।" তখন ললিতাদাসী সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিল, "কি আশ্চর্য্য ! এই জলজ্যান্ত ছেলেটা মারা যাইবে ! আপনারা ইহার কোনই প্রতিবিধান করিবেন না ? তবে যে আপনারা অত নামের বড়াই করেন, তাহা কে বিশ্বাস করিবে ?"

বাবাজী। এ মন্দ নয়, জীব নিজ কর্ম্মদোষে নানাবিধ কষ্টভোগ করিবে, আর দোষের বেলায় ভগবানের বা ভগবানের নামের !

ললিতা। না, আমি ত ভগবানের কিঞ্চিৎ মাত্র দোষও বলি না। দোষ আপনাদের। আপনারা ইচ্ছা করিলেই ত জীবের এইসমস্ত দুর্দ্দৈব দূর করিয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করিতে পারেন ; সুতরাং আপনারা অবহেলা করেন বলিয়াই জীব এইরূপ বিপদে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইয়া থাকে।

বাবাজী। তবে কি তোমার মতে এইরূপ সামান্য রোগ ভাল হইবার বা লোকের নিকটে সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য অথবা কাহারও মকর্দ্দমা জয় করিয়া দিবার জন্য নামের কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে ? আর সেই কার্য্য না হইলেই নামের বাঞ্ছাকল্পতরুত্বের হানি হইল ! এইরূপ ধারণা জীবের হৃদয়ে জন্মাইয়া দেওয়াকেও আমি হীন প্রবৃত্তি বা নামশক্তির অপলাপ করা বলি।

ললিতা। না, আমি ত নামের উপর ওরূপ কথা বলি নাই! আপনাদের ইচ্ছার কথা বলি। আপনারা ইচ্ছা করিলেই ভগবান সেই ইচ্ছা পূরণ করিতে বাধ্য।

ইত্যাদি নানারূপ কথোপকথনের পর বাবাজী মহাশয় স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ পাইয়া কেবল উপবেশন করিয়াছেন, এই সময় ললিতাদাসী অতিশয় ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে একবার চলুন, বোধ হয় ছেলেটা আর রক্ষা পাইল না, হাত পায় খিল ধরিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়াছে, অনবরত ঘর্ম্ম হইতেছে, কণ্ঠস্বর একেবারে বিকৃত হইয়াছে, এমন কি লোক চিনিতে পারিতেছে না, অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতেছে, অনবরত দাস্ত এবং বমি হইতেছে, তথাপি পেট ক্রমেই ফাঁপিতেছে, শরীরের রং একেবারে কাল হইয়া গিয়াছে। আমি আর কি বলিব? বাঁচিবার কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় একটু উদাসভাবে বলিলেন, "আমি আর কি করিব? একবার বাবাকে বল" বলিয়া নিজেও তাঁহার নিকট চলিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাবাজী মহাশয়ের শিক্ষাগুরু শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস মহান্ত মহারাজ পুরীতে আসিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে তাঁহার থাকিবার স্থান হইয়াছে। বাবাজী মহাশয় অন্য ঘরে বাস করিতেছেন।

বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে ললিতাদাসী গিয়া অতি কাতরভাবে ফণীর কথা জানাইতে লাগিলে তিনি বলিলেন, "আমি আর কি করিব? যা যাদবকে বল্" বলিতে বলিতেই ইনি গিয়া পঁহুছিলেন। ললিতাদাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেখুন, এই বাপ বেটা দুইজনেই উপস্থিত আছেন, যদি এই ছেলেটা মারা যায়, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই সকলের মালা কণ্ঠী ছিঁড়িয়া সংসারে পাঠাইয়া দিব এবং জগতে নাম এবং মহতের কোন শক্তি নাই, এই কথা ঘোষণা করিয়া বেড়াইব। আপনারা

জগতের উপকার করিতে বসিয়াছেন, জীবের জন্য আপনাদের প্রাণ কাঁদে। তবে এ জীবটা জীবের মধ্যে নয় কি? সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ড! আমি আর কিছুই বলিব না; এইবার বুঝা যাইবে।" বলিয়া দ্রুতগতি চলিয়া গেল। বাবাজী মহাশয়ও বৃদ্ধবাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক ফণীর নিকট গেলেন। ফণীর তখন শ্বাসের টান হইয়াছে দেখিয়া বাবাজী মহাশয় উহার মস্তকের নিকট উপবেশন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই নাম হইতেছিল। বাবাজী মহাশয়ের আদেশে সকলে খুব জোরের সহিত নাম করিতে লাগিল। ক্রমে উহার অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়া পড়িল। ললিতাদাসী পায়ের নিকট বসিয়া সাশ্রুগদগদকণ্ঠে নাম করিতেছে, এই সময় হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত ফণীর দমবন্ধ হইয়া গেল। অর্দ্ধমুদ্রিত উত্তাল নয়ন— সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল, নিস্পন্দ হস্তপদ শিথিল, উপস্থিত সকলেই রোরুদ্যমান। ললিতাদাসী "হা নিতাই গৌর রাধেশ্যাম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় পদ্মাসন করিয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ "**হা নিতাই**" বলিয়া হুঙ্কার করতঃ কম্পিতকলেবরে দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী ফণীর মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। দেখিতে দেখিতে বাবাজী মহাশয়ের লোচনদ্বয় আরক্তিম ও ঢুলু ঢুলু হইল। ভাব-ভঙ্গীগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত; উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারও সহিত কোন কথা নাই, যেন অন্য কাহারও সঙ্গে অর্দ্ধস্ফুটিত স্বরে স্খলিত ভাষায় কথা বলিতেছেন; কিন্তু কথাগুলি তেজঃস্বিতাপরিপূর্ণ। ক্ষণকাল মধ্যে ফণীর মৃত দেহ স্পন্দিত হইল, শ্বাস বহিতে লাগিল, মুখের কালিমা দূর হইয়া গেল, শিথিল অঙ্গসকল স্পন্দিত ও উত্তেজিত হইল। ললিতাদাসী ফণীর ঐরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ প্রফুল্লিত চিত্তে হঠাৎ উহার মস্তকের দিকে চাহিয়া দেখে যে, যেস্থানে বাবাজী মহাশয় বসিয়াছিলেন, সেস্থানে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, অতি তেজস্বী, রক্তবর্ণ ঢুলুঢুলু-নয়নদ্বয়, হলমুষলধারী অতি দীর্ঘাকার একটী পুরুষ বসিয়া আছেন। দেখিবামাত্র ললিতাদাসী

বিস্মিত ভাবে কি যেন কি বলিতে গিয়া আর পারিল না— কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বাষ্পগদগদ কণ্ঠে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে যেমন "দেখ ভাই কি অপূর্ব্ব মূর্তি" এই কথাটী বলিল, অমনি দেখে বাবাজীমহাশয় বসিয়া আছেন। যদিও ললিতাদাসীর তখন বহু কথা বলিবার ছিল, কিন্তু আর বলিবার অবকাশ হইল না। বাবাজীমহাশয় ফণীর নিকট অতি সতর্কভাবে নাম করিবার ব্যবস্থা করতঃ নিজ নিত্যকৃত্য করিতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ঘোর অন্ধকার; আশ্রমের যে দিকেই দৃষ্টি পড়িতেছে সেই দিকই যেন ভয়ানক ভয়সঙ্কুল বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। যাহারা চিরদিন একাকী নানা দেশ-দেশান্তর, পাহাড়-পর্ব্বত ভ্রমণ করিয়াছে, তাহারাও আজ একাকী গৃহান্তরে পর্য্যন্ত যাইতে অসমর্থ। চারিদিকে যেন নানারূপ বিভীষিকা দেখা যাইতেছে। রাত্র যতই বেশী হইতে লাগিল, ততই ভীতির সঞ্চার অধিক হইতে লাগিল।

বাবাজী মহাশয়ের বুকে ভয়ানক শ্লেষ্মার প্রকোপ উপস্থিত হইল। অনবরত শ্লেষ্মা উঠিতেছে তথাপি বুকের চাপ কমিতেছে না। আশ্রমের উপর নানাবিধ অত্যাচার দর্শনে ইনি ঠাকুর-অঙ্গনে শয়ন করিলেন; কিন্তু কাহারও নিদ্রার সঞ্চার নাই। এক একবার এক একটা ভয়ানক শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। অথচ অনুসন্ধান করিলে কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। অতি সশঙ্কিত ভাবে রাত্র কাটিয়া গেল।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আশ্রমে দুইটী ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন! একটীর নাম গদাধর রথে, অপরটীর নাম গণেশ মহাপাত্র। ব্রাহ্মণ দুইটী দিবসে জগন্নাথের মুক্তিমণ্ডপে এবং অন্যান্য স্থানে জপ হোমাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, রাত্রে আশ্রমে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সেবা করেন। কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে উক্ত গণেশ মহাপাত্র অনুমান দশ ইঞ্চি উচ্চ একখানি মণি-নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি আনিয়া মঠে স্থাপন করিয়াছেন। মূর্ত্তিখানি চতুর্ভুজ, গদা, খড়্গ, শঙ্খ এবং অভয় হস্ত। সিংহোপরি বীরাসনে উপবিষ্টা। অতিশয়

উগ্রমূর্ত্তি। যে দিন হইতে মহাপাত্র দেবীকে মঠে আনিয়াছেন, সেইদিন হইতেই বাবাজী মহাশয় উক্ত মহাপাত্রকে বলিয়াছেন, "দেখুন, এ আপনার সেবার মূর্ত্তি ইঁহাকে আপনি নিজহস্তে সেবা করিবেন, ইঁহার সেবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন, সে সমস্ত আশ্রম হইতে দেওয়া হইবে ; কিন্তু সেবার জন্য আপনি দায়ী।" মহাপাত্র তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া পূজাদি করিতেছিলেন। এদিকে আশ্রমে একখানি সুলক্ষণ দারুতে যোগমায়া পৌর্ণমাসীদেবীর মূর্ত্তির আরোপ তাঁহার সেবাদি হইয়া থাকে। তাঁহার সেবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সেবক নাই। যাঁহার যখন ইচ্ছা তিনি তখন সেবা করিয়া থাকেন। মা যোগমায়া এতই শান্তমূর্ত্তি যে কাহারও কোনরূপ ক্রুটী হইলে নিজে তাহাকে আদেশ করিয়া পরিশুদ্ধ করেন। সুতরাং সকলেই পৌর্ণমাসীদেবীর প্রতি শ্রদ্ধালু।

বেলা অনুমান সাতটার সময় গণেশ মহাপাত্র দেবীর সেবা করিতে গিয়া একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আশ্রমবাসী সকলেই শশব্যস্তে সে ঘরের নিকট গিয়া দেখেন, দেবী ভূমিলুণ্ঠিতা এবং ভগ্নদশাপ্রাপ্তা। ললিতাদাসী ব্যস্তসমস্তভাবে এই ঘটনা বাবাজী মহাশয়ের নিকট বলিতে যাইবামাত্র বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ও আর আমার কাছে কি বলিবে ? গতরাত্রে যোগমায়া পৌর্ণমাসীদেবীর সহিত উক্ত দেবীর খুব যুদ্ধই হইয়াছে, ঐ দেবীর মনে আশ্রমের কিছু অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু অবশেষে নিজেই পরাস্ত হইলেন। প্রথম উহার হাতের গদা দুইখণ্ড হয়, পরে চক্রের আঘাতে উঁহার কটিদেশ ভগ্ন হয়। শান্তিময়ী যোগমায়া আশ্রমের শান্তি বিধান করিয়াছেন ; আর কোন ভয় নাই।" বলিয়া গণেশ দাস নামক জনৈক বাবাজীকে বলিলেন, "দেখ গণেশ! ঐ দেবীকে মার্কণ্ডেয় সরোবরে রাখিয়া আইস ত।" গণেশও সন্ধ্যার পরে বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুরূপ ব্যবস্থা করিল। এদিকে ফণীও ক্রমে সুস্থতা লাভ করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ফণী এখনও সম্পূর্ণ

নির্ভয় হয় নাই, আজ সন্ধ্যার সময় না গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন।” বলিয়া নিজ নিত্যকৃত্য করিতে গমন করিলেন।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় রামদাদাকে ডাকিয়া বলিলেন, “রাম! একবার সদলে নগর কীর্ত্তন করিয়া আইস ত?” রামদাদা ইঁহার আদেশ পাইয়া পরমানন্দে নগরকীর্ত্তনে বাহির হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইতে না হইতে বাবাজী মহাশয় যেন অত্যন্ত ব্যস্ত! মঠের সদর দরজার নিকট দাঁড়াইয়া নগরকীর্ত্তন ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা করিতেছেন। এদিকে ললিতাদাসী এবং কুসুমদাসীকে দুই কলসী জল লইয়া উক্ত দরজার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দশদিক্ কম্পিত করতঃ নগরসংকীর্ত্তন আসিয়া যেমন উপস্থিত হইল, অমনি ইঁহার আদেশক্রমে ললিতাদাসী ও কুসুমদাসী জল দুই কলসী দরজায় ঢালিয়া দিলে সকলে সেই জলের উপর দিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কিন্তু একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ললিতাদাসীকে আর এক কলসী জল আনিতে বলিলেন। সে জল লইয়া আসিয়া দেখে যে সংকীর্ত্তনদলের অনুমান দশহাত পিছনে এক বিকট মূর্ত্তি ঢুলিতে ঢুলিতে আসিতেছে। উহার স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত পিঙ্গলবর্ণ কেশকলাপ এক একবার শিরঃকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। চক্ষু দুইটী কোটরাভ্যন্তরস্থ এবং তাম্রবর্ণ। তাহার সেই অমানুষিক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি দর্শনে উপস্থিত সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় অতি ক্ষিপ্রহস্তে ললিতাদাসীর হাত হইতে জলের কলসীটী লইয়া উহার মাথায় ঢালিয়া দিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে “বের! বের!” বলিয়া উহাকে তাড়াইতে লাগিলেন। সেও অতি ভীতভাবে অবোধ্য ভাষায় হাউ মাউ করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় একখানা বড় লাঠি হাতে করিয়া যেমন উহাকে তাড়া করিলেন, অমনি সে ঊর্দ্ধশ্বাসে একেবারে সোজা রাস্তায় পলাইল। তখন সে যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থান

গোময়দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই; এইবার সকলে নিশ্চিন্তচিত্তে কালযাপন কর।"

ললিতা। আজ্ঞে! ও লোকটাকে দেখিবামাত্র অত ভয় হইল কেন?

বাবাজী। ও ভয়েরই মূর্ত্তি।

ললিতা। আচ্ছা, ও কি মনুষ্য নয়? মনুষ্যের মধ্যে ঐরূপ আকার ত আমি আর কখনও দেখি নাই!

বাবাজী। উহারা কামাচারী, যখন যে স্থানে যে জাতীয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিবে, সেই জাতীয় মূর্ত্তি ধারণ করিতে সমর্থ। এই যে বিসূচিকা ব্যাধি যাহাকে তোমরা কলেরা বল, ঐ ব্যক্তি তাহারই স্বরূপ।

ললিতা। আচ্ছা, উহারা ত রাক্ষসজাতীয়; তবে উহাদের হাতে মৃত্যু হইলেই ত অপঘাত মৃত্যু হইবে?

বাবাজী। যে সমস্ত ব্যাধি সহজাত সেই সমস্ত ছাড়া সংক্রামক ব্যাধিমাত্রে মৃত্যু হইলেই অপমৃত্যু মধ্যে গণ্য হইবে।

ললিতা। আচ্ছা, সংক্রামক ব্যাধি বা আকস্মিক মৃত্যু কি নিয়তি-ঘটিত না অন্য কোনও-রূপ? কারণ হয় ত কোনও রেল বা ষ্টীমার মারা গেলে তাহাতে এক সঙ্গে হাজার লোকের প্রাণ বিনাশ হইল, এই এক সঙ্গে এক কালীন এক প্রকারে কি এই হাজার লোকের নিয়তি ছিল? হয় ত কোথাও যুদ্ধে একসঙ্গে লক্ষ সৈন্যের প্রাণ বিনাশ হইল। এই গুলিকে কি নিয়তি বলা যাইবে?

বাবাজী। একসঙ্গে যে লক্ষলোকের নিয়তি হইতে পারে না, ইহার কোন অর্থ নাই। কারণ একমাত্র ভগবদিচ্ছার উপর সংসার-নাট্য-শালার ভার। ভগবদিচ্ছায় অসম্ভব কিছুই নয়।

ইত্যাদি নানা কথোপকথনে সে রাত্র কাটিয়া গেল। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ, আজ ফণীকে এক শত আট

কলসী জলে স্নান করাইতে হইবে।" শুনিয়া ললিতাদাসী বলিলেন, "আজ্ঞে, শরীর বড়ই দুর্ব্বল— উঠিবার সাধ্য নাই; এই অবস্থায় যদি ঠাণ্ডা লাগে, তবে বড়ই আশঙ্কার কথা নয় কি?" তখন বাবাজী মহাশয় একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, সে ভার তো আর তোমার উপর নয়! যিনি মরা বাঁচাইতে পারেন, তিনি কি ঠাণ্ডাকে গরম করিতে পারিবেন না? হায়রে মায়ামুগ্ধ জীব! প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে চায় না বা পারে না! সামান্য অন্ধ অর্থাৎ প্রাকৃত চক্ষুহীন ব্যক্তিকে কেহ কিছু দেখাইয়া বা বুঝাইয়া দিলে সে বুঝে; কিন্তু মোহান্ধ ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া বা বুঝাইয়া দিলেও সে বিশ্বাস করিতে চায় না!" ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া ললিতাদাসী নিজের অবিশ্বাসী হৃদয়কে ধিক্কার দিয়া বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল।

বেলা অনুমান আটটার সময় ধরাধরি করিয়া ফণীকে বাহিরের স্নান-বেদীর উপর আনিয়া বসান হইলে সঙ্গিগণ হৃষ্টচিত্তে ইন্দারার জল আনিয়া উহার মাথায় ঢালিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় সম্মুখে থাকিয়া নিজ ইচ্ছামত ফণীকে স্নান করাইয়া একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান এবং একটী সোণার আংটী হাতে দিয়া বলিলেন, "যা রে! এইবার গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম কর্।" ফণীও বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে ধীরে ধীরে ঠাকুর মন্দিরের দিকে গমন করিতে লাগিল। ইনি বলিলেন, "বেটা যেন রাজ-পুত্রের ন্যায় চলিতেছে। যা! তোর এইবার বিপদ দূর হইয়া গেল।" এইরূপভাবে ফণীকে পুনর্জ্জীবন প্রদান পূর্ব্বক পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

গণেশের কলেরা

কয়েকদিন যায়; একদিন প্রভাতে বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণসঙ্গে নাম করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেছেন। আজ যেন বাবাজী মহাশয়ের অন্যরকম ভাব। সঙ্গিগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছেন যে, "দেখ, আজ বাবাজী মহাশয়ের ভাবভঙ্গি বা কীর্ত্তনের প্রকার সবই যেন অন্যরূপ। অন্যদিন যেন কেমন মাধুর্য্যের মূর্ত্তি থাকেন, আজ যেন কেমন ঐশ্বর্য্যমাখান মূর্ত্তি। যেদিন কলেরা দূর করিবার জন্য নগরকীর্ত্তন বাহির করিয়াছিলেন, ঠিক সেই দিন এইরূপ ভাব হইয়াছিল। দেখ, আজও হয় ত কোনও-রূপ কিছু উদ্দেশ্য আছে।" ক্রমে সংকীর্ত্তন যেমন রাজবাড়ী অতিক্রম করিল, অমনি গোপী সাউ এবং নরসিংহ সাউ আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। বাবাজী মহাশয় উভয়কে উঠাইয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় গোপীসাউ বলিল, "প্রভু! একবার নাম লইয়া আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে। এই নরসিংহের ছোট ভাই গণেশ বাঁচে না। তাহার কলেরা হইয়াছে। এমন কি, এতক্ষণ আছে কি না সন্দেহ।

বাবাজী। এখন কিরূপ অবস্থা?

গোপী। আজ্ঞে, অবস্থার কথা আর কি বলিব? ডাক্তার জবাব দিয়া গিয়াছেন। বাঁচিবার লক্ষণ কিছুই নাই।

বাবাজী। তবে আমি যাইয়া কি করিব?

গোপী। একবার শেষ সময় আপনার শ্রীচরণ দর্শন এবং একটু নাম শুনিলেও তাহার পরকালের কার্য্য হইবে।

এই বলিয়া উভয়ে পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় উহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তোমরা যাও, আমি মন্দির হইতে ফিরিবার সময় তোমাদের বাড়ী হইয়া যাইব।

কোনই ভয় নাই, সকলে একসঙ্গে তাহার নিকট বসিয়া নাম কর; মঙ্গলময় নাম মঙ্গল করিবেন।" বলিয়া মন্দিরে চলিয়া গেলেন। উহারাও বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে ঘরে গিয়া নাম করিতে আরম্ভ করিল। যথাসময়ে বাবাজী মহাশয় মন্দিরের কীর্ত্তন শেষ করতঃ গোপী সাউদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। গণেশকে চিনিবার যো নাই; একেবারে কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় হিম। অনবরত ঘাম পড়িতেছে। নিয়তই দাস্ত বমি হইতেছে; কিন্তু পেটফাঁপা। নিদ্রোত্থিতের ন্যায় এক একবার চমকিয়া উঠিতেছে! উত্তোলনয়ন, নাসিকাগ্রভাগ বক্র। বিকৃতকণ্ঠে এক একবার অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিতেছে। ঊর্দ্ধটান শ্বাস হইয়াছে। এক একবার প্রাণবায়ু আছে কি না সংশয় জন্মিতেছে। বাবাজী মহাশয়কে দেখিবামাত্র উহার আত্মীয়স্বজন সকলেই অসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা— বাবাজী মহাশয় একবার গণেশের বক্ষে এবং মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করেন। নরসিংহ কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক গণেশের বুকের উপর দিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! আমরা বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন, কেবল মাত্র দুইটী ভাই, কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম। আজ যদি এই ভাইটী মরিয়া যায় তবে আর আমার উপায় নাই; এ শোক আমি কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিব না। আমি আর কি বলিব? আমরা দুই ভাই চিরজীবনের মত আপনার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আজ হইতে আমরা আপনার। আপনার জিনিষ অকালে নষ্ট হইবে বড়ই দুঃখের কথা। অতএব মিনতি করি, আমার ভাইটীকে এবার রক্ষা করিতেই হইবে। বাবাজী মহাশয় অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন— যেন এ রাজ্যেই নাই। ক্ষণকাল পরে কম্পিতকলেবরে গদগদকণ্ঠে 'জয় নিতাই জয় নিতাই' বলিয়া উঠিলেন। সঙ্গিগণ হরিধ্বনি করিতে লাগিল। গণেশ উচ্চকণ্ঠে "আমি

চলিলাম, আমায় ক্ষমা কর, শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী একটু পানা খাইতে আমার বড়ই সাধ হইয়াছে" বলিতে বলিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। সকলেই গণেশের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "নিতাইয়ের ইচ্ছায় ইহার কোন ভয় নাই। আর তোমরা শীঘ্র একটু পানা যোগাড় কর।" শুনিয়া সকলেই শশব্যস্তে শ্রীজগন্নাথদেবের পানা ভোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। এদিকে গণেশ বেশ সুস্থভাবে বাবাজী মহাশয়কে বলিল, "বাবা! আমি ঘোর পাষণ্ড অবিশ্বাসী জীব, আমার প্রতি আপনার এত কৃপা! আর কি বলিব? এ দেহে আপনার অধিকার, আপনি যা ইচ্ছা করিতে পারেন। আপনি যদি আদেশ করেন, তবে আমার বড়ই অভিলাষ যে একবার গিয়া সিংহদ্বারে গড়াগড়ি দিয়া আসি।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর। শ্রীজগন্নাথের পানা ভোগটা হইয়া আসুক।" বলিতে বলিতেই উক্ত পানা ভোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ, কিঞ্চিৎ প্রসাদী পানা সিংহদ্বারে অরুণ স্তম্ভের নিকট যে ব্যক্তি অতি ব্যাকুল ভাবে চাহিবে তাহাকে দিয়া তবে গণেশকে দাও।" তাহাই করা হইল। গণেশ সেই পানা প্রসাদ পাইয়া আপনার সামর্থ্যে বিছানা হইতে উঠিয়া উপস্থিত সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে সিংহদ্বারে গমনোদ্যত হইল। বাবাজী মহাশয় নরসিংহকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা উহার সঙ্গে থাক, কিন্তু কেহই উহাকে স্পর্শ করিও না। কিঞ্চিৎ পানা বেশী করিয়া জগন্নাথের ভোগ লাগাও, ও ইচ্ছামতে সকলকে বিতরণ করুক।" নরসিংহ বলিল, "আজ্ঞে আধ মণ কন্দের পানা সিংহদ্বারে ভোগলাগান হইয়াছে। পতিত-পাবনের সম্মুখে বিতরণ হইতেছে।' শুনিয়া বাবাজী মহাশয় হৃষ্টচিত্তে গণেশকে বলিলেন, 'যাও, স্বেচ্ছামত প্রসাদী পানা গিয়া বিতরণ কর।' বলিয়া নাম করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নরসিংহ প্রভৃতিও **'ভজ নিতাই গৌর**

রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই নাম করিতে করিতে গণেশকে লইয়া সিংহদরজায় গমন করিলেন। গণেশের অবস্থাপরিবর্ত্তনে পুরীবাসী সকলেই ইহাদের ভাগ্য এবং বাবাজী মহাশয়ের কৃপার জয় দিতে লাগিল। এক সময়ে পুরীর কলেরা নিবৃত্তি এবং ফণী ও গণেশের পুনর্জ্জীবনলাভ দেখিয়া শুনিয়া লোকসকল বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কিন্তু একমাত্র নামের প্রভাব ব্যতীত আর কোন সিদ্ধান্তই করিতেছেন না। সর্ব্বতোভাবে একমাত্র নামের জয় ঘোষণা করিতেছেন।

—

বিশ্বনাথের উদ্ধার

এইরূপ নানাবিধ আনন্দে দিন যাইতে লাগিল। একদিন বেলা অনুমান চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় ঝাঁজপিটা মঠে বসিয়া আছেন, নানাজাতীয় ভক্তগণ নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইনিও হাসিমুখে তাহার উত্তর দিতেছেন। এই সময় অনুমান বাইশ তেইশ বৎসর বয়স্ক একটী ভদ্রলোকের ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটীর হাতে কয়েকখানি যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় পুস্তক রহিয়াছে। ইহাদের প্রস্তাবিত ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কথাগুলি যেন উহার অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে। যদিও অনেক লোক বসিয়া আছেন, কিন্তু এক মাত্র বাবাজী মহাশয় ভিন্ন উহার এই অবস্থাটী আর কেহই অনুভব করিতে পারেন নাই। বাবাজী মহাশয় প্রস্তাবিত কথা বন্ধ করিয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! তোমার নাম কি ?"

আগন্তুক। আমার নাম বিশ্বনাথ।

বাবাজী। বাবা! বিশ্বনাথ দাস বলিলে ভাল হয় না কি?

বিশ্বনাথ। দেখুন, ও সমস্ত আমাদের ব্যবহার নাই। কারণ প্রায়ই আমাদের সাহেব লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং বাবু ভিন্ন দাস টাস বলা আমাদের অভ্যাস নয়। বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মে ও সমস্ত বড় একটা কেহ পছন্দ করে না।

বাবাজী। বাবা! তোমাদের কি ধর্ম্ম?

বিশ্বনাথ। আমরা ভগবান্ যিশুর মতাবলম্বী। খ্রীষ্টধর্ম্ম আদি এবং নিত্যধর্ম্ম।

বাবাজী। বাবা! ধর্ম্মশব্দ কখনই অনিত্য হইতে পারে না! ধর্ম্ম অব্যয়, শাশ্বত, নিত্য নিষ্কলঙ্ক, অখণ্ড। যত গোলমাল কেবল বিশেষণ লইয়া। বিশেষণের দোষে কেবল অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশেষ্যকে দোষী করিয়া থাকে। ধর্ম্মে কখনই দোষসংস্পর্শ হইতে পারে না।

বিশ্বনাথ। আপনি যতই বলুন না কেন, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এমন কুসংস্কার, কুৎসিত আচার এবং অশ্লীলতা আর কোন ধর্ম্মেই নাই।

বাবাজী। (মৃদু হাসিতে হাসিতে) কেন বাবা! তুমি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কি কি কুৎসিত ভাব অনুভব করিয়াছ, একবার বল দেখি।

বিশ্বনাথ। হিন্দুধর্ম্মের কথা কত বলিব! যাহারা যাজনকারী তাহাদের কথা দূরে থাক্, যাহাদিগকে দেবতা বলিয়া উপাসনা করা হয়, তাহাদের ব্যবহারগুলি কি বীভৎস দেখুন দেখি! হিন্দুদের এক দেবতা কালী, তিনি উলঙ্গভাবে স্বামীর উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। কি অসভ্য! ইহাদিগকে আবার কত আদর করিয়া ছাগ, মহিষ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করা হয়। আবার একটী প্রেমের ঠাকুর আছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি-ত প্রথম দেশশুদ্ধ রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিলেন। আবার তাহাদের লইয়া বস্ত্রহরণ, রাস, জলকেলি প্রভৃতি কত কত যে আচরণ করিলেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি একজন প্রধান দেবতা। আবার রামচন্দ্র একজন,

যুদ্ধেতে গিয়া বীরত্ব ত দূরে থাক্, ছল-চাতুরী কপটতা করিয়া কতকগুলি জীবের প্রাণবধ করিলেন। এইরূপ কত দেখাইব? আবার ভক্তদের কুসংস্কার দেখুন, মাটি দিয়া কতকগুলি পুতুল প্রস্তুত করিয়া তাহাদেরই পূজা, ভোগরাগ প্রভৃতিতে নানারূপ অর্থব্যয়! এদিকে পরোপকার বা দেশের উন্নতিকল্পে একটী পয়সা দেওয়া হইবে না! তার পর মরা মানুষের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কত আমি বলিব? হিন্দুধর্ম্মে আগাগোড়া কুসংস্কার এবং অশ্লীলতা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বাবাজী। আচ্ছা বাবা! তবে এক এক করিয়া শুন। প্রথম আদ্যাশক্তি কালী ঐরূপ বিপরীত বেশে কেন? লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি অষ্ট পাশ। "পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।" বাহ্যিক আবরণে আবৃত বা অনাবৃত, উহা কখনই রণোন্মত্তা মহাশক্তির লক্ষ্য হইতে পারে না। কাম নামক যে কুৎসিত বস্তুটীকে আমরা অতি সমাদরে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, ঐ বস্তুটী কখনও মহাপুরুষ বা মহাশক্তির হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং আমাদের পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে কখনও তাহাদের সমালোচনা সম্ভবে না। মহামায়া প্রাকৃত জীবগণকে দেখাইলেন, 'দেখ, জীবসকল! লোভী কামী ব্যক্তি মহাবলশালী বা ধনশালী হইলেও অল্পকালস্থায়ী। আমি তাহাদিগকে এইরূপে সংহার করতঃ সত্যের জয় ঘোষণা করিয়া থাকি। তৎপর কৃষ্ণলীলা। এ লীলা কামগন্ধহীন। কাম থাকিলেই সে স্থানে অন্ধকার, বিক্ষেপ, অবসাদ প্রভৃতি থ্যাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাময় পূর্ণ পূর্ণতম ঈশ্বর; তাঁহার লীলাখেলা জীবের ধারণার অতীত। শাস্ত্র বলিয়াছেন, অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, একটী কামুক পুরুষ সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে একত্রে নানারূপ লীলাকৌতুকাদি করিতে সমর্থ হয় কি? আবার দেখ, এই যে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা, ইহার বক্তা শুকদেব, শ্রোতা পরীক্ষিত মহারাজ। ইঁহাদের দুই জনের অবস্থা কি? শুকদেব আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের খেলা কাহাকে

বলে তাঁহার ধারণা নাই। এমন কি স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া যে একটা ভেদ তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি যে রসের বক্তা; আর ব্রহ্মশাপে সাতদিনের দিন অবশ্যমৃত্যু অবধারণ করতঃ যিনি গঙ্গাতীরে প্রয়োপবেশনে বসিয়া আছেন, তিনি যে রসের শ্রোতা, সেই রস কখন কামগত হইতে পারে কি? তাই শুকদেব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছেন, 'ব্রজগোপীদিগের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের এই বস্ত্রহরণ, রাসাদি লীলা যে জন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, তাহার অতি দুর্নিগ্রহ কাম অনায়াসে নিবৃত্তি হইয়া পরম শান্তিসুখ লাভ হয় এবং পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিশুদ্ধ গোপীপ্রেমের অধিকারী হইয়া থাকে। আর একটী তোমাদের ধারণা পৌত্তলিকতা হিন্দুদের কুসংস্কার। বাবা! তোমাকে এ সমস্ত কথা আর আমি কি বলিব! তুমি ছেলেমানুষ ধারণা করিতে পারিবে কি?

বিশ্বনাথ। আপনি বলুন, আমি নিশ্চয়ই ধারণা করিতে পারিব।

বাবাজী। বাবা! অবলম্বন এবং উদ্দীপন না হইলে উপাসনা হইতে পারে না। তুমি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ, সেই ধর্ম্মে কি মূর্ত্তি মানে না? তোমরা কি সম্মুখে যিশুর ফটো দেখিলে এই তাঁহার স্বরূপ মনে কর না? তাঁহার অনুরূপ মূর্ত্তি দেখিলে কি প্রণাম বন্দনা কর না বা করা উচিত নয়? তোমাকে একটী কথা বলি, দুঃখ করিও না। আমার বিশ্বাস—যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে হিংসা, নিন্দা, পরচর্চ্চা, দ্বেষ প্রভৃতি পাপসংস্পর্শ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বা উপাসনা বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। যেমন সূর্য্য উদয় হইলে অন্ধকার আপনা-আপনি দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ ধর্ম্ম বা উপাসনা হৃদয়ে উপলব্ধি হইলে নিন্দাদি আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। ছেলেমানুষ যাজন করিতে শিখ। লোকদেখান ধর্ম্মপ্রচারক হইও না। ধর্ম্মের সারবত্তা হৃদয়ে অবধারণ কর। দুই পাতা কূটতর্ক অনুসন্ধান করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি-উৎপাদক হইও না; শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

বল ত বাবা! বাইবেলে পরের নিন্দা, কোনও ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ বা পরের উৎপীড়ন করিতে কোথায় বলিয়াছেন? একটু বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে, যিশুর উপদিষ্ট উপাসনা-প্রণালী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট উপাসনা-প্রণালীতে কিঞ্চিৎ-মাত্র ভেদ নাই।

ইত্যাদি নানারূপ উপদেশ শুনিতে শুনিতে বিশ্বনাথ অধৈর্য্যভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল এবং আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে না পারিয়া অযথা নিন্দাদি করার দরুণ নিজেকে অপরাধীজ্ঞানে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। বিশ্বনাথের কাতর ক্রন্দনে উপস্থিত ভক্তগণের চক্ষে জল আসিল। সকলেই প্রভুর নিকট বিশ্বনাথের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেদিন এইরূপ ভাবে কাটিয়া গেল। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই বিশ্বনাথ, বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক কাতরভাবে বলিতে লাগিল, "বাবা! আমি ত অশেষ পাপে পাপী, দুরাচার, ধর্ম্মধ্বজী, অনাচারী। আমার কি উদ্ধার হইবে না! যদি কেহ না বুঝিয়া অখাদ্য খায় বা অকার্য্য করে, তবে তাহার কি আর এই পথে আসিবার উপায় নাই?"

বাবাজী। বাবা। ধর্ম্মপথ কোনটীই ত দূষিত নয়! ভ্রমান্ধ জীব কোন প্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়া লব্ধপদপ্রতিষ্ঠার আশায় ইতি উতি ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় মাত্র। পরমদয়াল অবতার নিতাই গৌর কলিযুগে জীবের একমাত্র অনুতাপই মহা মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। ভয় কি? নিজ নিজ প্রভুকে চিনিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও— কাতরপ্রাণে কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; দয়াময় কোলে তুলিয়া লইবেন।

বিশ্বনাথ তখন আশ্বস্তচিত্তে বাবাজী মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণের প্রার্থনা করিলে বাবাজী মহাশয় নিতাইচাঁদের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিত্যকৃত্য করিতে গেলেন। ক্রমে চারি পাঁচ দিন অন্তে যথাসময়ে শুভ

ক্ষণে বিশ্বনাথকে মন্ত্র প্রদান করিলেন। বিশ্বনাথ কিছুদিন সঙ্গে থাকিয়া নিজদেশে গমন করিল। দুর্দ্দৈববশতঃ কিছুদিন পরে দুঃসঙ্গ প্রভাবে আবার উহার মতি বিপরীত পথে চলিয়া গেল। মালা তিলক পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য রকম বেশ ধারণ করিল। "দুর্দ্দৈব সেবক যদি যায় অন্য স্থানে। বলবান্ প্রভু তার কেশে ধরে আনে ॥"

কালক্রমে বাবাজী মহাশয় একবার কটকে গমন করিয়াছেন। হঠাৎ বিশ্বনাথের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইল। সঙ্গিগণ কেহই উহাকে চিনিতে পারে নাই; কিন্তু প্রভু নিজভৃত্যকে চিনিলেন। বাবাজী মহাশয় একজন কটকবাসী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, ঐ যে ছেলেটী আসিতেছে ও বিশ্বনাথ নয়?" কটকবাসী ছেলেটী বলিল, "বাবা! উহার কথা মুখে আনিতে নাই; ও আমাদের গুরুভাই হইয়া বিধর্ম্মী হইল! মালাতিলক পরিত্যাগ করিয়াছে; সাধুবৈষ্ণব শ্রীমূর্ত্তি দেখিলে দণ্ডবৎ প্রণাম করে না। অন্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ায় ও নিতান্ত ভ্রষ্টাচারী।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা! জগৎ পরিবর্ত্তনশীল; দুর্ব্বল কলিহত জীব সঙ্গপ্রভাবে যদিও বিপথে পড়ে, নিতাইচাঁদের কৃপাকটাক্ষ হইলে পরিবর্ত্তন হইতে কতক্ষণ?" সঙ্গিগণ বলিল, "হ্যাঁ! একবার অন্য পথ হইতে এই পথে আসিয়া আবার যখন মতি পরিবর্ত্তন হইল, তখন উহার মতি ভাল হওয়া অসম্ভব।"

বাবাজী। আচ্ছা দেখ, অসম্ভব সম্ভবকারী স্বেচ্ছাময় নিতাইচাঁদের ইচ্ছা হইলেই হয় ত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমরা দেখিবে ঐ লোক ঠিক দেবপ্রকৃতি ভক্তির মূর্ত্তি হইবে।

ইত্যবসরে বিশ্বনাথ বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অনিমেষ নয়নে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিট-কাল কাহারই মুখে রা নাই; সকলেই নিশ্চল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কম্পিতকলেবরে বাবাজী

মহাশয়ের চরণতলে পতিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ঠিক বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "বাবা! আমি ঘোর অপরাধী, নারকী, আমার গতি কি হইবে? আমাকে আপনি কৃপা করিয়া নরক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবদোষে আমি আবার যে নরকের কীট ছিলাম, তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ রৌরবে পতিত হইয়াছি। 'দয়াময় দয়া করুন' একথা বলিতে পারি আমার এমন সাহস নাই তবে আপনি অদোষদর্শী পতিতপাবন এইমাত্র আমার ভরসা। বাবা! আমি আপনার কুসন্তান, ঘোর নরকের কীট! আমার কি আর গতির উপায় নাই? যদি উদ্ধারের উপায় না থাকে, তবে এমন কোনও উপায় আমাকে বলিয়া দিন, যাহাতে এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইতে না হয়।" এইরূপ ভাবে যখন অনেক আর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন বাবাজী মহাশয় কৃপার্দ্র হৃদয়ে বিশ্বনাথকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! ভয় কি? ধন্য কলিযুগ! পতিতপাবন নিতাই-গৌরাঙ্গের কৃপায় কাহারই অগতি হইবে না। তবে চৈতন্য হওয়া দরকার। প্রভু পতিতপাবন এবং নাম সর্ব্বশক্তিমান্ ও পাপবিনাশকারী এই ভরসায় জীব যদি পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করে, তবে সেই পাপীর উদ্ধার হওয়া কঠিন; নামবলে পাপাচরণকে শাস্ত্র নামাপরাধের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ। বাবা! আমি নামবলে বা প্রভু পতিতপাবন এই বলেও যদি পাপাচরণ করিতাম, তবু পথে থাকিতাম। আমি যে প্রভুর প্রভুত্ব লোপ করিয়া নিজেই প্রভু সাজিয়াছিলাম। নামধামের কথা কেহ বলিলে আমি তাহাকে যথেষ্ট অপমান করিয়াছি। সাধুসজ্জন বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দাই আমার নিত্যব্রত হইয়াছিল। প্রভু! কোথায় যাইব? আমার ত চৌরাশী নরকেও স্থান হইবে না। এবার আমি জানিলাম আমার বাঁচা হইতে মরাই ভাল।

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুনর্ব্বার বাবাজী মহাশয়ের চরণে পতিত হইয়া এমন ভাবে চীৎকার করিতে লাগিল যে, সে আর্ত্তনাদে রাস্তার উভয়পার্শ্বস্থ লোকসকল কাতরভাবে বিশ্বনাথের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! যাহার ব্যবহারে এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও যে লোকসকল উত্তেজিত হইতেছিল— যাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেও যাহারা কুণ্ঠিত ছিল, মহৎ-সঙ্গ প্রভাবে যেমন তাহার হৃদয়ের আবর্জ্জনা অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া গেল— অশ্রুজলে ধৌত হইয়া যেমন হৃদয়-ক্ষেত্র নির্ম্মল ভাব ধারণ করিল, অমনি সেই সমস্ত লোক তাহার জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল! সৎসঙ্গের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! উহার নিষ্কপট কাতরতায় বাবাজী মহাশয়ের করুণ হৃদয় দ্রব হইল; উহার মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ চরণ অর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "যাও বাবা! আর কোনও ভয় নাই, তোমার জন্মজন্মার্জিত যত কিছু পাপ, তাপ, অপরাধ, সকলই আমি গ্রহণ করিলাম। তুমি নির্ম্মলভাবে পরমদয়াল শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের শরণাগত হও। প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের নাম কর। আপামর সর্ব্বসাধারণের নিকট নিজ-কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাও।" বলিয়া কৃপার্দ্রহৃদয়ে উহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। তখন বিশ্বনাথ নাচিতে নাচিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "হায়রে! এমন দয়াল প্রভু ছাড়িয়া আর কাহাকে ভজিব? এমন পতিতপাবন প্রভু না হইলে আমা হেন পতিত-জীবের গতি কি হইত? ওহে ভাই বন্ধুগণ! তোমরাই বিচার করিয়া দেখ, জগাই-মাধাই উদ্ধার করিয়া নিতাইগৌর পতিতপাবন হইয়াও, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যেন আর পাপ না করে; কিন্তু আমার মহাপতিতপাবন প্রভু অকাতরে আমার ন্যায় মহাপতিতকেও কোলে তুলিয়া লইলেন! শাস্ত্রে শুনিয়াছিলাম—

"সবারে করিবেন উদ্ধার গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক-দুরাচার॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন ঃ—

"পাষণ্ডের উদ্ধার হইবে অবহেলে !
ভণ্ডের নিস্তার নাহিক কোনকালে ॥"

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য আজ আমা হইতে ব্যর্থ হইল।

"হায়রে মানবজন্ম বৃথা গোঙাইনু।
হেন প্রভু না ভজিয়া অকারণে মৈনু ॥"

ইত্যাদি পদ গান করিতে করিতে অশ্রু, কম্প, পুলকপরিব্যাপ্ত-কলেবরে একবায় নৃত্য, একবার রজে গড়াগড়ি করিতেছে। উপস্থিত লোকসকল বিশ্বনাথের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শত মুখে বাবাজী মহাশয়ের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

বাবাজী মহাশয় নাম করিতে করিতে বিশ্বনাথকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরাসবিহারী মঠে গিয়া বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন। বাবাজী মহাশয় কটকে শুভাগমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া ক্রমেই রাসবিহারী মঠে নানাজাতীয় ভক্তসমাগম হইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ও ভক্তগণসহ নানারূপ ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা এবং সংকীর্ত্তনানন্দে চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত করতঃ পুরী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

———

ললিতাদাসীর পুনর্জ্জন্ম

বাবাজী মহাশয় পুরী অবস্থানকালে ঝাঁজপিটামঠে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মূর্ত্তি সর্ব্বদাই ইঁহার সঙ্গে থাকেন। এক সময় আশ্রমবাসী প্রায় সকলেরই জ্বর হইয়া পড়িল। দয়ালদাস বাবাজী, কুঞ্জদাস বাবাজী প্রভৃতি তিন চারি-জন অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুস্থ আছেন। উঁহাদের দ্বারাই ভগবৎসেবা এবং রোগীদের শুশ্রূষা কোন প্রকারে চলিতেছে। বাবাজী মহাশয়ের শরীরও অসুস্থ, তবে সকলের অপেক্ষা ললিতাদাসীর অবস্থাই খুব শোচনীয়। ক্রমে আট দশ দিনের মধ্যে অনেকেই কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন ; কিন্তু ললিতা-দাসীর অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতে লাগিল। উত্থানশক্তিরহিত। কেহ উঠাইয়া বসাইলে অমনি দাঁতে দাঁত লাগিয়া ফিট্ হয়। উহাকে ঝাঁজপিটামঠের পশ্চাদ্বর্ত্তী দোতলা ঘরের নীচের তলায় রাখা হইল। এদিকে রোগের উৎপীড়ন, তাহার উপর আবার প্রায় সর্ব্বদাই উহার মনে হা হুতাশ ভাব ; কারণ উহার সেবাগত প্রাণ, একে ত সেবা হইতে বঞ্চিত, তাহাতে আবার বাবাজী মহাশয়ের শরীর তত সুস্থ নয়। ইত্যাদি নানা কারণে ললিতাদাসী সর্ব্বদার তরে দুঃখিত চিত্তে রোদন করিতে লাগিল। মধুদাদা সর্ব্বদার তরে উহার নিকটে থাকিয়া নাম শুনান এবং নানারূপ আশ্বাসবাক্যে উহার চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমেই উহার অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া একদিন কয়েকজন বাবাজী মহাশয়কে গিয়া বলিলেন, "দেখুন, ললিতাদিদির যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস এ যাত্রা কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। আপনি একটা যাহা হয় উপায় ব্যবস্থা করুন।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, যাহাদের সেবাগতপ্রাণ তাহারা সেই সেবা হইতে বঞ্চিত হইলে প্রাণে বড়ই আঘাত পায়। সুতরাং সে অবস্থায় তাহাদের বাঁচিয়া থাকা

অপেক্ষা মরিয়া যাওয়াই সুখকর। আমার মতে তোমরা সকলে উহাকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে উহার এই কষ্টের জীবন পরিত্যাগ হইয়া যায়।” কেহ বা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “সত্যই বটে, যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাতে জীবন যাওয়াই ভাল; কারণ সর্ব্বদাই উহার প্রাণে হা হুতাশ এবং চোখে জল। আর যাহাকে দেখিতেছে তাহাকেই অনুরোধ করিয়া বলিতেছে, ‘তোমরা সকলে বাবাজী মহাশয়ের যত্ন কর, তাঁহার শরীর যাহাতে সুস্থ হয় সেই চেষ্টা কর। একটু সকালে যাহাতে তাঁহার দুইটী পথ্যের যোগাড় হয় সেই ব্যবস্থা কর। আমি অভাগিনী সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আর কতদিন যে এ দেহভার বহন করিব জানি না। এমনি কঠিন প্রাণ যে সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া এখনও এ দেহ পরিত্যাগ করিতেছে না।’ ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে থাকে। সুতরাং এত কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা মৃত্যু সুখকর বৈ কি?” আবার কেহ বা সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতেছেন, “আপনি একটু কৃপা করুন, তবেই সকল ভাল হইয়া যাইবে। আহা মরি! অপূর্ণ আশা লইয়া গেলে চিরদিন কষ্টই থাকিবে।” ইত্যাদি যাহার যেরূপ ধারণা, তিনি সেইরূপ ভাবে বাবাজী মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

ক্রমে বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলেই সুস্থতা লাভ করিলেন। কিন্তু ললিতাদাসীর অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইতেছে। এক একবার যখন ফিট হইতেছে, তখন মনে হয় আর বুঝি চৈতন্যলাভ হইবে না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আবার চৈতন্যলাভ হইয়া থাকে। বাবাজী মহাশয় দূর হইতে এক একবার দর্শন দিয়া যান। একদিন প্রাতঃকালে ললিতাদাসী কেবল কাঁদিতেছে দেখিয়া মধুদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি! আজ অত কাঁদিতেছ কেন? শরীর কি খুব খারাপ বোধ হইতেছে?” ললিতাদাসী গদগদকণ্ঠে বলিল, “ভাই! কি বলিব? আমি এ দেহ ছাড়িতে এত চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমার এই ইচ্ছার প্রতিকূলে ছাড়া অনুকূলে কাহাকেও

পাই না। মনে করিয়াছিলাম, নবদ্বীপ দাদা বোধ হয় কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবেন; তাহাও হইল না, এখন কি উপায় করি? আর এই সামান্য একটা কাঠের পুতুলের জন্য তোমরাই বা কত কষ্টভোগ করিবে?

মধু। কেন দিদি! আমাদের তো কোন কষ্ট হয় নাই; তুমি সুস্থ হইয়া উঠ, তবেই আমাদের পরম সুখ ও শান্তি। কি হইল দিদি! নবদ্বীপ দাদা কি বলিল?

ললিতা। গত রাত্রে মনে বড়ই দুঃখ হইল যে দাদাও একবার আমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে না! আমি কি এতই অপরাধী হইলাম? স্বপ্নেও একবার দর্শন পাই না। ভাবিতে ভাবিতে একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে, দেখি নবদ্বীপ দাদা আমার বুকের উপর হাত দিয়া বসিয়া আছেন আর মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, 'কি রে তোর কি হইল?' আমি তখন ঠিক প্রত্যক্ষের ন্যায় আবদার করিয়া বলিলাম, 'দাদা! তুমি চলিয়া গেলে, এইবার আমাকে নিয়ে চল। আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।' দাদা হাসিমুখে বলিলেন, 'আর কিছুদিন থাকিয়া দাদার সেবা কর; পরে দেখা যাইবে। তোকে নিয়া গেলে দাদার কষ্ট হইবে যে?' আমি তখন বলিলাম, "হ্যাঁ আমি ত তোমার দাদার অনেক সেবা করিতেছি; আমি এখন নিজেই সেবা গ্রহণ করিতেছি। আমা দ্বারা তাঁহার সুখ হওয়া ত দূরের কথা—বরং দুঃখই হইতেছে। তুমি আমায় কৃপা কর; আর এরূপ সকলের গলগ্রহ হইয়া থাকার দরকার নাই। আমায় তোমার কাছে নিয়ে যাও" ইত্যাদি অনেক রকম কথা হইল; কিন্তু কিছুতেই দাদার মত হইল না। অবশেষে একটুকু মাত্র বলিলেন যে, "তোর যাহা ইচ্ছা তুই কর্, পরে দেখা যাইবে।" আমি তাই তোমাদের সকলের নিকট বিদায় প্রার্থনা করি, তোমরা সকলে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মজন্মান্তরে যোগ্য দেহে তোমাদের প্রভুর সেবা পাই। আজ আমার শেষ দিন। আর কিছুই

প্রার্থনা নাই, ভাই! তোমরা শেষ সময়ে একবার নাম শুনাইও। যদি কৃপাময় প্রভু শেষ সময়ে এই অস্পৃশ্য চণ্ডালিনীকে একবার একটু দর্শন দিতেন, তবে মনের বাসনা পূর্ণ হইত। তাঁহার ইচ্ছা এবং কৃপা।

এই বলিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। মধুদাদাও সাশ্রুগদগদ-কণ্ঠে উহার মাথার নিকট বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন। ললিতাদাসীর শরীর ক্রমেই যেন অবশ হইতে লাগিল। এদিকে বাবাজী মহাশয় জগন্নাথ দর্শন করিয়া গলি রাস্তায় একেবারে যে ঘরে ললিতাদাসী শয়ন করিয়া আছে, ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র মধুদাদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ললিতাদাসীর উঠিবার বা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিবার সাধ্য নাই; মনে মনে কি বলিল সেই জানে, কেবল দুইটী চক্ষু হইতে অবিরতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় কিঞ্চিৎ কাল দাঁড়াইয়া "আচ্ছা নিতাইচাঁদের ইচ্ছা" এই কথাটী বলিয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অপরের অলক্ষিত ভাবে উহার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়া ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। ললিতাদাসী মনে মনে যে ভাবে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহার বিশ্বাস, বাবাজী মহাশয় সেই ভাবে বিদায় প্রদান করিয়া গেলেন। অতিশয় আনন্দের সহিত মধুদাদাকে অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "ভাই! আমি মনে মনে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, প্রভু! শেষ সময় একবার শ্রীচরণ দর্শন দানে দাসীর অভিলাষ পূর্ণ করিলে আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। দয়াময় কি না দর্শন এবং স্পর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন। আশার অতীত ধনদান করা হইতে আর দয়ার পরিচয় কি হইতে পারে?" এই কথা বলিতেছে আর দুইটী চোখের জলে উহার মুখ বুক ভাসিয়া যাইতেছে।

ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় বলরামবাবু, নগেনবাবু ও কুঞ্জদাস বাবাজী প্রভৃতি চারি পাঁচ জনকে বলিলেন, "দেখ ললিতার ত অন্তিম সময় উপস্থিত; অতএব তোমরা উহাকে ধরাধরি করিয়া ঠাকুরবাড়ী লইয়া

আইস।" শুনিয়া সকলেই শশব্যস্তে ললিতাদাসীর নিকটে গিয়া দেখেন প্রায় শেষ অবস্থা। তখন অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সকলে উহাকে উঠাইয়া যেমন দশ পনের হাত গমন করিলেন, অমনি উহার দুইটী চক্ষু নিস্পন্দ এবং স্থির হইল। শ্বাসহীন দেহ যেন একেবারে অসাড় হইয়া গেল। তখন সকলে ব্যাকুলপ্রাণে দ্রুতপদে ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় উহার অবস্থা দেখিয়া কি বুঝিলেন তিনিই জানেন। গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুরের সম্মুখে শয়ন করাইয়া দাও।" সকলে তাহাই করিল। সকলেরই ধারণা— ললিতাদাসীর প্রাণ বহির্গত হইয়া গিয়াছে। পাড়া প্রতিবেশী বহুলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ললিতাদাসীর অবস্থা দর্শনে দুঃখিতচিত্তে কেহ বা রোদন, কেহ কেহ বা নানারূপ আক্ষেপবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আশ্রমের সেবাপূজা বন্ধ করিয়া আশ্রমবাসী সকলেই বিশেষ দুঃখিত। সকলেই হা হুতাশ করিতেছেন।

কয়েক দিন হইল বাবাজী মহাশয়ের বড় গুরুভাই শ্রীযুক্ত মাধবদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম পুরী আগমন করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় উঁহাকে এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন, "দেখুন, আপনারা সকলেই উহার জ্ঞাতাজ্ঞাত অপরাধ সকল ক্ষমা করিয়া উহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ও যোগ্য দেহ লাভ করিয়া অভীষ্ট সেবা প্রাপ্ত হউক। সকলেই উহার মাথায় চরণ দিন।" এই সময় হঠাৎ দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ তিনমূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহাদিগকে দেখিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক ললিতাদাসীকে চরণ দিতে অনুরোধ করায় উঁহারা প্রথম একটু আপত্তি করিলেন, পরে বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীর দুই একটী গুণের কথা বলিয়া উহার পরকালের সম্বলের জন্য বৈষ্ণব-চরণধূলি ও চরণামৃত দিবার কথা বলায়, মহাত্মা তিনজন প্রসন্নভাবে ললিতার মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া

আছেন, এদিকে মাধবদাস বাবাজী মহাশয়, বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "সকলেই চরণধূলি দিল, কৈ তুমি ত দিলে না ? আমার বিশ্বাস তোমার চরণ স্পর্শ পাইলেই ও নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে!" বলিয়া ইঁহাকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন। ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যাহা হউক উহার বিশ্বাস হউক আর নাই হউক, তোমাদের ত বিশ্বাস হইয়াছে।" মাধবদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "ও ত এখন মরামানুষ, এখন আমাদের বিশ্বাসেই কার্য্য হইবে, তুমি চল।" বলিয়া উভয়ে ললিতাদাসীর নিকট গেলেন। বাবাজী মহাশয় একবার ললিতাদাসীর মুখপানে তাকাইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "এই শুষ্ক কাঠখানাকে বাঁচাইয়া নিতাইয়ের যে কি কার্য্যসাধন হইবে তিনিই জানেন।" এই বলিয়া **"জয় নিতাই জয় নিতাই"** বলিতে বলিতে নিজ দক্ষিণ চরণখানি উহার মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত স্পর্শ করাইলেন। কি আশ্চর্য্য! মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের ন্যায় চরণস্পর্শ পাইবামাত্র ললিতা-দাসীর মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হইল। চক্ষু মেলিয়া যেমন সম্মুখে বাবাজী মহাশয়ের দর্শন পাইল, অমনি গায়ের কাপড় সামলাইয়া মাথায় ঘোমটা দিয়া উঠিয়া বসিল। তখন বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। বৃন্দাবনবাসী মহাত্মাদিগের শ্রীচরণ দর্শন পাইলে, বেশ ভক্তি-পূর্ব্বক ইঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম কর; ইঁহাদের কৃপায়ই এ যাত্রা পুনর্জ্জীবনলাভ করিলে। যেন আজীবন মনে থাকে যে, বৈষ্ণবদের কৃপায় এ জীবন লাভ করিলে। যতদিন বৈষ্ণবে প্রীতি রাখিতে পারিবে, ততদিন কোনই ভয় নাই। এমন কি ঘোর বিপদে পড়িলেও করুণাময় বৈষ্ণব গোসাঞি উদ্ধার করিবেন।" শুনিয়া ললিতাদাসী কাঁদিতে কাঁদিতে আগন্তক বৈষ্ণব তিন মূর্ত্তির চরণে এবং অন্যান্য সমস্ত বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। আগন্তক বৈষ্ণব তিন মূর্ত্তি বিস্মিতভাবে একবার বাবাজী মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, আর একবার ললিতাদাসীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে উঁহারা যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে বলিলেন, "দেখ, ঠাকুরের নিকট তোমার অপরাধ হইয়াছে। তাঁহারা কৃপাময়, কৃপা করিয়া যখন এ যাত্রা রক্ষা করিলেন, অতএব তাঁহাদের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর ভবিষ্যতে যাহাতে ওরূপ কার্য্য করা না হয়, সেইজন্য শক্তি প্রার্থনা কর।"

ললিতা। আজ্ঞে আমি জ্ঞাতস্বরূপে এমন কি অপরাধ করিয়াছি, আমার স্মরণ হইতেছে না আপনি বলিয়া দিন।

বাবাজী। আমি আর কি বলিব? প্রধান অপরাধ যে ঠাকুরের নিয়মিত ভোগ ছাড়া আমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া যে সমস্ত ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তুমি ঐ সমস্ত ঠাকুরকে না দিয়া অপ্রসাদী আমাদিগকে দিয়া থাক।

ললিতা। তাহা হইলে সেটা ত ঠাকুরের নিকট অপরাধ হইল না। সেটা আপনার নিকট হইল।

বাবাজী। তা নয়, ঠাকুরের নিকটই অপরাধ হইল; কারণ এ সংসারটী ঠাকুরের। ঠাকুরকে উপলক্ষ করিয়া যে কিছু দ্রব্য আসে, সে সব তাঁহাকে অর্পণ না করিলে চুরি করা হয়। সুতরাং চুরিজনিত যে অপরাধ তাহা কে খণ্ডন করিবে?

ললিতা। আচ্ছা! যাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া যে দ্রব্য আসে, তাঁহাকে সেই দ্রব্য দিলে ত আর চুরিজনিত অপরাধ অথবা দোষের কারণ নাই?

বাবাজী। আছে বই কি! ভগবৎ-সংসারবাসী যে কোনও ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আসিলেই তাহা ভগবানের আনীত এবং অধিকৃত বলিয়া জানিতে হইবে।

ললিতা। আমার মনে কয়েকটী সন্দেহের উদয় হইয়াছে। আচ্ছা, গীতা কিংবা অন্যান্য শাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব যাহা দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে গুরু কৃষ্ণ একবস্তু। এমন কি গুরুগীতায় বলিয়াছেন—"ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ ইত্যাদি।" গুরুসেবাই যদি সর্ব্বোপরি হইল,

তবে গুরুকে অপ্রসাদী দিতে আপত্তি কি ? সর্ব্বাগ্রে যখন গুরুর পূজা ও প্রণাম-বন্দনাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন আমার মতে অপ্রসাদী দেওয়াই ত উচিত ; বরং প্রসাদী দিলেই অপরাধ হয়।

বাবাজী। এই কথাটী একটী বড় কথা। উপাসনার মধ্যে যত কিছু গোলমাল, যত কিছু মতদ্বৈধ, যত ভিন্ন ভিন্ন মতে— ভিন্ন ভিন্ন পথে, ধর্ম্ম-জগতে সম্প্রদায়-বিভেদ হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার মূলে একমাত্র গুরুতত্ত্ব। ঠিকভাবে গুরুতত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আর কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। তত্ত্ব এবং লীলা দুইটী বস্তু। তত্ত্বতঃ গুরু কৃষ্ণ এক হইলেও লীলাগত পার্থক্য আছে। যেমন— আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। নিজে স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া স্ত্রীর একটী নাম জায়া। এই তত্ত্বগত পিতাপুত্র এক বস্তু হইলেও লীলাগত পার্থক্য না রাখিলে ঘোর অপরাধ হয়। "যশোদানন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই" ইত্যাদি শত সহস্র প্রমাণে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ এবং গৌর এক বস্তু, কিন্তু লীলাগত বা স্বরূপগত পার্থক্য না থাকিলে পৃথক পূজা বা পৃথক্ ধ্যানাদির অপলাপ হইয়া পড়ে। এই তত্ত্ব এবং লীলাকে এক করিয়াই এক শ্রেণীর লোক মহাপ্রভুর পৃথক্ মন্ত্রাদি স্বীকার করেন না। এইরূপ দ্বারকানাথ, মথুরানাথ এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন তত্ত্বতঃ এক বস্তু ; কিন্তু লীলাগত বহু পার্থক্য। অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেও এইরূপ তত্ত্বতঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন ; কারণ জীব অণু, ব্রহ্ম পূর্ণ ; জীব অংশ তিনি অংশী। যদ্যপি তুমি লীলাগত পার্থক্য নাই মানিতে চাও, তবে ত কৃষ্ণসেবা করিলেই গুরুসেবা করা হইল। কৃষ্ণকে ভোগ দিলেই গুরুর ভোগ হইল। আবার পৃথক্‌ভাবে গুরুসেবার প্রয়োজন কি ? শাস্ত্র তত্ত্বগত যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সমস্ত বাক্য লীলাগত ধরার দরুণই এই সমস্ত মত-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। এ ত গেল শাস্ত্রের কথা, যুক্তির দিকে দেখিতে গেলেও ত দেখ, সেবা অর্থাৎ

সুখী করা ; গুরুদেব যাহাতে সুখী হন, সেইরূপ আচরণ করাই শিষ্যের সর্ব্বতোভাবে উচিত নয় কি ? আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া। গুরুদেব যেটী আদেশ করিবেন, শিষ্যের সেইটীই পালনীয়; গুরু-আজ্ঞায় সদসৎ বিচার চলে না। তুমি হয় ত তোমার নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য বা শাস্ত্র-বাক্যের এক-দেশ গ্রহণ করিয়া, কিংবা নিজ সুখের জন্য গুরুদেবকে অপ্রসাদী বস্তু খাইতে দিলে, তিনিও হয় ত শাস্ত্রযুক্তিতে তোমার নিকট পরাস্ত হইয়া অগত্যা সেই বস্তু গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তাঁহার সুখ হইল না। এইরূপ সেবায় লাভ কি বল দেখি ?

ললিতা। তাহা হইলে ত আর গুরুসেবা করাই হয় না; কারণ গুরুদেব ত কখনই নিজের সেবা করিতে বলিবেন না !

বাবাজী। আচার্য্যগণ এই জন্যই শিক্ষাগুরু করিবার বিধান করিয়াছেন। দীক্ষাগুরু শিষ্যকে যে সমস্ত মন্ত্রাদি প্রদান করিবেন, শিক্ষাগুরু সে সকল বিস্তারিতরূপে বুঝাইয়া দিবেন এবং গুরুতত্ত্ব ও গুরুসেবা উপদেশ দিবেন। যাহারা প্রকৃত অনুভবী সাধক, কেহ না বলিলেও তাহাদের নিজ নিজ প্রাণ হইতে উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব তোমার অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

ললিতা। আচ্ছা, স্বাভাবিক একটা চলিত কথা আছে "গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে" এ কথাটার মর্ম্ম কি ?

বাবাজী। গুরু ছেড়ে অর্থাৎ গুরুকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে জন স্বতন্ত্র-ভাবে কৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকে, তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিত হয়ই না; বরং অধোগতি হইয়া থাকে। গুরু-আনুগত্য না হইলে কোনও কার্য্য সফল হইতে পারে না।

ললিতাদাসী তখন কৃতাঞ্জলিপুটে গললগ্নীকৃতবাসে গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "প্রভু ! আমি জানি না যে, কাহার নিকট কোন্ ভাবে কি অপরাধ হইয়াছে। যাহাই হউক, সকলের নিকট আমার প্রার্থনা— আমা দ্বারা

যেন কাহারও কোন অপ্রীতিকর কার্য্য না হয়। সকলে আমাকে এই ভিক্ষা দিন। অজ্ঞাতসারে যদি কখনও কিছু অপরাধ হইয়া থাকে ত তাহাও ক্ষমা করুন।" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের সম্মুখে প্রণাম করিল। বাবাজী মহাশয় একজনকে বলিলেন, "ঠাকুরের চরণামৃত এবং বৈষ্ণবের চরণামৃত উহাকে খাওয়াইয়া দাও।" সে ব্যক্তি তাহাই করিল। নগেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে, দিদির কি পথ্য হইবে ?

বাবাজী। প্রসাদ চরণামৃত ছাড়া আবার কি পথ্য হইবে ?

ললিতাদাসীর অসুস্থ অবস্থায় নগেনবাবু নিজ বাটী হইতেই ইহার পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, আজও তিনি সেই ভাবেই বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে, এই মঠের ভোগ হইতে ত অত্যন্ত বেলা হইবে, আমি যেরূপ করিয়া আনিতাম, সেইরূপ করিয়া আনিলে ভাল হয় না কি ?"

বাবাজী। সেরূপ করিলেই স্বতন্ত্রতা হইবে। নিজ ইষ্টদেব খাইবেন বেলায়, আর নিজে সকালে দুইটী খাইয়া সুস্থ হওয়া কি ধর্ম্ম বা যুক্তি-সঙ্গত কার্য্য ? অতএব তোমরা কোনই ভাবনা করিও না ; যদি প্রভুর রাখিবার ইচ্ছা হয় উহাতেই সুস্থ হইবে।

নগেন। আজ্ঞে, স্বাভাবিক অবস্থায় ত কেহ কিছু বলে না ; তবে অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়াই ভয় হয়।

বাবাজী। ভয় কি, প্রভুর অধরামৃত চরণামৃত পাইতে পাইতেই শক্তি লাভ হইবে।

নগেন। আজ্ঞে, তবে আর কি বলিব ? অগত্যা সকালে কিছু জল খাবার ব্যবস্থা করিলে কোনও দোষ নাই ত ?

বাবাজী। আচ্ছা, তোমাদের বিশেষ ইচ্ছা হয় ত দুই একদিন করিতে পার ; কিন্তু ঠাকুরের ভোগ হওয়া চাই।

নগেনবাবু তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া তাহার পরদিবস নানারূপ ফল

সংগ্রহ পূর্ব্বক মঙ্গল আরতির সময় ভোগ দিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথম দিবস কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ললিতাদাসীকে দিতে বলিলেন। দ্বিতীয় দিন যেমন বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে লইয়া গেলেন, অমনি ইনি থালাখানায় একটু জিহ্বা স্পর্শ করিয়া দিলেন। তৃতীয় দিবস একেবারেই নিষেধ করিলেন। সুতরাং ললিতা-দাসীরও খাওয়া হইল না। ললিতাদাসী কাতরকণ্ঠে নগেনবাবুকে বলিলেন, "দেখ ভাই! এইভাবে খাওয়াটা বাবাজী মহাশয়ের অভিমত নহে; অতএব তোমরা আর এরূপ বৃথা চেষ্টা করিও না। যদি রাখিবার মন হয় তবে অমনিই সুস্থ করিবেন। আমি একমাত্র প্রসাদ চরণামৃত ছাড়া আর কিছুই খাইব না।" এদিকে বাবাজী মহাশয় একজনদ্বারা ললিতাদাসীকে ডাকাইলেন। ললিতাদাসী অতি ধীরে ধীরে আসিয়া প্রণাম করিবামাত্র আদেশ করিলেন—"দেখ, তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ঠাকুরের তরকারী অমনিয়া কর গিয়া।" ললিতাদাসীও আদেশ অনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! কুঞ্জদাদা ঠাকুরের রান্না করিতেন। তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ হওয়ায়, বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকে রান্না করিতে আদেশ করিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক্। যে লোক অতি ধীরে ধীরে কষ্টের সহিত চলাচল করে, সে আজ পঞ্চাশ ষাট্ জনের উপযোগী রান্না করিতে আদিষ্টা! কেহ বা মনের কথা গোপন করিতে না পারিয়া বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "আজ্ঞে! ও যে মরা-মানুষ! ও কিরূপে রান্না করিবে?

বাবাজী। দেখ, শক্তি গাছের ফল নয় যে কেহ আনিয়া দিবে বা বৃষ্টির জল নয় যে আকাশ হইতে পতিত হইবে। সেবা না করিলে শক্তি পাইবে কোথায়? সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যাঁহার সেবা তিনি ক্রমে শক্তিসঞ্চার করিবেন।

বাস্তবিক তাহাই হইল। ললিতাদাসী অক্লান্তভাবে রান্না করিল।

বাবাজী মহাশয়ের মনে কি খেয়াল উদয় হইল— পরদিবস রাত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দিয়া বৈষ্ণসেবার যোগাড় করিলেন। এক মণ দুগ্ধের সুজির পায়স এবং অন্যান্য অনেকরূপ বস্তু প্রস্তুত করিবার ভার একমাত্র ললিতাদাসীর উপরে দিলেন। ইঁহার ইচ্ছায় সমস্ত নির্ব্বাহ হইয়া গেল। বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশয় ললিতাদাসীকেই পরিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ললিতাদাসীও বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা শিরে ধারণপূর্ব্বক ইঁহার চরণে প্রণাম করিয়া পরিবেশন করিতে প্রবৃত্তা হইল। সকলে দেখিয়া অবাক্! ঠিক যেন একটী কাঠের পুতুল সূতা দ্বারা কেহ নাচাইতে লাগিল। প্রায় আড়াই-শত মূর্ত্তি বৈষ্ণব ও দুঃখী কাঙ্গালি মহাপ্রসাদ সেবা করিলেন। ললিতাদাসী অক্লান্তভাবে সকলকে পরিবেশন করিল। সকলেই এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে বাবাজী মহাশয়ের কৃপাশক্তির জয় দিতে লাগিলেন।

———

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব

দেখিতে দেখিতে মাঘ মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব হইবে। এবার যেন বাবাজী মহাশয়ের ভাব-গতিক ভিন্ন রকম দেখা যাইতেছে। সর্ব্বদাই আনমনা এবং প্রতি কথাতেই যেন উদাসীন। একদিন অল্পবয়স্ক একটী প্রদেশী গোয়ালা এক কলসী ঘৃত লইয়া বিক্রী করিবার মানসে ঝাঁজপিটা মঠে উপস্থিত হইল। হঠাৎ যেমন ইঁহার সহিত দেখা হইয়াছে, অমনি অতি আগ্রহ সহকারে উহার ঘৃত ওজন করাইলেন। ওজনে একুশ সের হইল। যথানির্দ্দিষ্ট দাম সাড়ে একত্রিশ টাকা; ললিতাদাসী বত্রিশটী

টাকা ঘি ওয়ালাকে দিয়া আট আনা পয়সা উহাকে চাহিবামাত্র বাবাজী মহাশয় অতিশয় ক্রোধভরে বলিলেন, "তোমার টাকা দেওয়ার কথা তুমি দিলে; উহার নিকট ফেরৎ নিবার কথা ত আর তোমাকে কেহ বলে নাই?"

ললিতা। আজ্ঞে! উহার হিসাবমতে যে সাড়ে একত্রিশ টাকা হয়।

বাবাজী। কি জ্বালা! নিত্যানন্দ-উৎসবের উদ্দেশ্যে ও ঘি দিয়াছে, উহার হিসাব নিতাই করিবেন; তোমার হাতে তাঁহার টাকা ছিল তুমি দিলে, তোমার জমা খরচে দরকার কি? উহার নিকট হইতে আর ফেরৎ লইবার আবশ্যক নাই।

ঘি ওয়ালা ছেলেটী শশব্যস্তে আট আনা পয়সা বাহির করিয়া ফেরৎ লইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল; কিন্তু বাবাজী মহাশয় আর কিছুতেই ফেরৎ লইলেন না। অবশেষে উহার কলসীটী রাখিবার মানসে উহাকে বলিলেন, "বাবা! তোর এই কলসীটীর কত দাম হইবে?" সে বলিল, "আজ্ঞে, আমাদের এই কলসীগুলি আমরা কখনই বিক্রী করি না, বহুদিন ব্যবহার করিয়া উহা পাকা হইয়া গিয়াছে।"

বাবাজী। পাকা হইয়াছে বলিয়াই আমি বলিতেছি। যাহা উপযুক্ত দাম হইবে, তাহা নিয়া কলসীটী ঠাকুরের সংসারে দিতে হইবে।

ছেলেটী না দিবার মানসেই বলিল, "আজ্ঞে, তিন চারি টাকা দিয়া একটী মাটির কলসী রাখিবার প্রয়োজন কি! ইহা হইতে আট দশ পয়সা দিয়া টীন নিলে ত ভাল হইবে।" বাবাজী মহাশয় অমনি চারিটী টাকা দিয়া ঘৃতের কলসটী রাখিবার জন্য ললিতাদাসীকে আদেশ করিলেন। ললিতাদাসী প্রথম একটু বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়ের মুখপানে তাকাইয়া রহিল। পরে যখন বাবাজী মহাশয় একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, তখন সে চারিটী টাকা আনিয়া ঘি ওয়ালাকে দিল। ঘি ওয়ালা কিন্তু ইঁহার ব্যবহারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "আজ্ঞে, যদি আপনার এতই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনি কলসীটী রাখুন, আমি

কিছুই চাই না।" বাবাজী মহাশয় তাহাকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'বাবা! তোমার নিতাইচাঁদ অতি প্রত্যূষে আমার নিকট টাকা রাখিয়াছেন, আমি যদি তোমাকে না দেই তবে আমি যে দোষী হইব! অতএব তোমার ভয় নাই, তুমি টাকা লইয়া যাও।" ইত্যাদি নানারূপ বাক্য শুনিয়া ঘি ওয়ালা আর কিছু বলিতে পারিল না। অগত্যা দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ইঁহার আদেশক্রমে চলিয়া গেল।

এদিকে বাবাজী মহাশয়, অনুমান পাঁচ পোয়া ঘি ধরে এমন একটী ঘটীতে এক ঘটী ঘি ভরিয়া সমুদ্রে ঢালিয়া দিবার জন্য একজনকে পাঠাইলেন। এবং নিজে ঐ ঘি পরিপূর্ণ কলসীটী লইয়া প্রায় আধ সের পরিমাণে ইন্দারায় এবং প্রতি গৃহদ্বারে এক এক পোয়া, সদর দরজায় আধ সের, এইরূপে ঘি ঢালিয়া অবশেষ ভাণ্ডারে রাখিতে বলিলেন। উৎসবের পূর্ব্বদিন অধিবাস হইল। পরদিবস নানাবিধ দ্রব্যের আয়োজন হইতে লাগিল। যথাসময়ে অভিষেক করিবার পর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বাবাজী মহাশয় আবেশের ভরে দধি-হরিদ্রা এবং সংকীর্ত্তনের ঘৃতমিশ্রিত জল লইয়া সকলের গায়ে দিতে লাগিলেন! অবশেষে মধ্যস্থলে ঢালিয়া দিবামাত্র সকলে তাহার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আগন্তুক প্রতিবেশিগণ ইন্দারা হইতে জল আনিয়া ঐ স্থানে ঢালিতে লাগিল। ক্রমে অঙ্গনের মৃত্তিকা কর্দ্দমাকার ধারণ করিল। কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। কেহ উন্মত্তভাবে সেই কাদায় গড়াগড়ি দিতেছেন, কেহ বা কাহাকে ধরিয়া ফেলিতেছেন। আনন্দের অবধি নাই! বেলা প্রায় চারিটা বাজিল, তবুও সংকীর্ত্তন ও নৃত্যের বিরাম হইতেছে না দেখিয়া ললিতাদাসী নানারূপ সঙ্কেতে বাবাজী মহাশয়কে দিন অবসান এবং সকলের শ্রম জানাইলে, ইনি অনিচ্ছাসত্ত্বে সংকীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন।

লীলাময়ের লীলার বালাই যাই, যখন যে লীলা করিতেছেন, তাহাই যেন আনন্দময়। তাহাতে ত আজ শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব।

নিতাইগতপ্রাণ ভক্তগণের পূর্ণানন্দের দিন। মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াই নানারূপ আনন্দ করিতে লাগিলেন। কেহ বা কাহারও মুখ হইতে কাড়িয়া খাইতেছেন, কেহ বা পরিবেশন করিতে করিতে কাহারও মাথায় পায়স ঢালিয়া দিতেছেন, আবার কেহ বা শশব্যস্তে গিয়া চাটিয়া খাইতেছেন। সকলেই যেন উন্মত্ত— লঘুগুরু ভেদ নাই। সঙ্কোচতা বা মর্য্যাদা যেন আনন্দের স্রোতে কোন সুদূর দেশে ভাসিয়া গিয়াছে। আনন্দময়ের কৃপায় যাহারা প্রসাদ পাইতেছেন, তাহাদেরও আনন্দ, আবার যাঁহারা দেখিতেছেন বা পরিবেশন করিতেছেন, তাঁহাদেরও আনন্দ। প্রায় সন্ধ্যার সময় প্রথম পঙ্গত শেষ হইল। আগন্তুক দুঃখী কাঙ্গালী এবং প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীগণ প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত হইয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের আদেশে সকলকে একেবারে বসাইয়া দেওয়া হইল। সকলেই পরিতোষ ভাবে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিতাইচাঁদের জয় দিতে দিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহাভাবাবেশ বা দিব্যোন্মাদ

এইরূপ পরমানন্দে কয়েকদিন যায়,— একদিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় বাবাজী মহাশয় বসিয়া আছেন, চারি পাঁচজন সঙ্গী এবং পাঁচ সাতজন বাহিরের ভক্ত নিকটে রহিয়াছেন। নানারূপ কৃষ্ণকথা আলাপ হইতেছে। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় চমকিত হইয়া অতিশয় ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, "উঃ কি ভীষণ কাল উপস্থিত! কি ভয়ানক গ্রহগণের উৎপীড়ন! কি অত্যাচার! হা নিতাইচাঁদ! কতদিনে আবার এই দুর্দ্দশা দূর হইয়া পূর্ব্ববৎ শান্তিময় অবস্থা আসিবে? কি রূপেই বা দুর্ব্বার

গ্রহগণের উৎপীড়ন শান্তি হইবে? কতদিনেই বা ইঁহাদের প্রতিকূল অবস্থা ঘুচিয়া গিয়া অনুকূল বুদ্ধি আসিবে?" বলিতে বলিতে ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তগণ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। বাবাজী মহাশয় যেরূপ ব্যাকুল, তাহাতে কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইতেছেন না। কিছুক্ষণ পর একজন ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে, আপনার হঠাৎ এইরূপ ব্যাকুলতার কারণ ত আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি শুনিবার অধিকারী হই, তবে কৃপা করিয়া একটু বলিলে মনের কৌতূহল নিবৃত্তি হইত।"

বাবাজী। বাবা! কি আর বলিব? পুরীধামের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইবে। নবগ্রহ এককালে কুপিত হইয়াছে। অত্যাচারের সীমা থাকিবে না। জগন্নাথদেবের সেবার ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা জন্মাইবে। ধামে ঘরে ঘরে বিবাদ, আত্মবিচ্ছেদ, অশান্তির সীমা থাকিবে না। আমি আর কি বলিব? যতদূর দুরবস্থা হইবার নয় তাহা হইবে।

এইরূপ কত কথা বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ জগন্নাথের সেবার এবং ধামের দুরবস্থার কথা শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে বলিলেন, "আজ্ঞে! কতদিন পরে এইরূপ দুরবস্থা হইবে? একে ত সেবার ভয়ানক বিশৃঙ্খলা, তাহাতে আবার যদি এইরূপ সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার উপস্থিত হয়, তবে ত আর প্রাণ রক্ষা করা কঠিন দেখিতেছি। বাবাজী মহাশয় সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "আর বাকী নাই বাবা! আরম্ভ হইয়াছে। দুই চারি দিন মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

ভক্ত। এইরূপ কুপিত গ্রহ কতদিন থাকিবে?

বাবাজী। থাকিবার নির্দ্দিষ্ট সময় ত আর নাই। যদি কেহ সেইরূপ একমনে নবগ্রহের অর্চ্চনাদি যথানিয়মে সম্পাদন করিতে পারে, তবে হয় ত অল্প দিনেই নিবৃত্তি হইতে পারে; নতুবা কতদিন যে ভোগ হইবে ঠিক কি?

ইত্যাদি নানা কথোপকথনের পর আগন্তুক ভক্তগণ বিমনাভাবে স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গিগণও স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী হইলেন। বাবাজী মহাশয় জগন্নাথ দর্শন-মানসে মন্দিরে গমন করিলেন।

তিন চারি দিন যায়, একদিন প্রাতঃকালে বাবাজী মহাশয় সগণে সংকীর্ত্তন লইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক দেখেন যে, জগন্নাথ-দেবের সেবকবৃন্দ একত্রিত হইয়া নানারূপ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং কি উপায় করা যাইবে পরামর্শ করিতেছেন। জগন্নাথের সেবাকার্য্য বন্ধ আছে। বাবাজী মহাশয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শ্রীযুক্ত মাধব পশুপালককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "কি আর বলিব? মঙ্গল আরতি করিবার জন্য ভিতরমন্দির খুলিবামাত্র দেখি যে, রত্নবেদীর সম্মুখে একটী পুঁটুলি পড়িয়া আছে। মশাল লইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও কিসের পুঁটুলি বুঝিতে না পারায় অবশেষে খুলিয়া দেখি যে এক পুঁটুলি চিংড়ি মাছ। অতি অসম্ভব কথা। রাত্রে প্রতি তালার উপর মোহর করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কিরূপে যে এই বীভৎস কাণ্ড হইল, আমরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মহারাজের নিকট সংবাদ দিলাম; কিন্তু তিনিও কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না। এইরূপ ব্যাপারে মহা মহা স্নান হইবার বিধান। কিন্তু কে যে কি করে, কখন যে এই সমস্ত সম্পন্ন হইবে জগন্নাথ জানেন।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় সাশ্রুগদগদকণ্ঠে কাতরভাবে জগন্নাথ-দেবের নিকট নানারূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ বাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া পরস্পর নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সংকীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া সকলে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাবাজী মহাশয় যেন কেমন একরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মুখে হাসি নাই। প্রায় সময়েই হতাশপ্রাণে উদাসভাব প্রকাশ করেন। কয়েক দিন যায় একদিন বলরামবাবু আসিয়া ব্যাকুলভাবে বাবাজী মহাশয়কে

বলিল, "আজ্ঞে! সর্ব্বনাশ হইল! আপনি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য; গতকল্য জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে যে কূয়ার জলে স্নান পূর্ণিমার দিন জগন্নাথদেব স্নান করেন, সেই সোণা কূয়ায় অনুমান দুই বৎসর বয়স্ক একটী গো-বৎস পড়িয়া মারা গিয়াছে! অতি কষ্টে তাহাকে তোলা হইয়াছে। কি ভয়ানক দুর্দ্দৈব! মন্দিরের মধ্যে গো বধ!" শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ঠিক বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন— "হা প্রভো! কতদিনে এ দুঃখের শান্তি হইবে? কতদিনে তোমার সেবার সুবন্দোবস্ত দেখিয়া এ তাপিত প্রাণ জুড়াইব? দয়াময়! একবার জীবের দশা চেয়ে দেখুন। আপনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, আপনি দুষ্ট-গ্রহগণকে এত প্রশ্রয় দিলে আমাদের ত আর প্রাণ বাঁচে না প্রভু!" এইরূপে কতক্ষণ ব্যাকুলতার পর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলরাম! তার পর কি হইল? জগন্নাথের ভোগরাগ কতক্ষণে হইল?"

বলরাম। আজ্ঞে! সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! বেলা প্রায় ১২টার সময় প্রথম অবকাশ (স্নান) হইল মধ্যাহ্ন ধূপ (ভোগ) হইতে রাত্র শেষ হইয়া গেল। আর সন্ধ্যাধূপ বা বড় সিঙ্গার হয় নাই। জগন্নাথের শয়ন ত বহুদিন হইতেই প্রায় বন্ধ।

বাবাজী। এত বড় বিভ্রাট হইল, ইহাতে রাজা কি ব্যবস্থা করিলেন?

বলরাম। আজ্ঞে! রাজাই যদি সেবার প্রতি লক্ষ্য করিতেন, তবে কি আর এইরূপ দুরবস্থা হয়! এ সব বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই।

এই সমস্ত শুনিয়া বাবাজী মহাশয় আরও অধীর হইয়া পড়িলেন। কাহারও সহিত কোন হাসিকাব্য বা বিশেষ কোনও বাক্যালাপ নাই। সর্ব্বদাই যেন চিন্তানিমগ্ন। দুই তিন দিনের মধ্যে মুখশ্রী এতই মলিন হইয়া পড়িল যে, মুখের দিকে তাকাইলে চোখে জল আসে। "বিপদ্ বিপদম-

নুবধ্নাতি সম্পদঃ সম্পদিতি" এই মহাজনবাক্য ক্রমেই প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। প্রায় প্রত্যহই মন্দিরে একটা না একটা ঝঞ্ঝাট আছেই। এ ত গেল মন্দিরের অবস্থা, ধামের মধ্যে ঘরে ঘরে নানারূপ বাদ-বিসম্বাদ অশান্তি ছাড়া দেখা যায় না। ধামের এবং ধামেশ্বরের সেবার নানারূপ বিশৃঙ্খলতার কথা ভাবিয়া ভাবিয়াই যেন বাবাজী মহাশয়ের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। জ্বর এবং বুকে শ্লেষ্মার প্রকোপ খুব বেশী হইয়া পড়িল। বাবাজী মহাশয়ের স্বাভাবিক স্বভাব যে, অসুস্থ অবস্থায় কবিরাজ ডাক্তার বা কোন সাধারণ লোকেও যদি কোনরূপ ঔষধ বা কোন নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে বলেন, তাহা অমনি স্বীকার করেন। ঔষধ হয়ত চারি পাঁচ জনে দিয়া গেলেন। সকলে চলিয়া গেলে শুশ্রূষাকারিগণকে বলিলেন—"সকল ঔষধের অনুপান সহ ঔষধ একত্র করিয়া দাও।" শুশ্রূষাকারিগণ না করিলে বিশেষ দুঃখিত হইয়া হয় ত নিজ হাতেই সমস্ত ঔষধ মিশ্রিত করিতে লাগিলেন; কাজেই সেবকগণ শশব্যস্তে সকল একত্রিত করিয়া দিত। এবারও সেইরূপ হইতে লাগিল। প্রায় প্রত্যহই চার পাঁচ কবিরাজের ঔষধ একত্রে সেবন করিতেছেন। একদিন সন্ধ্যার পর বলরামবাবু, নগেনবাবু ও সঙ্গিগণের মধ্যে দুই একজনকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ! ধামের বর্ত্তমান যেরূপ অবস্থা তাহাতে আর ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা কঠিন হইয়া পড়িল। এখন যদি প্রতিকার না করা যায় তবে আরও অতিরিক্ত হইবে সন্দেহ নাই! সুতরাং এখনই ইহার প্রতিকার করা প্রয়োজন।"

বলরাম। আজ্ঞে! ইহার কিরূপ প্রতিকার করা হইবে? আপনি বলিয়াছেন যে নবগ্রহ এককালীন কুপিত হইয়াছেন। তবে তাহার কিরূপ প্রতিকার করিতে হইবে আপনি জানেন।

বাবাজী। কি করিতে হইবে তাহা ত আমি জানি। তবে তোমরা তাহার সাহায্য না করিলে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইবে।

বলরাম। আমাদের দ্বারা যতটুকু হইতে পারে, আপনি আদেশ করিলে প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা করিব।

বাবাজী। নবগ্রহের পূজা, হোম এবং মন্ত্র জপ করাইতে হইবে। সে সমস্ত পরে ব্যবস্থা করা যাইবে। সম্প্রতি নয়দিন ব্যাপী নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞ করিতে হইবে। এই নয় দিনের মধ্যে তিনদিন করিয়া এক এক নিয়ম পালন করিতে হইবে। প্রথম তিনদিন গ্রহগণের অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় হইবে। গ্রহগণ নানাছল করিয়া নানারূপ বেশ ধরিয়া তোমাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করিবে! এমন কি নানারূপে তোমাদের বুদ্ধির ভ্রম জন্মাইতে চেষ্টা করিবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল অপহরণ করিবে। যাহারা নামযজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তাহারা বাহিরে যাইতে পারিবে না। নিষ্কিঞ্চন ভাবে একমাত্র নাম অবলম্বনে দিনাতিপাত করিতে হইবে। যাহা কিছু বাহিরের প্রয়োজন, তাহা তোমরা বাহিরে থাকিয়া করিবে। অর্থাৎ বাহিরের কেহ ভিতরে আসিবে না, ভিতরের কেহ বাহিরে যাইবে না নিতাইর ইচ্ছায় আমি যখন যাহা বলিব অবিচারে সেই কার্য্য করিবে। স্বাভাবিক কোন কার্য্যের সময় তাহার উদ্দেশ্য জানিবার জন্য যেমন তোমরা আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া থাক, কিন্তু এ সময় তাহা করিবে না। উদ্দেশ্য কার্য্যের অন্তে বুঝিতে পারিবে। তোমাদিগকে আর অধিক কি বলিব? যদি কার্য্যকারকদিগের মতিভ্রম না জন্মে তবেই এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার আশা করা যাইতে পারে।

ইত্যাদি নানারূপ বাক্যের দ্বারা উঁহাদিগকে সাবধান করিতে লাগিলেন। উঁহারাও প্রাণপণে এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানকল্পে উদ্‌যোগী হইতে লাগিলেন। কবে যে এই কার্য্য আরম্ভ হইবে, কেহই তাহা ঠিক অবগত নহেন। একদিন বাবাজী মহাশয় একখানি কাগজে কতকগুলি গাছগাছড়া ঔষধের তালিকা করিয়া দিলেন। পুরীবাসী দুইটী লোক দ্বারা বন হইতে কতক গাছের ছাল, কতক পাতা শিকড় প্রভৃতি আনাইয়া

একত্রে জ্বাল দিতে আদেশ করিলে সমস্ত একত্রে ছেঁচিয়া জ্বাল দেওয়া হইল। ইনি উক্ত পাঁচনের জল দ্বারা সমস্ত স্থান বা দ্রব্য পরিশুদ্ধ করাইতে লাগিলেন। পাঁচনের রসমিশ্রিত জল এক একটী কলসীতে করিয়া সঙ্গিগণের মধ্যে কয়েকজনকে পঞ্চতীর্থ, পুরীগোস্বামীর কূপ, জগন্নাথের মন্দির প্রভৃতি কয়েকটী প্রয়োজনীয় স্থান পরিশুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এদিকে নিজে উক্ত পাঁচন দ্বারা আশ্রমস্থ শালগ্রাম এবং অন্যান্য বিগ্রহ মূর্ত্তির মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। আশ্রমের ইন্দারায় এক কলসী ঢালিয়া দিলেন। ক্রমে সঙ্গিগণকে একটী ছোট গ্লাসের এক এক গ্লাস করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। নিজে প্রথম এক গ্লাস পান করিয়া তৎপর সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছেন, আর নিজে নিজে বলিতেছেন, "ঠাকুরের সংসারে যেরূপ দ্রব্যজাত সঞ্চয় হইয়াছে এবং ব্যবহারিক ভোগ বিলাসের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কঠোর ভাব ধারণ না করিলে কিছুতেই নিষ্কিঞ্চন অবস্থা আনা যাইবে না। কাহাকে যদি বিলাইয়া দেওয়া হয় তবে ত আবার তাহাকে আসক্ত করা হইবে। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন —"অতঃ সর্ব্বভুজং বহ্নিমাশ্রয়েৎ সর্ব্বথা নরঃ।" যখন নিজ ব্যবহারিক দ্রব্যাদি দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্যের বাধা জন্মিবার সম্ভব হয় এবং উক্ত পদার্থ সকল অপর কাহারও গ্রহণীয় না হইবে, তখন একমাত্র সর্ব্বভুক্ অগ্নিকে আশ্রয় করাই যুক্তিসঙ্গত। যাহা হউক নিতাইচাঁদের ইচ্ছা" বলিয়া একবার শ্রীজগন্নাথ দর্শনে বাহির হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বাবাজী মহাশয়ের ব্যবহারের জন্য পঁয়তাল্লিশ টাকা দামের একখানি সিল্কের চাদর আনা হইয়াছিল। চাদরখানি ঠিক সূতার চাদরের মত; সুতরাং সঙ্গিগণের ধারণা— ইনি ঠিক সূতার চাদর বলিয়াই উহা ব্যবহার করিতেছেন। জানি না প্রকৃতপক্ষে ইনি বুঝিয়াছেন কি না। জগন্নাথ দর্শন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সঙ্গীয় দুইজনকে বলিলেন, "এই চাদরখানি খুব টান করিয়া ধর ত!" তাহারা ইঁহার আদেশানুরূপ

ধরলে ইনি নিজে একটী দেশলাইর কাঠি ধরাইয়া চাদরের নীচে ধরিলেন। শশব্যস্তে কেহ কেহ উপস্থিত ব্যাপারে বাধা দিবার উপক্রম করিবামাত্র এরূপ তীব্র দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিলেন যে, তাহারা অতিশয় ভীতভাবে পশ্চাৎপদ হইল। সিল্কের চাদর ভাল জ্বলিতেছে না দেখিয়া নিজেই ঘর হইতে সূতার চাদর এবং মশারি প্রভৃতি এক একখানি আনিয়া ঐ আগুনের মধ্যে দিতে লাগিলেন। অগ্নিটী ক্রমেই প্রবল পরাক্রম বিস্তার করিতে লাগিল। বাবাজী মহাশয়ও নৃত্য করিতে করিতে পরমানন্দিত চিত্তে ঘর হইতে বালিশ, লেপ, তোষক প্রভৃতি এক একটী দ্রব্য আনিয়া ঐ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছেন। ইঁহার সহাস্য প্রফুল্ল মুখকমল দর্শন মাত্র পরিতৃপ্ত হইতে হয়; কিন্তু অভিলষিত আচরণে বাধাবিঘ্নকারি-দিগের প্রতি ভয়ানক কঠোরতা প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকল শেষ হইয়া গেল।

হঠাৎ রাস্তায় একজন আতরওয়ালা, 'আতর চাই' বলিয়া ডাক দিবা-মাত্র, বাবাজী মহাশয় সদর দরজায় গিয়া আতরওয়ালাকে ডাকিলেন। সে নিজের স্কন্ধদেশ হইতে আতরের বাক্সটী নামাইয়া বাবাজী মহাশয়কে প্রণাম করিল। ইনি "কি কি আতর আছে" জিজ্ঞাসা করায় সে এক একটী করিয়া দেখাইতে লাগিল। সমস্ত আতর দেখান শেষ হইলে তাহাকে আদেশ করিলেন—"দ্যাখ্, তোর এই সমস্ত শিশিগুলি রাস্তায় ঢালিয়া দে।" আতরওয়ালা প্রথম মনে করিল বোধহয় আতরগুলি ভাল নয় বলিয়া ইনি পরিহাস করিতেছেন। তৎপরে যখন বিশেষ ক্রুদ্ধভাব দেখাইয়া বলিলেন—"বাবা! তুই ত পয়সা পাইবি, তোর এত বিচারের প্রয়োজন কি? আমি যাহা বলি সেইরূপ করিতে হইবে।" বলিয়া নিজে এক শিশি ঢালিয়া ফেলিলেন, দেখিয়া সে অতিশয় ব্যস্ত ভাবে ইঁহার আদেশনুযায়ী আতরের শিশি রাস্তায় ঢালিতে লাগিল। রাস্তায় বহুলোক সমবেত হইয়াছে। গৌর নামক একটী বেশ বলবান্ লোক যে স্থানে আতর ঢালা হইতেছিল,

ঐ স্থানে আসিয়া মস্তক দেখাইলে, বাবাজী মহাশয় আতরওয়ালাকে উহার মাথায় ঢালিবার আদেশ দিলেন। সেও তাহাই করিল। আতরে গৌরদাসের পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া গেল। আতরঢালা লীলা শেষ হইলে বাবাজী মহাশয় আতরওয়ালাকে উহার দামের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বিস্মিতভাবে ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিল, "প্রভু! আমার বলিবার কিছুই নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা দিন।" ইনি ললিতাদাসীকে আদেশ করিলেন "পঞ্চাশটী টাকা ইহাকে দাও।" ললিতাদাসী টাকা লইয়া আতরওয়ালাকে দিলে সে বলিল, "আজ্ঞে! আমার ইচ্ছা পাঁচটী টাকা ঠাকুরের প্রণামী বাবদ রাখা হউক।" লোকটী মুসলমান, কিন্তু ঠাকুরের উপর উহার ভক্তিভাব দেখিয়া সকলে বিশেষ সুখী হইলেন। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "দেখ তোমার আতরের দাম আরও বেশী হইত, তাহা হইতে পাঁচ টাকা ঠাকুরের প্রণামী গেল, ও টাকা তোমার; সে আর কোনও আপত্তি করিল না।" সে ইঁহার ব্যবহার দর্শনে অবাক্ হইয়া অগত্যা টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে সেদিন কাটিয়া গেল; পর দিবস প্রাতে ইঁহার কি খেয়াল হইল— সঙ্গিগণের কাপড় চাদর প্রভৃতি সমস্ত আনিবার আদেশ করিলেন। কেহ বা সরলভাবে সমস্ত আনিতেছে, কেহ কেহ বা কোন একটী দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট আনিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যেমন সে উপস্থিত হইল, অমনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—"হ্যাঁরে মায়ার কীট, তুই অমুক দ্রব্য লুকাইয়া রাখিলি কেন? শীঘ্র লইয়া আয়।" সে অতি ভীত ও স্তম্ভিতভাবে লুক্কায়িত বস্তু বাহির করিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে কেবলমাত্র ললিতাদাসী প্রভৃতি সখীদিগের ঘাঘ্‌রা, কাঁচুলী, উড়ানী, শাড়ী প্রভৃতি ছাড়া যাবতীয় দ্রব্য একত্র করিয়া আগুন লাগান হইল। ক্রমে খাট, চৌকী, চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি কাঠের জিনিস সকল ঐ আগুনে দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আগুন প্রবলরূপ ধারণ করিল। পাছে কেহ কিছু বলে

এই ভাবিয়া খোল করতাল যোগে সেই অগ্নি পরিক্রমা করতঃ নাম করিবার আদেশ করিলেন। সকলে ইঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। অপরূপ কৌতুক দেখিবার জন্য বহু বহু লোক একত্রিত হইয়াছে; ইঁহার কিন্তু অন্য দিকে খেয়াল নাই; কেবল ঘরে ঘরে ঢুকিয়া নানাবিধ দ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বলরামবাবুর প্রতি জলদগম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, "দেখ বলরাম, আগামী কল্য হইতে নামযজ্ঞ আরম্ভ হইবে, সকলে সাবধান হও। আশ্রম হইতে বাহিরে যাইবার দরজার সমস্ত কবাট বন্ধ থাকিবে। নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় আমি যখন যাহা প্রয়োজন বোধ করিব অবিচারে যোগাড় করিবে। আপাততঃ এক শত টাকা আমাকে আজ আনিয়া দাও! প্রধান কথা— বাহিরের কেহ ভিতরে প্রবেশ করিবে না, আবার ভিতরের কেহ বাহিরে যাইবে না, এই বিষয়টী বিশেষ সতর্কতার সহিত পালন করিবে।"

বলরাম টাকা আনিবার জন্য গমন করিলেন। ইত্যবসরে কেন্দ্রাপাড়ার জমীদার বাবু বলরাম ভ্রমরবর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহার হাতে একটী নবরত্নের অঙ্গুরী ছিল। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে নবরত্নের প্রয়োজন বলিয়া উক্ত অঙ্গুরীটী রাখা হইল। যথাসময়ে বলরাম টাকা লইয়া আসিলে নয়টী নূতন কলসীতে টাকাগুলি রাখিয়া তাহাতে জল পূর্ণ করতঃ যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। রাত্রে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। বাবাজীমহাশয়ের কিন্তু নিদ্রা নাই, কেবল বাড়ী পরিষ্কার করিতেছেন। পূর্ব্ব হইতেই সঙ্গিগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে—"আমার কোনও কার্য্যে কেহ প্রতিবাদ করিবে না বা বাধা দিবে না। আমার আচরিত কার্য্যের উদ্দেশ্য কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না।" কাজেই ইনি যে যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে সঙ্গিগণের প্রাণে ব্যথার কারণ হইলেও কেহ কিছু জিজ্ঞাসা বা নিবারণ

করিতে সাহস পাইতেছেন না। কেবল কৃপা করিয়া যাহার উপর যে আদেশ করিতেছেন, তিনি সেইটী পালন করিতেছেন।

রাত্র প্রভাত হইতে না হইতেই নাম আরম্ভ হইল। নবরত্ন অঙ্গুরী, শালগ্রাম শিলা এবং অন্যান্য কয়েকটী জিনিষ একটী পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তুলসীমঞ্চের উপরিভাগে তুলসী বৃক্ষের মূলদেশে উক্ত পাত্রটী রাখিয়া পরিক্রমা করতঃ নাম করিতে লাগিলেন। এদিকে ইন্দারা হইতে জল তোলাইয়া একটী ঘটীতে করিয়া নিজ হাতে সকলের মাথায় ঢালিতে লাগিলেন। ক্রমে এক একজনের স্নান শেষ করিয়া উহার ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস প্রাচীরের উপর দিয়া রাস্তায় ফেলিতে আদেশ করিলেন। প্রথম প্রথম পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগে কেহ কেহ আপত্তি করিবামাত্র হাতের ঘটীর দ্বারা এক এক আঘাতরূপ শক্তি সঞ্চার করিলেন। অমনি সে অবিচারে ডোর কৌপীন ফেলাইয়া নির্ব্বিকার অবস্থায় সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। একমাত্র সখী ভাবাপন্ন কয়েকটী ছাড়া আর সকলেই উলঙ্গ ভাবে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

বেলা অনুমান দশটা, এই সময় গণেশদাস নামক সঙ্গীয় একটী পরামাণিক দ্বারা নিজ মস্তক মুণ্ডন করাইলেন। উহাকে বলিলেন— "দ্যাখ্, শিখাসহ মুণ্ডন করিয়া দে। কারণ এই শিখা ও কণ্ঠীতে মায়া স্পর্শ হইয়াছে; অতএব এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসময়ে বিশুদ্ধভাবে শোধন করিয়া তুলসী কণ্ঠী ধারণ এবং শিখা রাখিতে হইবে।" বলিয়া নিজেও শিখা কণ্ঠী পরিত্যাগ করিলেন; অপরাপর সকলেরও পরিত্যাগ করাইলেন। সংকীর্ত্তনধ্বনি ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ভাবে ইন্দারা হইতে জল তোলাইয়া ঐ জল সকলের মাথায় গায়ে ঢালিতেছেন, আর সকলকে পান করাইতেছেন। এক একজনকে উদর পরিপূর্ণ করিয়া জলপান করাইতেছেন। কিন্তু কাহারও বাহ্য প্রস্রাবের বেগ নাই। সকলেই নির্ব্বিকার, নির্ম্মম ও

নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় নামকীর্ত্তন করিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আশ্রমে শুক এবং সারী এই দুইটী পক্ষী প্রতি-পালিত হইতেছিল। সারীটী কেবল বলে "শুক! পড় বাবা পড়, দিন ত যায়।" শুকটী অবিশ্রান্তভাবে—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ শ্রীরাধে গোবিন্দ; হরিনাম রটরে রসনা বৃথা দিন যায়; কহ সখী ললিতা কৃষ্ণতত্ত্ব কথা;" ইত্যাদি নানারূপ মনোমুগ্ধকর বাক্য দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। শুকটীর কণ্ঠটী এতই উচ্চ যে দূর হইতে শুনিলে বোধ হয় যেন একটী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা কথা বলিতেছে। শুক এবং সারীটীকে পূর্ব্বোক্ত পাঁচন জল দ্বারা প্রথমে স্নান করাইয়া তৎপরে শোধিত ইন্দারার জল দ্বারা পুনর্ব্বার স্নান করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে গান ধরিলেন—"বল্ দেখিরে শুক সারী, কোথায় আমার রাই কিশোরী। রাই বিনে আর প্রাণ বাঁচে না, বিচ্ছেদ-জ্বালায় জ্ব'লে মরি॥" পাখী দুইটী কোনই কথা বলিতেছে না; কেবল এক একবার মাত্র ইঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিতেছে। প্রথম অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে হয় ত পাখী দুইটী উড়িয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হইল না, উহার নিজ স্বভাব ভুলিয়া সংকীর্ত্তনে পরিক্রমা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে একবার ঠাকুরমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতঃ একেবারে উড়িয়া রাধাকান্ত বিগ্রহের সম্মুখে গিয়া বসিল। বাবাজীমহাশয় উহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছেন, আর পূর্ব্বোক্ত গানটী গাহিতেছেন, ললিতাদাসীর উপর আদেশ হইল "ঠাকুর সেবা কর।" ললিতাদাসী যথাসম্ভব ফুল তুলসী দ্বারা ঠাকুরের সেবা করিল এবং যৎকিঞ্চিৎ বাল্যভোগ লাগাইল।

ঠিক মধ্যাহ্ন সময় শুকটী উড়িয়া পূর্ব্বোক্ত তুলসীমঞ্চস্থ নবরত্ন অঙ্গুরী শালগ্রাম প্রভৃতি পরিপূর্ণ পাত্রটীর উপর গিয়া বসিল। এদিকে অতি উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে করিতে সকলে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাবাজীমহাশয় অতি আগ্রহ সহকারে শুকটীর পিঠের উপর বাম হস্ত

বুলাইতেছেন। সকলেই প্রেমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন, এই সময় ভাগ্যবান্ শুকটী সেই সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের মধ্যে নিজ স্থূল দেহটী রাখিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিল। বাবাজীমহাশয় শুকের স্থূল দেহটী বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। পক্ষিরূপধারী মহাত্মার বিরহবেদনায় সকলেই কাতর হইলেন। সকলেরই চোখে জল, কণ্ঠ গদগদ, অঙ্গে পুলক। সকলেই মনে মনে শুকের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বাবাজীমহাশয় কিন্তু শুকের সেই মৃতদেহ আর বক্ষ হইতে নামাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কবাট বন্ধ করতঃ শুকের দেহটী বক্ষে লইয়া শয়ন করিলেন।

বাহিরে নামকীর্ত্তন হইতেছে। সন্ধ্যা হইল, বাবাজীমহাশয় একভাবেই শয়ন করিয়া আছেন, আর সঙ্গিগণের উপর আদেশ করিতেছেন "সাবধান! নাম যেন কোন রকমে বন্ধ না হয়।" নাম চলিতেছে, কিন্তু বাবাজীমহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন না। ঠাকুরের কিছু ভোগ হইল না দেখিয়া অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই এই কথা বাবাজী-মহাশয়কে বলিতে সাহস পাইতেছেন না। অগত্যা কোনও কৌশলে কবাট খুলিয়া প্রেমদাদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখনও বাবাজী-মহাশয় পূর্ব্ববৎ শুকের দেহটী বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া আছেন। প্রেমদাদা ধীরে ধীরে গিয়া ইঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতে করিতে বলিলেন, 'আজ্ঞে। ঠাকুরের কিছুই ভোগ দেওয়া হয় নাই। কিরূপ কি করিতে হইবে?' বাবাজীমহাশয় বলিলেন, "এ সমস্ত লইয়া তোমাদের ব্যস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই, যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আমিই বলিব, তোমরা নাম কর।" প্রেমদাদা আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। বাবাজী-মহাশয়ের আদেশে বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ নাম করিতে লাগিলেন। বলরাম, আশ্রমের বাহিরে থাকিয়া বাবাজীমহাশয়ের আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

হঠাৎ বাবাজীমহাশয় জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'বলরাম! কিছু ফলমূল ও মিষ্টি ঠাকুরের ভোগের জন্য প্রয়োজন, আর কিছু মহাপ্রসাদ চাই।' আজ্ঞা পাইবামাত্র বলরামবাবু সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিলেন। ফলমূল ও মিষ্টি ঠাকুরের ভোগ হইলে সকলে একসঙ্গে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। ললিতাদাসী সকলকে পরিবেশন করিয়া দিতে লাগিল সকলেই উলঙ্গ, যেন পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় নির্ব্বিকারভাবে মহাপ্রসাদ সেবা করিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে লাগিলে বাবাজীমহাশয় সকলকে বলিলেন, "প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাফাল ছাড়ে, তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে। হ্যাঁরে! অমৃত বৃষ্টি হইতেছে, সকলে প্রাণ খুলিয়া নাম কর্, আর দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য কর্।" সকলেই তদ্রূপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর ইনি শুকের সেই মৃত দেহটী পূর্ব্ববৎ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ঘরের মধ্যে গিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, বাবাজী-মহাশয় তখনও পূর্ব্ববৎ শয়নে আছেন, কিন্তু শুকের মৃতদেহটী নাই। সকলেই বিস্মিত ভাবে বাবাজীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় ইনি বলিলেন, "সে নিত্যলীলায় গমন করিয়াছে।" ললিতাদাসী বলিল, "আজ্ঞে! তাহার স্থূল দেহটা কি হইল?"

বাবাজী। কেন? সশরীরে স্বর্গারোহণ হইতে পারে; আর সশরীরে ব্রজে যাওয়া কি অসম্ভব?

ললিতা। গতকল্য মধ্যাহ্ন সময়ে শুক স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার গম্যস্থানে চলিয়া গেল। পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ অচৈতন্য ভাবে এই স্থানেই পড়িয়া রহিল। সেই অচল দেহ কিরূপে আবার নিত্য-লীলায় গমন করিল?

বাবাজী। তাহার সূক্ষ্ম দেহটী এইস্থানে থাকিয়াই শূন্যমার্গে এই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল; যখন অমৃত বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন স্থূলদেহে আসিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক একেবারে স্থূলদেহ লইয়া

নিত্যলীলায় প্রবেশ পূর্ব্বক নিকুঞ্জের মধ্যে যুগল নামকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

সকলেই বাবাজীমহাশয়ের কথা শুনিয়া অবাক্ হইল এবং শুকের উপর ইঁহার অভাবনীয় কৃপার কথা ভাবিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল। প্রভাত সময় হইতে পূর্ব্ববৎ নামও চলিতে লাগিল, জল ঢালাও আরম্ভ হইল। পূর্ব্বদিন অপেক্ষা আজিকার ব্যবস্থা একটু কড়াকড়ি চলিতে লাগিল। এক একজনকে শয়ন করাইয়া পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দলিত করিতে লাগিলেন, আর সমানভাবে অনবরত জল ঢালিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব শক্তি! দেখিলে মনে হয় যেন এই মুহূর্ত্তেই বালকের প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইবে; কিন্তু যেমন পূর্ব্বোক্তরূপে চরণে দলিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন, অমনি সে দ্বিগুণতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সঙ্গিগণের মধ্যে এ সৌভাগ্য সকলের ঘটে নাই; কয়েকটী বালকের উপরই বিশেষভাবে শক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল।

উদ্ধবদাস নামক অনুমান বার তের বর্ষীয় স্থূলকায়, গৌরবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি একটী বালক, কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আশ্রমে বাস করিতেছে। বালকটী ভগবৎ-সংসারের নানাবিধ সেবাকার্য্যে বিশেষ উৎসাহী এবং সক্ষম; কিন্তু একটী কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত। উহার জন্য বহু বহু উপায় বিধান করা হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল লাভ হয় নাই। আশ্রমবাসী সকলেই এজন্য দুঃখিত। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা জানি না, হঠাৎ বাবাজী-মহাশয় উহাকে শয়ন করাইয়া চরণে দলিত করিতে লাগিলেন ও জল ঢালিতে লাগিলেন। বালকটী যদিও বেশ সবল ও সুস্থকায়, তথাপি ইঁহার সেই বিশাল দেহের ভারেতে অতিশয় কাতর হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে; সকলে ভাবিতেছেন যে আর কিছুক্ষণ এইরূপ অবস্থায় থাকিলে নিশ্চয়ই বালকের প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইবে। বাবাজী মহাশয়ের কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। অবিরতভাবে জল

ঢালিতেছেন, আর উহার উপরে চড়িয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দলিত করিতেছেন, কিছুক্ষণ পরে উহার দুইটী নাসা হইতে কতকগুলি শ্লেষ্মা বাহির হইয়া গেল; সকলেই সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছেন এই সময় উহার বাম নাসিকারন্ধ্র হইতে প্রায় বিতস্তি প্রমাণ একটী কাকলাস বাহির হইয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক দ্রুতগতি চলিয়া গেল। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় চরণ দ্বারা দুইবার উহাকে গড়াগড়ি করাইয়া উঠাইয়া দিলেন। সেও পরমানন্দিতচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই হইতে বালকের কুৎসিত ব্যাধি (বিছানায় প্রস্রাব করা) দূর হইয়া গেল; বালক যেন ভক্তির মূর্ত্তি হইল।

ক্রমে বেলা যতই অধিক হইতেছে, সংকীর্ত্তনানন্দ যেন ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ যে কেবল সঙ্গিগণের উপরেই জল ঢালা তাহা নহে, এক একবার ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেছেন, আর ঠাকুরদের উপর জল ঢালিতেছেন। জল এতই ঢালা হইতেছে যে, প্রণালী দ্বারা বাহির হইয়া রাস্তায় স্রোত চলিতে লাগিল। আজ যেন বাবাজীমহাশয় এতই উন্মত্ত হইয়াছেন যে, অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ ও ঢুলু-ঢুলু। এরূপ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করিতেছেন যে, সম্মুখে কাহারও কিছু বলিবার সাহস হইতেছে না। বেলা অতিরিক্ত হইয়া গেল। সঙ্গিগণের কা কথা— ঠাকুর পর্য্যন্ত কিছু খান নাই। কার্য্যানুরোধে বাবাজী মহাশয় একটু অন্তরালে গমন করিলে সঙ্গিগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছেন, "আজ যে কি উপায় হইবে, কিছুই ঠিক নাই। এত বেলা হইল, ঠাকুরও কিছু খাইলেন না, বাবাজী মহাশয়ও কিছু খাইলেন না, কিছু ফল মূল হইলেও অন্ততঃ ঠাকুরের ভোগ দিয়া ইঁহাকে খাওয়ান যাইত।" উঁহারা এত সন্তর্পণে কথা বলিতেছেন যে, সঙ্গীয় লোক সকলে যাহাতে শুনিতে না পায়। খুব উচ্চৈঃস্বরে নাম হইতেছে, খোল করতালের ধ্বনিতে দিক্ সকল মুখরিত। বাবাজী মহাশয় গৃহাভ্যন্তরে নানাবিধ ব্যাপারে অতিশয় ব্যস্ত। ইতিমধ্যে

হঠাৎ আসিয়াই বলিলেন, "ঠাকুরের ভোগের জন্য বা আমার খাইবার জন্য নাম ছাড়িয়া তোমাদের সমালোচনা করিবার কি প্রয়োজন ?" বলিয়াই একসঙ্গে এক একজনের মাথায় তিন তিন ঘটি জল এবং এক এক ঘটির বাড়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চায় করতঃ পুনর্ব্বার নিজ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এইরূপে কেহ কিছু মুখে উচ্চারণ করুন চাই নাই করুন, মনে যাঁহার যাহা উদয় হইতেছে, বাবাজী মহাশয় অমনি তাহা প্রকাশ্যে বলিয়া দিতেছেন। ক্রমে ইহজন্মের এবং পূর্ব্বজন্মের অতীত ঘটনা সকল বলিয়া সকলের পাপক্ষালন করিতে লাগিলেন। সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত।

বেলা অনুমান তিনটার সময় বলরামের উপর কিছু ফল মূল ও মিষ্টি আনিবার আদেশ দিলেন। বলরাম অতি দ্রুতগতিতে আদিষ্ট দ্রব্য আনিয়া দিলে ইনি ললিতাদাসীর উপর ঠাকুরের ভোগের ভার দিলেন। সেও অতিশয় শীঘ্রগতি ঠাকুরের ভোগ লাগাইয়া, ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে প্রভু ! এই অধরামৃত যদি বাবাজী মহাশয় গ্রহণ করেন, তবে জানিব তুমি খাইয়াছ, নতুবা আর তোমাকে সেবা করিব না।" কি আশ্চর্য্য ! ঠাকুরের ভোগ হইবামাত্রই বাবাজীমহাশয় নিজে আসিয়া অধরামৃত কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক সকলকে বাঁটিয়া দিতে লাগিলেন। সেদিন আর অন্ন মহাপ্রসাদ কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। যে যথা হইতে চায় দৈবের ঘটন। সন্ধ্যার পর হইতেই সঙ্গিগণের মতিভ্রম উপস্থিত হইল। যাঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়াছিলেন, গ্রহগণের ছলনায় তাঁহারা পূর্ব্ববাক্য সকল বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা মনে ধারণা করিলেন যে বাবাজী মহাশয়ের মতিভ্রম হইয়াছে। সঙ্গীয় লোকদিগকে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে বাবাজী মহাশয় কিছুতেই স্থির হইতে পারিবেন না। এই বোধেই বাহির হইতে অবসরমত বাবাজী মহাশয়ের অলক্ষিত ভাবে এক একজনকে পলাইয়া যাইবার ইসারা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই একটী করিয়া পলাইতে লাগিল। বাবাজী মহাশয় উহাদিগকে না দেখিয়া শশব্যস্তে

—“মার মার! তাড়া তাড়া!!” শব্দে একখানা বাঁশ হাতে করিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্বেষণে কোনই ফল হইতেছে না; কারণ গ্রহগণ উহাদিগের এরূপ মতিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে যে, তাহারা সে পাড়া পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ঝাঁজপিটা গলির মধ্যে মঠ হইতে পাঁচ ছয়খানা বাড়ী ব্যবধানে দক্ষিণ দিকে শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পুলিশ ইনেস্‌পেক্‌টর) বাস করেন। উঁহার বাড়ীর নিকট রাস্তায় একটী সরকারী আলো ভয়ানক তেজে জ্বলিতেছিল; বাবাজী মহাশয় মঠের সদর দরজা হইতে প্রথম একবার ঐ আলোটার দিকে দৃষ্টি করিয়াই—“উঃ কি ভীষণ মায়া! দূরহ দূরহ” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতঃ এক গণ্ডূষ জল সেই দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সে’বার কিছুই লক্ষ্য হইল না, দ্বিতীয় বার আবার রাস্তায় দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ চীৎকার করতঃ আর এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন। এবার আলোটার তেজ কমিয়া গেল। রাত্র অনুমান দুইটার সময় পূর্ব্ববৎ রাস্তায় দাঁড়াইয়া যেমন এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করা, অমনি আলোটী নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তখন বাবাজী মহাশয় নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন,— “যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্তায় পরিণতি, তাঁর শক্তি জীবে দেখাইতে। সেইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈল নিত্য-লীলা হৈতে॥” গাহিতে গাহিতে ললিতাদাসী এবং কুসুম দাসীকে সদর দরজার দুই পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া দিলেন। রাস্তার এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সকলকে শয়ন করাইয়া দিলেন। লোক চলাচল করিবার রাস্তা নাই। হঠাৎ একটী আলো হাতে করিয়া দুইটী পাহারাওয়ালা এবং একজন রাইটার কনষ্টেবল আসিয়া উপস্থিত হইল। রাইটারটী অপর দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ ক্যা হ্যায়?” কনষ্টেবল দুইটী বলিল, “চরণদাস বড়ে বাবাজী আজ কয়দিনসে কেবাড় বঁধ্ করকে কীর্ত্তন কর্‌তেথে, বহুত কাপড়া ওপড়া জারায় দিয়া, ক্যা জানে আজ কৈসে

খেয়াল হয়া ?" বলিয়া এক বারান্দার উপর দিয়া চলিয়া গেল। ললিতা-দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে কুসুমদাসীকে বলিল,— 'এই যে পুলিশ দেখিয়া গেল, না জানি কি সর্ব্বনাশ করে।"

কুসুম। আচ্ছা, সকলকে ভিতরে উঠাইয়া আনিলে হয় না ?

ললিতা। না ভাই! ও যুক্তি ঠিক নয় ; কারণ একে ত মহৎ কার্য্যে ব্যাঘাত, আবার দেখ কুঞ্জদাদা প্রভৃতি দুই একজন চলিয়া যাওয়ায় বাবাজী মহাশয় যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। আবার যদি ইহারাও চলিয়া যায় তবে বড়ই অনর্থ ঘটিবে।

কুসুম। তবে আমাদের আর কি সাধ্য আছে ?

ললিতা। আমাদের সাধ্য একমাত্র কাতর প্রাণে নিতাই চাঁদের নিকট প্রার্থনা করা। তিনি মঙ্গলময়— সব অমঙ্গল দূর করিবেন।

এইরূপ বলাবলি হইতেছে— ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে কুসুমদাসী বলিল,— "আজ্ঞে! পুলিশ আসিয়া দেখিয়া গেল, ইহাদিগকে উঠাইয়া ভিতরে আনিলে হয় না ?" যেমন বলা অমনি বাম হাতে উহার গালে এক চাপড় মারিয়া "মায়া! মায়া!!" শব্দে রাস্তায় নামিলেন। রাত্রি প্রায় চারিটা এই সময় ললিতাদাসী, কুসুমদাসী, রাধাবিনোদ, ফণী প্রভৃতি ছয় সাত জন ছাড়া আর সকলেই পলাইয়া গেল। বাবাজী মহাশয় আসিয়া যেমন দেখিলেন সকলে চলিয়া গিয়াছে, অমনি ক্ষিপ্তপ্রায় একখানা পাঁচ ছয় হাত বাঁশ হাতে লইয়া রাস্তার এ মোড় হইতে ও মোড় পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক একবার বা কাহারও কাহারও গৃহের কবাটের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিগণ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এদিকে রাইটার বাবু থানায় গিয়া এই ঘটনার বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য কয়েক জন পুলিশ পাঠাইয়া দিলেন। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন, বাবাজী মহাশয় বাঁশ হাতে লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, হঠাৎ পুলিশগণ আসিয়া পিছন

হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাবাজী! এ ক্যা হোতা হ্যায়?" শুনিবামাত্র ইনি মুখ ফিরাইয়া যেমন পুলিশ দেখিলেন, অমনি "মায়া! মায়া!!" শব্দে চীৎকার করতঃ উহাদিগকে তাড়া করিতে লাগিলেন। পুলিশগণ বেগতিক দেখিয়া প্রাণের ভয়ে পলাইতে লাগিল। বেশ পালোয়ান গোছের একজন কন্‌ষ্টেবল একটু রোক করিয়া দাঁড়াইতেই পূর্ব্বোক্ত বাঁশের বাড়ি লাগিয়া উহার হাতের আঙ্গুল ফাটিয়া গেল! সুতরাং অতি দ্রুতগতি সকলে পলাইয়া গেল। ইনি ক্ষিপ্তপ্রায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

রাত প্রভাত হইল। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, বাবাজী মহাশয় পাগল হইয়াছেন, এই স্থির করিয়া যাহাতে ইঁহাকে ধরিয়া স্থির করা যায় সেইরূপ যুক্তি করিতে লাগিলেন। সাব্‌ইন্‌স্পেক্‌টর পূর্ণবাবু কয়েকজন পুলিশ লইয়া রাস্তার দুইদিক ঘেরাও করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ইঁহার নিকটস্থ হইতে পারিতেছেন না। এক একদলকে প্রায় একশত হাত দূরে হটাইয়া দিতেছেন। বেলা প্রায় আটটা হইল কিছুই করিতে না পারিয়া, কৌশলী পূর্ণবাবু পুলিশের পোষাক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইঁহার নিকট আসিলেন। পূর্ণবাবুকে দেখিবামাত্র বাবাজী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কি পূর্ণ! কি জন্য আসিয়াছ? পূর্ণবাবু করযোড়ে প্রণাম করতঃ সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন,— "বাবা! আপনি অনুগ্রহ না করিলে আমার ত আর চাক্‌রী থাকে না।"

বাবাজী। কেন বাবা! কি হইয়াছে?

পূর্ণবাবু। আপনাকে একবার থানায় যাইতে হইবে।

বাবাজী। বেশ কথা! এর জন্য এত কাতর হইবার প্রয়োজন কি? আগে আমায় বলিলেই হইত। এই ধর আমাকে তোমার নিজ হাতে বাঁধ।

এই বলিয়া বাঁশখানা পরিত্যাগপূর্ব্বক হাত দুইখানি একত্র করিয়া দিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ইঁহার সদয়ভাব দর্শনে ভীতভীতভাবে বিশেষ দুঃখিতচিত্তে হাত দুইখানি বাঁধিলেন। পূর্ণবাবুর উপর আদেশ হইল, "দেখ

পূর্ণ! আমি হাঁটিয়া যাইব না, আমায় কাঁধে করিয়া নিতে হইবে ; কিন্তু যার তার কাঁধে যাইব না।” পূর্ণবাবু করযোড়ে বলিলেন,—“আপনি আজ্ঞা করুন কাহার কাঁধে যাইবেন ?” ইনি তখন “গরুড় গরুড়” বলিয়া ডাক দিবামাত্র পূর্ব্বে যাহার মাথায় আতর ঢালা হইয়াছিল, সেই গৌর আসিয়া প্রণাম করিলে ইনি তাহার কাঁধে উঠিলেন। সে ইহাকে কাঁধে করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে নাচিতে নাচিতে গমন করিতেছে। ঝাঁজপিটা গলি পার হইয়া কুণ্ডাইবেণ্ট সাহিতে প্রবেশ করিয়াই গৌর মনে মনে বিচার করিতেছে, ‘কি আশ্চর্য্য! এত বড় দেহখানি ঠিক পাঁচ বৎসরের শিশু অপেক্ষাও হাল্‌কা! এ অতি অসম্ভব কথা! ভাবিতে না ভাবিতেই একেবারে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ‘গেলাম গেলাম, রক্ষা করুন রক্ষা করুন’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পিছনে কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল ছিল, তাহারা ইঁহাকে ধরিতে যাওয়ায় ইনি মৃদু হাসিয়া তাহাদের কাঁধের উপর শুইয়া পড়িলেন। গৌরের কাঁধে পা দুখানি মাত্র রহিল ; দেহের ভার তিনজন পুলিশের উপর দিলেন। চারিজন অতি কষ্টে বহন করিয়া থানায় লইয়া গেল। গৌরের মুখে এই বিস্ময়জনক ঘটনা শ্রবণে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বাবাজী মহাশয়কে একটী ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইল। ঘরখানি বেশ বড় রকমের ; বড় বড় খোলা জানালা আছে। ইনি স্বেচ্ছামত তাহার মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। এদিকে আশ্রমবাসিগণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনজন পুলিশ আসিয়া কয়েকজনকে থানায় ডাকিয়া নিল। তাহাদের নিকট উপস্থিত ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কেহ বা বাবাজী মহাশয়ের মাথা গরম, কেহ বা গ্রহগণের উৎপীড়নে বুদ্ধিভ্রম, কেহ কেহ বা মহাভাবাবেশ বলিয়া স্থির করিলেন। যাঁহার যেরূপ ধারণা তিনি সেই অনুযায়ী প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ মতের সমর্থন করিতেছেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় সাব্‌ ইন্‌স্পেক্টরকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন,—"আমি প্রস্রাব করিব!" বাহির হইলে আবার নানারূপ অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া সাব্ ইন্স্পেক্টর বাবু বলিলেন,—"আজ্ঞে! আপনি ঐ ঘরের মধ্যেই প্রস্রাব করুন।" ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"জল চাই।"

বাবু। আজ্ঞে! আনাইয়া দিতেছি।

বাবাজী। তোমার আনা চাই; অপর কাহারও দ্বারা আনাইলে হইবে না।

বাবু। আচ্ছা, আমিই আনিয়া দিতেছি।

বলিয়া জল আনিতে গেলেন। এদিকে বাবাজী মহাশয় ঘরের যেদিকে নালা, তাহার বিপরীত দিকে বসিয়া প্রস্রাব করিতে লাগিলেন। সাব্ ইন্স্পেক্টর বাবু জলহাতে দাঁড়াইয়া বিস্মিতভাবে দেখিতেছেন যে ঘরের অত বড় মেজেটা ভরিয়া নালা দিয়া প্রস্রাব বাহির হইতেছে। প্রায় আধ-ঘণ্টাকাল বসিয়া অবিরতভাবে প্রস্রাব করিতেছেন, তবুও নিবৃত্তি নাই। মৃদু হাসিয়া এক একবার কেবল সাব্ইন্স্পেক্টর বাবুর প্রতি দৃষ্টি করিতে-ছেন। অপূর্ব্ব কৌতুক দেখিবার জন্য জানালার নিকট অনেক লোক জড় হইল। ইঁহার কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নাই। কিছুক্ষণ পরে সাব্ইন্স্পেক্টর বাবু মনে কি ভাবিলেন তিনিই জানেন, করযোড়ে কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"প্রভু ক্ষমা করুন, থানা ভাসিয়া যাইবে যে! এই আমি জল আনিয়াছি জল নিন!" বাবাজী মহাশয় হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—"কি বাবা! ভয় হইয়াছে? আচ্ছা জল দাও" বলিয়া জানালার ফাঁকে জল নিলেন।

বাবাজী মহাশয় থানায় আছেন শুনিয়া পুরীবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিরূপে ইঁহাকে থানা হইতে বাহির করা যায়? থানায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উপযুক্ত যামিনের কথা বলিলেন। তখন কেন্দ্রা-পাড়ার জমিদারবাবু বলরাম ভ্রমরবর যামিন হইয়া ইঁহাকে বাহির করিলেন।

এ দিকে ইঁহার সঙ্গী কয়েকজন ভক্ত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, "যাহাতে ব্রজলীলা-উদ্দীপক কোনও-রূপ কথা বা ব্যবহার না হয়, সেই বিষয়ে সাবধানে থাকিতে হইবে। ললিতাদাসী এবং কুসুমমঞ্জরী দাসীকে স্থানান্তরে রাখা হউক। কারণ উহাদিগকে দেখামাত্র ইঁহার ব্রজলীলা উদ্দীপন হইবে। ললিতাদাসীকে এই কথা বলায় সে অতি দুঃখিতভাবে বলিল,—"বেশ ভাই! আমরা দূরে থাকিলেই যদি তিনি ভাল থাকেন বা তোমাদের আনন্দ হয়, আমরা চলিলাম" বলিয়া দুইজন মঠের বাহির হইল। প্যারীবাবু এবং জগদীশবাবু এই কথা শুনিয়া উহাদিগকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয় মঠে আসিবেন।

ইঁহার মাথা গরম হইয়াছে, এই কথাই সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। শ্রীধাম বৃন্দাবনে এবং কলিকাতায় টেলিগ্রাম গেল। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে গোবিন্দ দাদা, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী এবং কিশোরী দাসী সখী, কলিকাতা হইতে রামদাদা, যোগেনবাবু, যতীনবাবু, পুলীনবাবু প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া পঁহুছিলেন। এক একজন আসিয়া যেমন দণ্ডবৎ প্রমাণ করিতেছেন, অমনি বাবাজী মহাশয় তাহাদিগকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা এতদিনে আসিলে? প্রথম হইতে তোমরা থাকিলে আর এত দুরবস্থা হইত না।" ইত্যাদি নানারূপ মিষ্টবাক্যে সকলের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব কৌতুক আরম্ভ হইল! যাঁহারা ইঁহাকে পাগল বুদ্ধি করিয়া নিকটে আসিতেছেন, তাঁহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেছেন যে, লোক চমৎকৃত হইতেছে। কোন একটীও পাগলের লক্ষণ প্রকাশ নাই, নানাবিধ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রকাশে তাঁহাদের মনে সংশয় জন্মাইয়া দিতেছেন। আবার যাঁহারা মহাপুরুষ-বুদ্ধিতে দেখা করিতে আসিতেছেন তাঁহাদের নিকট একেবারে উৎকট পাগলের ভাব দেখাইতেছেন। এইরূপ ভীষণ পরীক্ষার তরঙ্গে পড়িয়া সকলে হাবুডুবু খাইতেছেন। বিশেষ জেদ করিয়া কেহ কিছু

জিজ্ঞাসা করিতে গেলে, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। একদিন নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কয়েকটী ভক্তের নিকট বাবাজী মহাশয় যে পাগল নহেন, এই অবস্থার নাম যে দিব্যোন্মাদ বা মহাভাবাবেশ, শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যেমন ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি একটু মৃদু হাসিয়া হাতে তালি দিতে দিতে, "যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্তায় পরিণতি, তার শক্তি জীবে দেখাইতে। সেইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে॥ নিত্যস্বরূপ! আমি পাগল হইয়াছি।" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া শুনিয়া অবাক্।

আবার একদিন পাগল বুদ্ধিতে কয়েকজনে একখানি পাতলা চাদর দ্বারা হাত দুইখানি উল্টা ভাবে পিছনে বাঁধিয়া দিল। এমন কোনও কৌশল হইতে পারে না যাহা দ্বারা ঐ বন্ধন নিজে খুলিতে পারা যায়। ঘরের কবাট বন্ধ। দেড় ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা পরে কবাট খুলিয়া দেখে যে বাবাজী মহাশয় ঘরে নাই, তখন সকলেই শশব্যস্তে চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া প্রায় পনর মিনিট পরে দেখে যে অনুমান দেড় ফুট খাড়াই, একফুট প্রস্থে একটী কোলঙ্গার মধ্যে বসিয়া হাসিতেছেন। সকলে দেখিয়া অবাক্! উহার মধ্যে বাবাজী মহাশয়ের বসা তো দূরের কথা— একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু ইনি অনায়াসে তাহার মধ্যে বেশ বসিয়া আছেন। সকলকে দেখিয়া লম্ফ দিয়া নীচে নামিলেন। হাতের বাঁধন খোলা; চাদরখানি তেমনি গাঁট দেওয়া অবস্থায় এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে। উপস্থিত দুইটী বিস্ময়জনক ঘটনায় সকলে মনে করিলেন যে,—"হায় আমরা বুঝিতে না পারিয়া ইঁহার হাত বাঁধিয়াছি! এ সমস্ত কি কখনও পাগলের দ্বারা সম্ভবে? নিশ্চয় মহাপুরুষ আমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন।" এদিকে সমস্ত বুঝিতে পারিয়াই যেন অন্তর্য্যামী হঠাৎ বাহ্যে যাইবার নাম করিয়া পায়খানায় ঢুকিয়া মলমূত্র গায়ে মাখিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ পাগল বুদ্ধিতে সকলে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিলেন এবং স্নান করাইয়া

পরিষ্কার করিয়া দিলেন। এইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তে এমন সব খেলা করিতে লাগিলেন যেসঙ্গিগণ বিষম সমস্যার মধ্যে পতিত হইলেন। একদিন ঘরের মধ্যে বাহ্যে গিয়া সমস্ত ময়লা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছেন। হঠাৎ দরজা খুলিয়া গোবিন্দ দাদা বলিলেন "এ কি! বিষ্ঠা গায়ে মাখিয়াছেন কেন? আপনাকে কি করিয়া স্পর্শ করি?" শুনিয়া ইনি চকিতের ন্যায় বলিলেন—"হ্যাঁরে গোবিন্দ! বিষ্ঠা কোথায়? এ যে চন্দন এই দেখ্।" বলিয়া যেমন গোবিন্দ দাদার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি অপূর্ব্ব কর্পূরবাসিত চন্দনের ঘ্রাণে চারিদিক আমোদিত হইল।" উপস্থিত এই ব্যাপারে সকলে অবাক্ হইলেন। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে নানাবিধ খেলা করিতে লাগিলেন।

একদিন গোবিন্দদাদার সহিত বালকের ন্যায় নানারূপ আব্দার করিতেছেন— মাথায় ঠাণ্ডা তেল মাখান হইতেছে। জেদ ধরিলেন, "আমি স্নান করিব না।" গোবিন্দদাদা নানারূপ কৌশল করিয়া পঙ্গতঘরের মধ্যেই জল আনাইলেন। স্নান করিতে করিতে উঠিয়া গমনোদ্যত হইলে গোবিন্দদাদা ইঁহার একখানি চরণ ধরিলেন। ইনি যেমন চলিবার উপক্রম করিলেন, অমনি সহসা পাকা মেজের উপর পড়িয়া গেলেন। মাথায় আঘাত লাগিল, এমন কি কিঞ্চিৎ রক্তও বাহির হইল। অনবধানতাবশতঃ ইঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগায় গোবিন্দদাদার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন— "হ্যাঁ ভাই গোবিন্দ! আমাকে বেশ ভাল করিয়া স্নান করাইয়া দে ত?" স্নানের পর বলিলেন—"আমি তোর হাতে খাইব, আমার আজ আর হাতে তুলিয়া খাইবার ইচ্ছা নাই।" গোবিন্দদাদা ইঁহার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেবা করিতে লাগিলেন।

একদিন কিঞ্চিৎ সুস্থভাব অবলম্বন করিয়া ললিতাদাসী প্রভৃতিকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, একজন উহাদিগকে ডাকিয়া আনিল। আসিবামাত্র বলিলেন—"দ্যাখ্, আমি ভাল হইয়াছি, তোরা ঠাকুরের সম্মুখে বেশ নাচিয়া নাচিয়া একটু নাম কর্ ত?" উহারা সেইরূপ করিতে লাগিল।

ক্রমেই কীর্ত্তনটী বেশ জমাট বাঁধিয়া আসিল। বাবাজী মহাশয় আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। যেমনভাবে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সঙ্গিগণের মনে আশঙ্কা হওয়ায় কৌশলে ললিতাদাসী প্রভৃতিকে স্থানান্তরিত করিয়া কোনও-রকমে কীর্ত্তন বন্ধন করিয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথম একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উহাদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিজয়দাদা আসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে! তাহারা পলাইয়া গেল। তাহাদের কথা আর স্মরণ করিবার প্রয়োজন নাই।" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময় এরূপ ঘটনা প্রায়ই হইত। কারণ যে কার্য্যটী বা কথাটী বলিলে কাহারও প্রাণে দুঃখ হয়, সেরূপ ব্যবহার কখনই করিতে পারিতেন না বা করিতেন না। তখন পূর্ব্ববৎ ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন।

এইরূপে কয়েকদিন গত হইলে রামদাদা, পুলিনদাদা প্রভৃতি সকলেরই মত হইল যে বাবাজী মহাশয়কে একবার কলিকাতায় লইয়া যাওয়া যাক্, কারণ পুরীর যেরূপ অবস্থা, ইহাতে ইঁহার মনস্থির হওয়া দূরে থাক, ক্রমে অস্থির হইবার সম্ভাবনা। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইয়া একবারবাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলিলেন— "আমার কোনই আপত্তি নাই।" শুনিয়া সকলে হৃষ্টচিত্তে কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ অনেকে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, না জানি গাড়ীতে উঠিয়া কত মতলব প্রকাশ করেন বা পাগলামি করেন। কিন্তু কোনই অসুবিধা হইল না। গাড়ীতে উঠিয়াই—"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বায় পরিণতি, তাঁর শক্তি জীবে দেখাইতে। সেইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈলেন নিত্য লীলা হৈতে।" এই পদ গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পুরীর ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিয়া গাড়ীর দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। পুরীবাসী অনেক ভক্তগণ বাবাজী মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। যথাসময়ে গাড়ীর বাঁশী বাজিল। ইনিও "গৌর-হরিবোল" বলিয়া উঠিলেন। গাড়ী চলিতে চলিতে বলরাম বাবুকে

বলিলেন—"দেখ বলরাম! এক সপ্তাহের মধ্যে এই স্থান হইতে নানারূপ জিনিষ তৈয়ারি করাইয়া কর্ণার্কতীর্থে নবগ্রহের পূজা করাইবে। পরিমাণ একশত টাকার কম না হয়। বলরাম বাবু "যে আজ্ঞা!" বলিয়া প্রণাম করিলেন। এদিকে দ্রুতবেগে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে পুরীবাসী ভক্তগণ দুঃখিতচিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

——

কলিকাতা গমন ও কেদারবাবুর বাগানে অবস্থিতি

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী আসিয়া হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল। সঙ্গিগণ দরজা খোলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইত্যবসরে বাবাজী মহাশয় গাড়ীর জানালা দিয়া বাহির হইলেন। সঙ্গিগণের অনবধানতা হেতু ইঁহার মাথায় একটা পেরেকের আঘাত লাগিয়া রক্ত বাহির হইল। দেখিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইলেন। অতি সন্তর্পণে সকলে হাওড়া পুল পার করিয়া আনিলেন। গঙ্গার ঘাটের উপর একজন পরামাণিককে দেখিয়াই ঝোঁক ধরিলেন যে, "আমি ক্ষৌরী হইব।" পরামাণিকটী ইঁহার দর্শনে কেমন হইয়া গেল। প্রেমগদগদকণ্ঠে বলিল— "বাবা! আমি সর্ব্বসাধারণকে যে ক্ষুরে ক্ষৌর করি, সেই ক্ষুর আপনার মাথায় দিতে পারিব না। আপনি কৃপা করুন, আপনার আশীর্ব্বাদে যদি কখনও পুনর্ব্বার দর্শন পাই এবং আমার ভাগ্যে থাকে তবে আপনাকে ক্ষৌর করিব।" পরামাণিকের কথা শুনিয়া সঙ্গিগণের মনে বড়ই আনন্দ হইল; কারণ উঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এই অবস্থায় যদি পরামাণিক ক্ষৌর করিতে বসে, আর কোনও রকমে ইনি মাথা নাড়াচাড়া দেন তবে বড়ই বিপদ হইবে।

ইনি কিন্তু পরামাণিকের সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে! আমি জগতের সকলের অপেক্ষা হীন। আমাকে আজ তোমার ক্ষৌরী করিতেই হইবে।" সে সঙ্গিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একখানা তালপাতা দ্বারা ক্ষৌরের ভাণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে। আমার মাথার চুল কোথায়?" পরামাণিক বলিল—"আজ্ঞে! আপনার অপ্রাকৃত চুল অপ্রাকৃত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।" ইনি উহাদিগের মন জানিয়াই যেন একটু মৃদু হাসিয়া ঐ পুলের ঘাটে স্নান করিতে নামিলেন। একেবারে গঙ্গায় যমুনাভ্রম। এক একবার অবগাহন করিতেছেন, আর সাশ্রুগদগদকণ্ঠে যমুনার স্তব করিতেছেন। এইরূপে কিছুক্ষণ যায় হঠাৎ একজন "মা গঙ্গে! গতিদায়িনি! ভাগীরথি! পতিতপাবনি! দয়া কর মা! "সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥" এই বলিয়া যেমন স্তব করিতে লাগিলেন, অমনি ইনি চমকিতভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে মনে হইতে লাগিল যেন ইনি কোনও দেশ হইতে হঠাৎ অন্য দেশে আগমন করিয়াছেন। তখন ইনি আবার গঙ্গা স্তব করিতে করিতে পুনঃপুনঃ অবগাহন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুক্ষণ গঙ্গায় অবগাহন স্নান করতঃ সকলের অনুরোধে তীরে উঠিলেন। এদিকে ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করাই ছিল। সেই গাড়ীতে বসিয়া একেবারে বরাহনগর শ্রীযুক্ত কামাখ্যাদাস বাবাজী মহাশয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে রামদাদা, গোবিন্দদাদা, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও পুলিনবাবু প্রভৃতি অনেক লোক। কামাখ্যাদাস বাবাজী মহাশয় খুব উৎসাহের সহিত সকলের যত্ন চেষ্টা করিতেছেন। বাবাজী মহাশয়ের কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নাই। আত্মানন্দী আপন খেয়ালেই আছেন। কখনও বা বেশ ভাল ভাবে, লোকের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই কথা বলিতেছেন, বা নিজে তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেছেন, আবার কখনও বা একেবারে

নিরপেক্ষভাবে উদার ভাব অবলম্বন করিয়া নিষ্কিঞ্চন অবস্থা দেখাইতেছেন। কেহ কাপড় আনিয়া পরাইয়া দিল, কোনই আপত্তি নাই, হয় ত আবার ক্ষণকাল পরেই কাপড়খানি কাহাকেও দিয়া নিজে উলঙ্গ অবস্থায় রহিলেন। সর্ব্বদাই যেন উদাসভাবে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত চারি পাঁচ মিনিট পরে একটা উত্তর দিলেন। মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিয়া ঠিক বালকের ন্যায় ব্যবহারকরিতে থাকেন। সামান্য কিছু সেবা করিয়াই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সঙ্গিগণ অনেক রকমে ভুলাইয়া তবে মহাপ্রসাদ খাওয়াইতেছে।

এইরূপে সেদিন কামাখ্যাদাস বাবাজীর বাড়ী থাকিয়া পরদিবস ঐ বাড়ীরই সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কর্ম্মকার মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে গমন করিলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়াই যে সমস্ত গাছপালা বন্ধন অবস্থায় ছিল, তাহাদিগের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাগানের শোভা দর্শনে সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিলেন। বাগানে দুইখানি কোঠাঘর আছে, একখানি বড় এবং একখানি একটু ছোট। একটী পুষ্করিণী আছে। পূর্ব্বে তাহাতে একটী ঘাট ছিল; ইনি আর দুইটী ঘাট প্রস্তুত করাইলেন। তিনটী ঘাটে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং ললিতাকুণ্ড কল্পনা করিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যে পারে বাগানটী আছে, সেই পারের ঘাটকে রাধাকুণ্ড ও একপার্শ্বে ললিতাকুণ্ড এবং অপর পারকে শ্যামকুণ্ড কল্পনা করিয়া ঠিক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সিঁথির নীলরতনদাদার উপর রান্না করিবার আদেশ করিলেন। রজের* হাঁড়িতে রান্না করিয়া রাধাকুণ্ডের জলে রাত্রে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। পরদিবস আবার সেই হাঁড়ি মাজাইয়া তবে তাহাতে রান্না করিতে হইবে। রজের পাত্রেই ভোগ; রজের পাত্রেই খাওয়া দাওয়া সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল। কোন ধাতুপাত্র ব্যবহার করা একেবারে নিষেধ। একদিন

* মাটীর।

কামাখ্যাদাস বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আজ্ঞে! একবার যে মৃৎপাত্রে ভোগ হইয়াছে, দ্বিতীয়বার কি আবার সেই পাত্রে ভোগ হইতে পারে ?"

বাবাজী। কেন পারিবে না! যদি ব্রজেই বিশ্বাস না জন্মিল তবে উপাসনা হইবে কি লইয়া ?

কামাখ্যা। আজ্ঞে! রজ ত আর যথা তথা হইতে পারে না! ব্রজধামে রজের আদর, রজ-পাত্রের গৌরব আছে। তাই বলিয়া কি সর্ব্বত্রই এইরূপ হইবে ?

বাবাজী। কেন তোমরাই ত সর্ব্বদা পাঠ কর—"গৌরমণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস। গৌরমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল অভিন্ন।" এ সমস্ত কথা কি কেবল মুখস্থ করিবার জন্য, না ব্যবহার করিবার জন্য ? নিরপেক্ষভাব অবলম্বন না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। লোকাপেক্ষা করিতে গিয়াই আমরা প্রকৃত ধর্ম্মপথ হারাইয়াছি। শ্যাম এবং কূল দুই রাখিতে গেলে চলে কি ?

কামাখ্যাদাস বাবাজী আর কোনই কথা বলিতে সাহস করিলেন না। বাবাজী মহাশয় সর্ব্বদাই অকপট ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। নিজেও তজ্জাতীয় ব্যবহার করিতেছেন। যথাসময়ে স্নান আহার প্রভৃতি করাইবার জন্য গোবিন্দদাদা, রামদাদা বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাদা এবং নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী বাবাজী মহাশয়ের শরীর কিরূপে সুস্থ রাখিবেন, দিবানিশি এই চিন্তায় ব্যাকুল। শরীরের অনিষ্ট বা অসুস্থ-কারক কোনও স্বতন্ত্রতা করিতে গেলেই উঁহারা প্রাণপণে তাহার বাধা দিতে লাগিলেন। সুতরাং বাগানের মধ্যে উঁহাদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, "উহাদিগকে যে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করাইবে, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। আর তাহার মুখ দেখিব না।" সুতরাং সকলে ভয়ে ভয়ে আর উঁহাদিগকে ভিতরে আনিতে সাহস পাইলেন না। যে কোন ভদ্রলোক বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিবেন, তাঁহার উপর ইঁহার আদেশ যে কোনও-রূপ ঐশ্বর্য্যের জিনিষ সঙ্গে আনিতে পারিবেন না। ভুলক্রমে যদি ঘড়ি, চেন বা জামার বোতাম হাতে গলায় রাখিয়া কেহ উপস্থিত হইয়াছেন আর উপায় নাই। রাধাকুণ্ডের জলে আগে নিক্ষেপ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত। নানারূপ কঠিন কঠিন ব্যাধির জন্য কেহ বা গলায় কেহ বা হাতে মাদুলী ধারণ করিয়াছেন। দেখিবামাত্র তাহার সেই সমস্ত মাদুলী রাধাকুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করিবার আদেশ করেন। একদিন একজন হাঁপানী রোগীর মাদুলী ফেলিতে বলায় সে বলিল— "আজ্ঞে! মাদুলী ফেলিলে আমার হাঁপানী বেশী হয়, আমি কি করিব?" তখন ইনি বলিলেন, "কোনই চিন্তা নাই, ঐ রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ডের জলে— বেশ করিয়া ডুব দিয়া আইস, তোমার সমস্ত ব্যাধি ভাল হইয়া যাইবে।" বৃদ্ধ গলার মাদুলী জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া ডুব দিবামাত্র। তাহার সমস্ত রোগ ভাল হইয়া গেল। এইরূপ যে বিশ্বাস করিল সে ফল পাইল। যে না করিল সে বঞ্চিত হইল।

একদিবস একটী লোক কতকগুলি মোটা কাগজে নানাবিধ অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥ প্রাণগৌর নিত্যানন্দ॥ হরিবোল॥ হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" ইত্যাদি নামের ছাপা আনিয়া যেমন বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে দিল, অমনি ইনি তাড়া সহিত রাধাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তটী কিছু বিমর্ষভাবে ছাপাগুলি জলে ফেলিয়া দিল। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। ছাপাগুলি জলে ডুবিয়া গেল। মহাত্মা অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামিজীর শিষ্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দানন্দ পরিব্রাজক মহাশয় বলিলেন, "বাবা! আপনি সর্ব্বদা নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; আর আজ কি না

নামের অপমান করিলেন? সমস্ত নাম ডুবিয়া গেল!" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! নাম যদি নিত্য চিন্ময় হয়, তবে তাঁহার কখনই বিনাশ হইতে পারে না। নাম কি কখনও ডুবিতে পারে!"

গোবিন্দ। আজ্ঞে! এই যে আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম সমস্ত নাম ডুবিয়া গেল?

বাবাজী। ও কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য মাত্র। নামের শক্তি কোথায় যাইবে? বিশ্বাস হউক চাই নাই হউক।

শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। পরদিবস বেলা অনুমান আটটার সময় পূর্ব্বোক্ত নামের কাগজগুলি ভাসিতে ভাসিতে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী মহাশয় যে স্থানে বসিয়া আছেন, সে স্থান হইতে কাগজগুলির উপর দৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! নাম নিত্য, সত্য, অখণ্ড, অব্যয় কি না একবার রাধাকুণ্ডে গিয়া পরীক্ষা করতঃ সমস্তগুলি লইয়া আইস।" শুনিবামাত্র গোবিন্দানন্দ এবং অন্যান্য সকলে অতিশয় ব্যস্তসমস্তভাবে রাধাকুণ্ডের তীরে গিয়া অবাক্! যে ভক্তটী নামের কাগজ আনিয়াছিলেন, তিনি পরমানন্দে কাগজগুলি হাতে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! একদিন জলে থাকার দরুণ কোথায় সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে! এ কি না আরও দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হইল! হায় রে আমরা ঘোর অবিশ্বাসী! বাবাজী মহাশয়ের কথায় বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করি নাই তাহাতেই এইরূপ ফল হইল, যদি বিশ্বাস করিতাম তবে না জানি কতই ফল পাইতাম!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া নামের ছাপাগুলি ইঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক নিজ নিজ অবিশ্বাসী হৃদয়ের দুর্ব্বলতার কথা বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহাশয় নামের ছাপাগুলি লইয়া ঘরের বাহির ভিতর দেওয়ালে লাগাইয়া দিতে লাগিলেন। একজন আসিয়া গোবিন্দদাদা

এবং নিত্যস্বরূপ কি করিবেন বাবাজী মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ইনি উঁহাদের দুইজনকে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিতে আদেশ করিলেন। উঁহারা অগত্যা উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিলেন। একদিন সাতগাছিয়ার শ্রীকুঞ্জলাল গোস্বামী, বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া যেমন ইঁহারা সম্মুখে প্রণাম করিলেন অমনি বলিলেন, "কুঞ্জ! কিছু খাঁটি গব্য ঘৃত সংগ্রহ করা বিশেষ দরকার, কি হইবে বল দেখি?"

কুঞ্জ। আজ্ঞে। যশোহরের যে মাখন পাওয়া যায়, ঐ মাখন জাল দিয়া ঘি করিলে হয় না?

বাবাজী। সেই উত্তম হইবে। তুমি অতি শীঘ্র যাও। যে স্থানে খাঁটি মাখন বিক্রি হয়, সেই স্থান হইতে অন্ততঃ দশ বার সের মাখন আনা চাই। আগামী কল্য অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে।

শুনিয়া কুঞ্জ গোস্বামী করযোড়ে, "আজ্ঞে" বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক গমন করতঃ হুগলী নিবাসী শ্রীনবগোপাল দের অর্থসাহায্যে পনের সের মাখন লইয়া আসিলেন। মাখন পাইয়া বাবাজী মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে উহা দ্বারা ঘি তৈয়ারী করিতে আদেশ করিলেন। এদিকে নিজ মনোবৃত্তি অনুসারে অষ্টপ্রহরের যোগাড় করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রভাত হইতে না হইতেই বড় ঘরটীতে নাম আরম্ভ হইল। অপূর্ব্ব নামের ধ্বনিতে সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রমেই লোকসংখ্যা বেশী হইতে লাগিল। ঘরের মেঝেতে ঘি ঢালা হইতেছে, একপার্শ্বে একটী ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে। মধ্যস্থলে তুলসী বৃক্ষ এবং কয়েকখানি চিত্রপট দেওয়া হইল। তুলসী পরিক্রমা করিয়া নাম হইতেছে, মেজে এত পিছল হইয়াছে যে একটু দ্রুতগতি চলিতে গেলে কাহার সাধ্য ঠিক থাকে? কোনও কোনও ভাগ্যবান্‌কে মেজের উপর শয়ন করাইয়া চরণ দ্বারা দলিত করিতে লাগিলেন। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। দেওয়ালের উপর চারিদিকে বড় বড় অক্ষরে নানারূপ

নাম লেখাইয়াছিলেন। প্রদীপের কালী এবং ঘিয়ের ছিটাতে নাম সকল একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে এমন কি পড়িবার সাধ্য নাই। গোবিন্দানন্দ বলিলেন, "এইবার দেখা যাইবে নাম কেমন সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যবস্তু।" মনে ভাবিতেছেন" এ জল হইতে নামের কাগজ তোলা নয়, ঐ হাতে লেখা নামের উপর ঘৃত মাখা কালী লগিয়াছে।" কি আশ্চর্য্য। গোবিন্দানন্দ মনে মনে ভাবিতেছিলেন, কিন্তু বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি রে গোবিন্দ! মনে মনে কি ভাবিতেছিস? নামের উপর কালী পড়িয়াছে আর উঠিবে না; অতএব নাম সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, এই না? এ তোদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে নিত্য সে চিরকালই নিত্য। যে সর্ব্ব-শক্তিমান্ তাহার কি কোনও শক্তির অভাব থাকিতে পারে? নামের সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং ত্রিকালসত্যত্ব দেখাইবার জন্যই নিতাইচাঁদের এই সকল ভঙ্গী।" বলিয়া আরোপিত রাধাকুণ্ডের জল লইয়া এক একটী নামের ওপর ছাট মারিতে লাগিলেন। দুই একবার জল লাগিতে না লাগিতেই নাম পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় উজ্জল ভাব ধারণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া উপস্থিত লোকসকল অবাক্! তখন গোবিন্দানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি বাবা! নাম যে সর্ব্বশক্তিমান্ একথা ধারণায় আসিল? হায় রে কলিহত অবিশ্বাসী জীব! সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বস্তুকেও অবিশ্বাসের অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়া মোহময় সংসারে মিছা ভ্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না। নিত্য বস্তুকে যে, কেহ আবরণ করিতে পারে না এ ধারণা যে কেন স্থায়ী হয় না নিতাই জানেন।" এই কথা শুনিয়া একটি আগন্তুক ভদ্রলোক বলিলেন, "আজ্ঞে! আমরা ত প্রত্যক্ষ দেখিলাম যে নামের উপরে ঘৃত মিশ্রিত কালী ঢাকা পড়িল! তবে কি করিয়া সেটাকে ভ্রম মনে করিব?

বাবাজী। আচ্ছা যদি ঘৃতমিশ্রিত কালীই চাপা পড়িল, তবে তাহা একেবারে নির্দ্দোষভাবে ছাড়িয়া গেল কিরূপে?

ভদ্র। আমি ত দেখিলাম আপনার শক্তিপ্রভাবে পরিষ্কার হইল।

বাবাজী। এইটীই তোমাদের ভ্রম; স্বপ্রকাশ বস্তুকে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে কি?

ভদ্র। তাহাই যদি হয় তবে ত আমার মন আরও বেশী গোলে পড়িয়া গেল; ইহার যথার্থ সিদ্ধান্ত আমাকে বুঝাইয়া দিন।

বাবাজী। চৈত্রমাসে বেলা বারটার সময় একদিন আকাশে মেঘ হইল, হঠাৎ চারিদিকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া কোন লোক মনে করিতে লাগিল যে হয়ত সন্ধ্যা হইয়াছে কেহ বা বলিতেছে সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! কেহ বা বলিতেছে আজ সূর্য্যের তেজকে মেঘ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইত্যাদি যাহার যতটুকু ধারণা সে ততটুকু অনুভব করিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে। আচ্ছা যে সুবিচারক সে এই সমস্ত কথার কোনটীতে ভুলিতে পারে কি? সে বিচার করিয়া দেখিল, কি আশ্চর্য্য! প্রখর-কিরণ সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বড়। তাহাকে একখানা ক্ষুদ্র মেঘ কখনও আচ্ছাদন করিতে পারে না। সুতরাং ঐ মেঘখণ্ড আমাদের দৃষ্টিপথকে অবরোধ করিয়াছে। সূর্য যেমন তেমনই আছে। ইহাও ঠিক সেইরূপ জানিতে হইবে। কালী এরূপভাবে আমাদের দৃষ্টির পথ অবরোধ করিয়াছিল যে আমরা কিছুতেই নামের বর্ণ বা রূপ কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিলাম না। স্বপ্রকাশ নিত্য বস্তুকে, যদি অপরে আচ্ছাদন বা বিনষ্টই করিল, তবে আর তাহার নিত্যত্ব বজায় থাকে কি? ভগবান্ যেমন নিরূপাধি, নির্ব্বিকার, নিত্য সত্যবস্তু, তাঁহার নাম এবং ধাম উভয়ই তদ্রূপ। বিকার জিনিষ নাম, ধাম বা স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না, এইটীই সর্ব্বদার তরে সকলের স্মরণ রাখা দরকার।

ইত্যাদি নানারূপ তত্ত্বোপদেশ দ্বারা সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া পুনর্ব্বার নামকীর্ত্তনে যোগ দিলেন।

ক্ষণকাল পরে শ্রীকামাখ্যাদাস বাবাজী মহাশয় আসিয়া বলিলেন,

"আজ্ঞে! এই নাম মহাযজ্ঞে সকলেই উপস্থিত; কিন্তু রামদাদা কেবল বাহিরে আছেন, একবার আপনি অনুমতি করিলে তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।"

বাবাজী। সে কোথায় আছে?

কামাখ্যা। আজ্ঞে! এই বাগানের দরজায় বসিয়া নাম করিতেছেন আপনার আদেশ নাই, তাই ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন না।

বাবাজী। ও বড়ই স্বতন্ত্র; আমাকে পাগল বোধে আমার কার্য্যে বড়ই বাধা দেয়। উহাকে আনার দরকার নাই।

কামাখ্যা। আজ্ঞে! ভালবাসার পাত্রকে ঐশ্বর্য্যের চোখে দেখিলে ভালবাসা থাকে না। উঁহাদের বিশুদ্ধ ভালবাসা। উঁহারা আপনার শরীরের উপর কোনও অত্যাচার দেখিলে আর সহ্য করিতে পারেন না। কাজেই স্নেহের বশীভূত হইয়া আপনার কার্য্যে বাধা দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে যাঁহারা আপনার কথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন, তাঁহাদের কি কোনও স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে?

বাবাজী মহাশয় আর কোন উত্তর করিতে না পারিয়া রামদাদাকে ভিতরে আনিবার আদেশ করিলে কামাখ্যাদাস বাবাজী মহাশয় প্রফুল্ল হৃদয়ে গিয়া রামদাদাকে ডাকিয়া আনিলেন। রামদাদা আসিয়া দণ্ডবৎ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় উঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুজলে সিক্ত করিতে লাগিলেন। রামদাদাও অবনত মস্তকে অঝোরে ঝুরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় কখনও বা একেবারে উলঙ্গ, আবার কখনও বা ধুতি চাদর পরিয়া জামা গায়ে দিয়া আবার কখনও বা ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস পরিয়া বসিয়া থাকেন। হঠাৎ কি মনে হইল, প্রসাদী ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস আনাইয়া রামদাদাকে বলিলেন,—"রাম! এই নাও আজ তোমার ভেক হইল"— বলিয়া উহাকে ডোর কৌপীন পরাইয়া দিলেন এবং কর্ণে বৈষ্ণব সন্ন্যাসের মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তুলসীগাছ সহ একটী

টব্ ও একখানি পাঁচের লাঠি হাতে দিয়া আদেশ করিলেন—"যাও তোমার যত পরিচিত লোক আছে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস।" রামদাদাও গুরু-আজ্ঞা পালন করিয়া যথাসময়ে ইঁহার আদেশ-ক্রমে নামসংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। পরমানন্দে নাম চলিতে লাগিল! এক একবার এক একজন নূতন ভক্ত আগমন করিতেছেন, আর কাহাকে শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে স্নান, কাহাকেও বা জলস্পর্শ করাইয়া যে ঘরে নাম হইতেছে সেই ঘরের মধ্যে শয়ন করাইয়া চরণ দ্বারা দলিত করতঃ নামের মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন।

এইরূপে আনন্দে কোথা দিয়া যে, রাত্র কাটিয়া গেল কাহারই খেয়াল নাই। সকালবেলা নাম সমাপ্তি করিয়া একজন সঙ্গীকে প্রসন্নকুমার রায়বাহাদুরের নিকট হইতে পঞ্চতত্ত্ব, নিতাই-গৌর, রাধা-গোবিন্দ, হর-পার্ব্বতী, গৌর-গোবিন্দ প্রভৃতি চিত্রপট আনাইবার জন্য পাঠাইয়া এদিকে মালসা ভোগের যোগাড় করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে চিত্রপট আসিয়া পৌঁছিলে নিজ মনোভাবানুযায়ী ভোগের কার্য্য শেষ করতঃ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলেন।

কেদারবাবুর বাগানে অবস্থান-কালে বাবাজী মহাশয় এরূপ নিরপেক্ষ-ভাবে থাকিতেন যে, বিনা অনুমতিতে কাহারও কোনও কর্ম্ম করিবার সাধ্য ছিল না। এমন কি কতজনের পরিমাণ বা কি কি রান্না হইবে তাহা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা চাই। প্রায় প্রত্যহই সকালবেলা রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সাত আটজনের উপযোগী রান্না করিতে বলেন; কিন্তু ভোগের পরে রোজ প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাওয়া চাই। যদিও কোনও দিন কেহ উপস্থিত না থাকে, তবে নীলরতন প্রভৃতিকে পাঠাইয়া অন্ততঃ লোক ডাকিয়া আনান চাই। কোন কোনদিন কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, "আজ্ঞে! লোকজন ত বেশী হইবে, কিছু চাল, ডাল অধিক পরিমাণে রান্না করাইলে ভাল হয় না কি?" শুনিবামাত্র ইনি

একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "বাবা! যাহার যে কার্য্য সে তাহাই কর। তোমাদের রান্না করিয়া ভোগ দিবার কথা, ভোগ দিয়া যাও, প্রসাদের জন্য ত আর তোমরা দায়ী নও? নিতাইচাঁদের প্রসাদে কেহ বঞ্চিত হইয়া যায় কি? অথবা তোমরা যখন শেষে মহাপ্রসাদ পাও তোমাদের কিছু কম পড়ে কি?" সঙ্গিগণ নিরুত্তর! বাস্তবিকই ঐ সাত আটজনের উপযোগী মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পঁচিশ ত্রিশজনের প্রসাদ পাওয়া হইত। একদিনের জন্য কাহারও একমুষ্টি কম হয় নাই। এইরূপ নানাবিধ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য মিশ্রিত লীলখেলায় পরমানন্দে দিন যাইতে লাগিল।

একদিন শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। উঁহার হাতে সোনার আঙটী এবং সোনার তারে নানাজাতীয় সোনার মাদুলী এবং ঘড়ি, চেন প্রভৃতি সঙ্গে রহিয়াছে। যেমন বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, অমনি আদেশ হইল, "কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্রখানি ছাড়া আর যাবতীয় বস্তু রাধাকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।" কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে একটু দাঁড়াইয়া পরে —"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" পাঠ করিতে করিতে সমস্ত বস্তু রাধা-কুণ্ডের মধ্যস্থলে সজোরে নিক্ষেপ করতঃ বাবাজী মহাশয়ের নিকট আগমন-পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিকটে বসিলেন। নানারূপ তত্ত্বকথার আলোচনা হইতেছে। অনুমান দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কত লোকের যে ঘড়ি, চেন, আংটী, হার ও মাদুলী রাধাকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, তাহার সংখ্যা নাই। এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে কাব্যতীর্থ মহাশয় মনে মনে ভাবিতেছেন—"বাবাজী মহাশয়ের এ আবার কি রকম খেয়াল! কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। মন যদি বন্ধনমুক্ত না হইল, তবে বাহিরের বস্তু পরিত্যাগে ফল কি? আবার এতগুলি টাকারজিনিষ যদি কোনও সৎকার্যে লাগান যাইত তবুও ভাল হইত, জলে ফেলিয়া কি ফল হইতেছে। তবে কি বাবাজী মহাশয়ের কোনওরূপ মস্তিষ্কবিকৃতি

জন্মিয়াছে? কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না” ইত্যাদি। এদিকে বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“কিহে কাব্যতীর্থ। অতগুলি টাকার জিনিষ জলে ফেলার দরুণ অযথা কষ্ট হইল বলিয়া মনে দুঃখ হইয়াছে? আচ্ছা! বলিয়া একলম্ফে রাধাকুণ্ডের জলে নামিলেন এবং ঘাটের কাছে একটি ডুব দিয়া কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যাবতীয় জিনিষ এবং তৎসময়ে যে কয়েকজনের ঘড়ি, চেন আঙটি, হার ইত্যাদি ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত উঠাইয়া আনিলেন। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের জিনিষ কয়েকটী হাতে করিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—“কেমন এই বস্তুগুলি তোমার ত?” উপস্থিত লোকসকল একেবারে অবাক! কাব্যতীর্থ মহাশয় নীরব হইলেন। জনান্তিকে সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতেছেন—“কি আশ্চর্য্য! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিক্ষিপ্ত যাবতীয় বস্তু একস্থান হইতে একডুবে কি করিয়া উঠিল? এ ত নিশ্চয়ই অমানুষিক ব্যাপার বই আর কিছুই নহে।” কিছুক্ষণ পরে কাব্যতীর্থ মহাশয় সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন,—“আজ্ঞে! আমি যে আমার ঐ কয়েকটা দ্রব্যের জন্যই ঐরূপ মনে করিয়াছি তাহা নহে, তবে আপনার মহিমা বুঝিতে না পারিয়া মনে নানারূপ কল্পনার উদয় হইয়াছিল। সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ঐ সমস্ত দ্রব্য যাহা ইচ্ছা করুন আমার কোন আপত্তি নাই।” বাবাজী মহাশয় সে কথা না শুনিয়া দ্রব্যগুলি উহাকে দিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, সম্প্রতি এ সমস্ত তোমার নিকটেই থাক্— যখন আমার প্রয়োজন হইবে তখন আবার চাহিয়া লইব।” কাব্যতীর্থ মহাশয় আর কোনও উত্তর করিতে না পারিয়া অগত্যা সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিলেন।

একদিন বাবাজী মহাশয় বসিয়া আছেন, অন্যান্য কয়েকজন বাহিরের ভক্ত ভদ্রলোক বসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন, ইনিও হাসিমুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। এই সময় হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক বড়ই ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ইঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সকলেই শশব্যস্ত ; বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মা ! তোমার কি হইয়াছে ?"

স্ত্রীলোক। বাবা! আমার একটী মাত্র পুত্র, আর ত্রিজগতে কেউ নাই। সেই অন্ধের যষ্টিখানির প্লেগ হইয়াছে ; বাঁচিবার কোনই আশা নাই, আপনার নিকট আসিয়াছি। হয় আমার সেই ছেলেটীকে বাঁচাইয়া দিন, না হয় আমার এই ছার প্রাণ নাশের কোনও উপায় করিয়া দিন, আমি আপনার চরণে এই ভিক্ষা চাই।

বাবাজী। ভয় কি মা! নাম কর গিয়া এবং রজ চরণামৃত দাও, মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন।

স্ত্রীলোক। বাবা! আমি ওসব কথা শুন্‌তে চাই না, আমি কিছুই করিতে পারিব না। আপনার যাহা ইচ্ছা করুন। যদি তাহাকে রক্ষা করিয়া না দেন, তবে এই আপনার চরণে আত্মহত্যা করিয়া এই শোক-সাগর হইতে উত্তীর্ণা হইব।

বলিয়া আরও ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিল। উহার কাতর ক্রন্দনে সকলেই বিকল হইলেন। বাবাজী মহাশয়ও উহাকে নানারূপ প্রলোভনে প্রত্যাখান করিতে না পারিয়া অগত্যা বলিলেন—"তোমার ছেলেকে এইস্থানে আনিতে পারিবে কি ?"

স্ত্রীলোক। আজ্ঞে! আপনি যদি বলেন আমি আনিয়া দিই।

বাবাজী। আচ্ছা, লইয়া আইস।

স্ত্রীলোকটী শশব্যস্তে বাড়ী গিয়া ছেলেটীকে লইয়া আসিল। ছেলেটীর বয়স অনুমান দশ বৎসর হইবে। আনিবামাত্র ইনি স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন—"যা ঐ রাধাকুণ্ডের জলে উহাকে ছাড়িয়া দে।" দৃঢ় ভক্তিমতী স্ত্রীলোকটী উঁহার আদেশানুযায়ী ঘাটে গিয়া জলের মধ্যে ছেলেটীকে ছাড়িয়া দিল। করুণাময়ের কৃপায় তিন চারি মিনিটের মধ্যে বালকটী নিজ শক্তিতে তীরে উঠিলে উহার মা হারানিধি পাইয়া বালকের হাতে

ধরিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে সমর্পণ করিল। বাবাজী মহাশয়ও বালককে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ উহার মাকে বলিলেন, "মা মা! তুই ঐ রাধাকুণ্ডে ডুব দিয়া নিতাইএর কৃপাদত্ত বালক লইয়া বাড়ী যা, আর কোনও ভয় নাই।" স্ত্রীলোকটী ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক যথাদিষ্ট কার্য্য করিল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া একেবারে বিমুগ্ধভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক সাশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগের মায়ামোহ দূর করতঃ চির জীবনের মত আপনার শ্রীচরণতলে কিঙ্কর করিয়া রাখুন। আর আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। কি করিলে প্রাণে দৃঢ়তা জন্মে, আমাদিগকে সেই উপদেশ প্রদান করুন। আমরা সাক্ষাৎ দেখিলাম, একমাত্র দৃঢ়তার বলে একটী অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক তাহার মৃত পুত্রকে বাঁচাইয়া লইল! ধিক্ আমাদের কুল, মান, বিদ্যার গৌরবে! ধিক্ আমাদের অবিশ্বাসী হৃদয়ে!" বলিয়া ঠিক বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয় মিষ্ট বাক্যে উঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! ধন্য কলিযুগ! অন্যান্য যুগের ন্যায় এ যুগে অত কঠোর সাধন করিতে হইবে না। মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

ভক্ত। নামে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে কিরূপে?

বাবাজী। নাম সর্ব্বশক্তিমান্। একমাত্র নাম হইতেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। কলিযুগে অন্য কোন সাধন নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।

নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তিসাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥" ইত্যাদি।

মোট কথা— নাম কল্পতরু! যাহার যাহা অভিলাষ, নাম তাহা পূরণ করিয়া থাকেন।

ভক্ত। আচ্ছা, নাম ত ত্রিকালসত্য? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে বর্ত্তমান এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। তবে কেন যুগানুসারে ফলের তারতম্য হইবে?

বাবাজী। নামের ফলের বিশেষ তারতম্য না থাকিলেও প্রক্রিয়ার তফাৎ আছে। কারণ সত্যযুগের লোক যেমন দীর্ঘায়ুঃ, ধ্যাননিষ্ঠ, সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন এবং দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্, ত্রেতাযুগের লোক সর্ব্বাংশেই তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম! এইরূপ ত্রেতা অপেক্ষা দ্বাপর এবং দ্বাপর অপেক্ষা কলিযুগে অনেক কম। কলির জীব অল্পায়ুঃ, অন্নগতপ্রাণ এবং কোমল শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সুতরাং অন্যান্য যুগের ন্যায় কঠোর সাধন ইহাদের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই প্রভু তেমনি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে যে তারতম্য দেখা যায়, অর্থাৎ অন্যান্য যুগে বহু বহু সাধন করিলেও যে বস্তু অপ্রাপ্য ছিল, কলিযুগের জীব অবিশ্বাসী, কোমলশ্রদ্ধ, অল্পায়ু এবং আচার বিহীন হইয়াও অসাধনে অনায়াসে সেই বস্তু লাভ করিল; এইটী কিন্তু কলিজীবের প্রতি প্রভুর কৃপা। যেমন— অসমর্থ ও অজ্ঞান সন্তানের প্রতি পিতামাতার কৃপার আধিক্য থাকে, তেমনি আমাদের প্রতি প্রভুর কৃপা। এইটীকে যদি কেহ সাধনগত বলেন, সেইটী ভুল। এইটী কৃপাগত। তাই শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

ইত্যাদি নানারূপ তত্ত্বকথা-আলোচনার পর ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বাবাজী মহাশয়ও নিজ নিত্যকৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই লোকে লোকারণ্য। কাহারও চক্ষুরোগ, কাহারও হাঁপানী, অম্লশূল ইত্যাদি নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত লোকসকল আসিতেছে। চিকিৎসকের কিন্তু ঐ একই ঔষধ। কোন রোগী কাতর প্রাণে বলিল—"আজ্ঞে! আমার হাঁপানীর অসুখ, এই দেখুন কত যে মাদুলী পরিয়াছি ঠিক নাই।"

বাবাজী মহাশয় অমনি বলিলেন—"আচ্ছা, এতদিন ত অনেক মাদুলী পরিয়া দেখিলে, এইবার সবশুদ্ধ ঐ রাধাকুণ্ডের জলে ফেলিয়া ডুব দিয়া বাড়ী যাও, সমস্ত ভাল হইয়া যাইবে।" যিনি কথায় বিশ্বাস করিয়া ডুব দিলেন, তাঁহার রোগ ভাল হইয়া গেল; যিনি কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না তিনি বঞ্চিত হইলেন।

একদিন বেলা অনুমান নয়টা, এই সময় দুইটী স্ত্রীলোক আন্দাজ বার বৎসরের একটী ছেলেকে ধরাধরি করিয়া আরোপিত রাধাকুণ্ডের তীর পর্য্যন্ত আনিল। ছেলেটী আর চলিতে পারিল না— একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। অজ্ঞাতসারে জলের ন্যায় কতকটা দাস্ত হইয়া গেল। ছেলেটীর কথা বলিবার সাধ্য নাই, শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, হাত পায়ে খিল ধরিতেছে এবং অজস্র ঘর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্কা স্ত্রীলোকটী ব্যাকুলভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"বাবা! আমার একটী মাত্র পুত্র। গত রাত্রি হইতে তাহার অনবরত দাস্ত এবং বমি হইতেছে। আমার ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া আপনার নিকট আনিতেছিলাম; কিন্তু ঐ পুত্র পুষ্করিণীর পাড় পর্য্যন্ত আসিয়া একেবারে

অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে জলের মত দাস্ত হইয়া গেল। জানি না বাবা! দুঃখিনীর অঞ্চলের ধন এতক্ষণ প্রাণে বাঁচিয়া আছে কিনা! আপনি একবার কৃপা করিয়া তাহার মস্তকে চরণধূলি দিন, সে বাঁচিয়া উঠুক।" বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরদুঃখে কাতর করুণহৃদয় বাবাজীমহাশয়ের হৃদয় দ্রবিল। ধীরে ধীরে বলিলেন—"মা! আমি কি করিব? ডাক্তার কবিরাজ দেখাও। না হয় ত বিশ্বাস পূর্ব্বক রজ চরণামৃত দাও পরমায়ুঃ থাকে ভাল হইবে।" স্ত্রীলোকটী ইঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "বাবা! আমি রজও জানি না চরণামৃতও জানি না; যাহা করিতে হয় আপনি করুন। আমি অনাথা; আমার একমাত্র সম্বল ঐ ছেলেটী আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম। আপনি আমায় রাখিতে হয় রাখুন মারিতে হয় মারুন।" তখন বাবাজী মহাশয় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন,—"চল্ কোথায় তোর ছেলে দেখি গিয়া।" বলিতেই স্ত্রীলোকটী মৃতদেহে প্রাণ পাইবার মত শশব্যস্তে উঠিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ছেলেটীর কাছে গিয়া দেখেন উহার অবস্থা খুব খারাপ। এমন কি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ লক্ষ্য না করিলে শ্বাস চলিতেছে কিনা জানা যায় না। বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "মা! তোর ছেলের অবস্থা ত খুবই খারাপ, এখন কি কর্‌বি?"

স্ত্রীলোক। বাবা! ও আমার নয়, আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। আমি কিছুই জানি না; আপনি যাহা করিতে হয় করুন।

বাবাজী। আচ্ছা, তবে দুইজনে ধরাধরি করিয়া এই রাধাকুণ্ডের জলে নামাইয়া দে ত।

স্ত্রীলোক দুইটী অবিচারে ধরাধরি করিয়া বালকটীকে আরোপিত রাধাকুণ্ডের জলে নামাইলে বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"ঐ জলের মধ্যে তোরাও ডুব দে, উহাকেও ডুব দেওয়া।" উহারা তাহাই করিল। প্রথম

ডুবে কিছুই বুঝা গেল না ; দ্বিতীয় ডুবে ছেলের চৈতন্য হইল— চক্ষু মেলিয়া চারিদিক তাকাইতে লাগিল দেখিয়া বাবাজী মহাশয় বলিলেন, "আর একটী ডুব দিয়া ঘরে চলিয়া যা।" স্ত্রীলোক দুইটী তৃতীয় ডুব দিতে গেলে ছেলেটী বলিল—"তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি নিজে ডুব দেই।" তাহাই হইল। ছেলে আপন ইচ্ছায় ডুব দিয়া তীরে উঠিল। স্ত্রীলোক দুইটী উঠিয়া তিনজনে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হইয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে পতিত হইল। বাবাজী মহাশয় গদগদকণ্ঠে **জয় নিতাই! জয় নিতাই!** বলিয়া উহাদিগকে বাড়ী যাইতে আদেশ করিয়া নিজের বসিবার স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। এই সময়ে একটী অন্ধ আসিয়া বলিল— "বাবা! আমার চক্ষু দুইটী ভাল করিয়া দিন, আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি।"

বাবাজী মহাশয় অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"যা ঐ রাধাকুণ্ডে ডুব দিয়ে আয়!" সে অবিলম্বে ডুব দিয়া ইঁহার নিকটে আসিল। ইঁহার সম্মুখে একটী হুকার ছিচ্‌কা ছিল। ঐ লৌহশলাকা দ্বারা যেমন অন্ধের চক্ষু দুইটী দুইবার মাজিয়া দিলেন, অমনি সে দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইল। সে কাতর প্রাণে ইঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলে ইনি আদেশ করিলেন,—"যাও প্রাণ ভরিয়া নিতাইচাঁদকে ডাক— আর কোন বিপদ হইবে না।" বলিয়া উহাকে বিদায় দিলেন। নিজেও যথাসময়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। এই সময় ইনি প্রায়ই উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন।

একদিন কলুটোলা নিবাসী শ্রীকুঞ্জবিহারী মল্লিকের মা একজোড়া গরদের কাপড় এবং নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বাবাজী মহাশয় উঁহাকে দেখিবামাত্র "মা মা" বলিয়া ঠিক বালকের ন্যায় যেমন নিকটে গিয়াছেন, মা অমনি গরদের কাপড় যোড়া পরাইয়া কোলে বসাইলেন। এদিকে মায়ের আনা দ্রব্যসকল ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইলে মা নিজ হস্তে ইঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। ইনিও ঠিক বালকের ন্যায়

আবদার করিয়া খাইতে লাগিলেন। একটী ব্রাহ্মণ এই বাৎসল্যরসের খেলা দেখিতেছিলেন, আর পুনঃ পুনঃ বাবাজী মহাশয়ের পরিধেয় গরদের কাপড় যোড়াটীর উপর লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ থাকিয়া যেমন কুঞ্জবাবু এবং উহার মাতা ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন, অমনি ইনি কাপড় যোড়াটী খুলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অভিলষিত বস্তু পাইবামাত্র পরমানন্দে পরিধান করিয়া ইঁহার অন্তর্য্যামিত্ব এবং দাতৃত্ব শক্তির জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

একদিন সুপ্রসিদ্ধ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ দত্ত এই দুইজনে বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। উভয়ের গলায়ই হাঁপানীর মাদুলী রহিয়াছে। ব্রজবাবুর মাদুলীটীর এমনই গুণ যে উহা গলা হইতে খুলিবামাত্রই হাঁপানী আরম্ভ হয়। দৈবক্রমে উঁহাদের মাদুলীর উপর বাবাজী মহাশয়ের দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিবামাত্র বলিলেন— "তোমাদের গলার মাদুলী অগ্রে রাধাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া আইস, তবে অন্য কথা হইবে।" ব্রজবাবু বলিলেন—"আজ্ঞে! আমার গলা হইতে মাদুলী খুলিবামাত্রই ভয়ানক হাঁপানী হয়।" বাবাজী মহাশয় বলিলেন— "আচ্ছা, রোগ থাকিলে ত ঔষধ চাই, আর যদি রোগ না থাকে?" তখন অমরকৃষ্ণবাবু বলিলেন— "আজ্ঞে! রোগ না থাকিলে আর ঔষধের প্রয়োজন কি?" বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"আচ্ছা, তোমরা মাদুলী ফেলিয়া দাও, রোগ হইলে নিতাইচাঁদ বুঝিবেন।" বলিতেই উঁহারা দুইজনেই নিজ নিজ গলার মাদুলী খুলিয়া রাধাকুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করিলেন। প্রথমে ব্রজবাবুর একটু ভাবনা হইয়াছিল যে কি জানি কি হয়। দুই তিন ঘণ্টা সময় বাবাজী মহাশয়ের সহিত নানারূপ তত্ত্বকথা হইতে লাগিল। কোন কিছু টের না পাইয়া বাবাজী মহাশয়ের কথায় ব্রজবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সেইদিন হইতে ঐ দুইজনের আর কখনও হাঁপানী হয় নাই।

একদিন হাওড়াকাসুন্দে গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাস নামক জনৈক ভক্ত বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে আসিলেন। উঁহার সঙ্গে জামা কাপড় ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত কামাখ্যা দাস বাবাজী মহাশয়ের বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছেন। ভক্তটী খুব আফিম খাইতেন। আফিমের কৌটাটীও বিশেষ যত্নসহকারে জামার পকেটে রাখিয়া আসিলেন। ভক্তটী একদিন ভাত না খাইয়া থাকিতে পারেন ; কিন্তু নিয়মিতভাবে আফিম না খাইলে কিছুতেই থাকিতে পারেন না। খালি গায়ে বাবাজী মহাশয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যেমন নিকটে বসিলেন, অমনি বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন— "অনুকূল! তোমার নিকট আফিম ছিল কি করিলে ?" অনুকূল একটু অপ্রতিভের ন্যায় বলিলেন— "আজ্ঞে! কামাখ্যা দাদার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি।" বাবাজী মহাশয় অমনি একজনকে আদেশ করিলেন— "দেখ, কামাখ্যা দাসের বাড়ীতে অনুকূলের জামার পকেটে একটী আফিমের কৌটা আছে শীঘ্র লইয়া আইস ত ?"

অনুকূল। আজ্ঞে! আমি যাই ?

বাবাজী। না বাবা! তুমি থাক।

আদিষ্ট ব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আফিমের কৌটা লইয়া আসিলে বাবাজী মহাশয় কৌটাটী খুলিয়া অনুকূলকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ইহাতে কত আফিম আছে ?"

অনুকূল। আজ্ঞে! গত কল্য একভরি কেনা হইয়াছিল। চারি আনা খরচ হইয়াছে, আর বার আনা আছে। আমার এমনই কুঅভ্যাস হইয়াছে উহা না খাইলে উঠিতে পারি না। এমন কি ভাত জল না হইলেও চলে, কিন্তু আফিম না হইলে চলে না।

বাবাজী মহাশয় উহার কথাগুলি শুনিতেছেন, আর আফিমের ডেলাটী গোল করিতেছেন। অনুকূলবাবুর কথা শেষ না হইতেই "জয় নিত্যানন্দ রাম" বলিয়া বার আনা ওজন আফিমের ডেলাটী মুখে ফেলিয়া দিলেন

এবং অনুকূলবাবুকে বলিলেন— "যাও আর তোমায় আফিম খাইতে হইবে না।" কি আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্ত্ত হইতে অনুকূলবাবুর অন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, দুশ্চ্ছেদ্য আফিমের নেশা ছাড়িয়া গেল। তিনি বলেন যে "গুরুদেবের কৃপায় সেইদিন হইতে ভ্রমেও আমার আফিমের কথা মনে হয় নাই। এমন কি কখনও যে আমি আফিম খাইতাম তাহাও ধারণায় আসে নাই বা শরীরের কোনও গ্লানি উপস্থিত হয় নাই।"

একদিন প্রাতঃকালে— ইঁহার কি ঝোঁক হইল— কিছু খাঁটি গব্য ঘৃত আনাইয়া একশত আটবার ধৌত করাইয়া রাখিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল— "আজ্ঞে! এ ঘৃত কি হইবে?" বাবাজী মহাশয় একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন— "একটী বিশেষ প্রয়োজন আছে, পরে দেখিতে পাইবে!" চারি পাঁচদিন যায় একদিন কলুটোলার কুঞ্জবাবু আসিলেন। তাঁহার মাথায় এবং মুখময় ভয়ানক ঘা হইয়াছে। ঘাগুলি বিষাক্ত ঘা; ডাক্তারী কবিরাজী এবং গাছ গাছ্ড়া প্রভৃতি অনেক রকম ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। যন্ত্রণাও যথেষ্ট হইতেছে। জানি না আজ তিনি কি ভাবিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। আসিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় বলিলেন— "আজ কয়দিন হইতেই নিতাইচাঁদ এই ঘায়ের ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন। আপনি না আসার দরুণ দেওয়া হয় নাই।" কুঞ্জবাবু বলিলেন— "আমি ত অনেক চেষ্টা করিলাম কিছুই ফল হইল না, এখন আপনার দয়া।" বাবাজী মহাশয় সেই শত ধৌত ঘৃত আনাইরা ফণী দ্বারা ক্ষতস্থানে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলেন এবং সাধারণের বিশ্বাসের জন্যই হউক অথবা প্রতিষ্ঠার হাত হইতে বাঁচিবার জন্যই হউক, বাগান হইতে যা তা একটা গাছের পাতা হাতে কচ্লাইয়া উহার রস ক্ষতস্থানে দিবামাত্র যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া গেল এবং তিন দিনে সম্পূর্ণরূপে ঘা শুকাইয়া গেল। কেদারবাবুর বাগানের অবস্থানকালে এইরূপ কত কত যে অসাধ্য ব্যাধি ইঁহার কৃপাকটাক্ষে ভাল

হইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই।

একদিন উলঙ্গভাবে বসিয়া আছেন, দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ এবং কয়েকটী শিক্ষিত ভদ্রলোক কাছে বসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন, এই সময় ভাটপাড়া নিবাসী একজন পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় আসিবামাত্র বাবাজী মহাশয় এবং অন্যান্য সকলেই প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। তিনিও যথাযোগ্য প্রতিপ্রণাম ও আশীর্ব্বাদাদি করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। সকলকে নীরব দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন— "আপনাদের কি কথা হইতেছিল, আমার আসার দরুণ কোনরূপ ব্যাঘাত হইল কি?" কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিলেন— "আজ্ঞে না ব্যাঘাত হইবে কেন? বরং আপনার আগমনে কথার আরও সুমীমাংসা হইবে। কারণ আমার বিশ্বাস— কথার প্রতিবাদ না হইলে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হইতেছিল। এই মাষ্টার বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন— "শ্রীগৌরাঙ্গ কে?" অতএব আপনি শাস্ত্রানুসারে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিন।

পণ্ডিত। আপনারাই বলুন।

কাব্যতীর্থ। আজ্ঞে না আপনিই বলুন।

পণ্ডিত। আমি বলিতে গেলে ত শাস্ত্র ছাড়া বলিতে পারিব না।

কাব্যতীর্থ। আমরাও তাহাই শুনিতে চাই।

বাবাজী মহাশয় কিন্তু চুপ করিয়া আছেন, কোন কথাই বলিতেছেন না। পণ্ডিত পণ্ডিতেই কথাবার্ত্তা হইতেছে।

পণ্ডিত। গৌরাঙ্গ একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত। এমন কি সিদ্ধ বলিলেও বলা যায়। অনেক দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েতর অনেক নীচ শ্রেণীর লোক উঁহাকে খুব ভক্তি করিত; এমন কি কেহ ভগবানের অবতার বলিয়াও উঁহাকে স্তবাদি করিত। নিজে বৈয়াকরণ ছিলেন, তবে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল এবং ব্যাকরণে

বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাই ঐ ব্যাকরণের বলে অনেক সময় অন্যান্য শাস্ত্রের এক একস্থানের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; তবে সন্ন্যাসোচিত কোনই আচরণ ছিল না। বেদান্ত অধ্যয়ন করেন নাই, বা তদুচিত উপাসনা করিতেন বলিয়াও মনে হয় না। জাতিবিচার একেবারেই মানিতেন না। সকলের সহিত একত্রে আহারাদি করিতেন। এমন কি যবন পর্য্যন্ত তাঁহার দলভুক্ত ছিল।

মাষ্টারবাবু বলিলেন,— "আজ্ঞে! শুনিয়াছি অনেক বড় বড় পণ্ডিত এবং কাশীবাসী বড় বড় সন্ন্যাসীরাও ত উঁহাকে ভগবান বলিয়াছেন।"

পণ্ডিত। বাবা! কলিযুগ, আজকাল সমাজশাসন একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। যাহার যেদিকে স্বার্থসিদ্ধি হইল সে সেইদিকে চলিলেন। ধর্ম্ম বা আচারগত যে একটা নিষ্ঠা সে ত প্রায়ই দেখা যায় না। যদি কেহ করিতে যায় তাহাকে ইংরাজী শিক্ষিত লোকসকল অসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

কাব্যতীর্থ। কেন, গোস্বামীগণ ত শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার বলিয়া অনেক শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাইয়াছেন।

পণ্ডিত। ও সব কথা ছেড়ে দিন। আপনি ত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আপনি বলিতে পারেন কলিতে বুদ্ধ এবং কল্কি অবতার ভিন্ন আর কোনও অবতারের কথা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে কি? শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা বা ইতিহাসাদি শাস্ত্র ছাড়া নিজ নিজ কল্পিত মত কে শুনিবে? উঁহারা নিজ নিজ মত সংস্থাপনের জন্য কতকগুলি বাঙ্গলা পয়ার রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ উহাকেই শাস্ত্র বলিয়া থাকে। আজ-কালকার ছাপা বই-এর মধ্যে জীব গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির রচিত দুই একখানি সংস্কৃত বই বাহির হইয়াছে শুনিতে পাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র এত রহিয়াছে যে এক জীবনে দেখিয়া শেষ করা কঠিন, তারপর আবার নূতন শাস্ত্র!

কাব্যতীর্থ। কেন উঁহারাও ত পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতির প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

পণ্ডিত। ওসব করা বৃথা। একবার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে এই গৌরাঙ্গ লইয়া খুব বিচার হয়। ভুবন বিদ্যারত্ন, ন্যায় পঞ্চানন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন কেবল গৌরাঙ্গের দিকে ছিলেন। রাজা কোন স্থির সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া হাত চালানের ব্যবস্থা করিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, হাত চালানে যাহা উঠিবে আমরা তাহাই মানিব। তখন হাত চালান হইলে উহাতে একটী শ্লোক উঠিল—"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ।" এই শ্লোকে বেশ স্পষ্টই বুঝা গেল যে গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্ত।

কাব্যতীর্থ। আচ্ছা, এই সব বিষয়ের মীমাংসা একবার বাবাজী মহাশয়ের নিকট শুনিলে ভাল হয় না কি?

পণ্ডিত। তা বেশ ত। কোনও শাস্ত্র প্রমাণাদি থাকে উনিই বলুন না কেন।

বাবাজী। বাবা! আমি ত আর কোনও শাস্ত্রাদি জানি না যে আপনাদের সহিত তর্কবিতর্ক করিব।

পণ্ডিত। না বাবা! তর্কবিতর্ক করিবার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রের কথা সকলকেই মানিতে হইবে।

বাবাজী। সহজে সকলে মানে কি?

পণ্ডিত। কেন মানিবে না? আপনি বলুন।

বাবাজী। আমার কথায় যেন কেহ রাগ করিবেন না! শাস্ত্রের প্রমাণ পরে হইবে, আপনি যে হাত চালা শ্লোকটী বলিলেন, ঐটীরই প্রকৃত অর্থ করুন দেখি।

পণ্ডিত। গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্ত এব পূর্ণো ন চ, অংশকো ন চ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ একজন ভগবদ্ভক্ত; কিন্তু পূর্ণও নহেন অংশও নহেন।

বাবাজী। আচ্ছা, ভগবদ্ভক্ত কি ভগবানের অংশ নহেন ? ভগবদংশ ছাড়া জগতে কোনও বস্তু আছে কি ? গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

ঐ গীতায়ই ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন— "অর্জ্জুন ! তোমাকে অধিক আর কি বলিব ?— ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।" তবেই দেখুন, আপনার ঐ অর্থ করিতে গেলে অংশ পদটী অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয় কিন্তু একটু ভাবিয়া বলিলেন—"আচ্ছা আপনি কি অর্থ করেন একবার শুনি, পরে যাহা হয় বলিব।"

বাবাজী। গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ, অংশকো ন চ, অপিতু পূর্ণ এব।

পণ্ডিত। আপনার এই অর্থেও ত অংশ ও ভক্ত এই দুই শব্দের একটী নিষ্প্রয়োজন হইল।

বাবাজী। তাহা হইবে না, কারণ, কেহ বলিতেছেন যে "শ্রীগৌরাঙ্গ অংশাবতার।" কেহ বলিতেছেন— "না না তিনি ভক্ত।" একশ্রেণীর লোক বলিতেছেন— "তিনি পূর্ণ পূর্ণতম। তাই পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর লোককে নিরাস করিবার জন্য 'ভক্তো ন চ, অংশকো ন চ' কথা বলা হইয়াছে।

পণ্ডিত। আমার অর্থে দুই পক্ষে নিরাস হইতে পারে না কি ?

বাবাজী। "যদি গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তঃ" এই বাক্যে সমর্থনকারী কোনও পুরাণ-ইতিহাসাদির প্রমাণ থাকিত, তবে আপনার বাক্য স্বীকার্য্য হইত। যখন এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই এবং "গৌরাঙ্গঃ পূর্ণ এব" এই বাক্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন আপনারা স্বীকার করিবেন না কেন ?

পণ্ডিত। আচ্ছা, সেই প্রমাণগুলি একবার আমি শুনিতে পারি কি ?

বাবাজী। কেন পারিবেন না। বহু বহু প্রমাণ রহিয়াছে। তন্মধ্যে আমি সামান্য দুই চারিটী মাত্র দেখাইতেছি,—

সহস্রনামস্তোত্রে ঃ—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী

এই সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ ইত্যত্র মুণ্ডকোপনিষদি— যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং, কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি ॥

পুনশ্চ সহস্রনামস্তোত্রে ঃ—

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।

বিশ্বসারতন্ত্রে উত্তরখণ্ডে একাদশ পটলে ঃ—

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি ॥
জনিষ্যতি প্রিয়ে, মিশ্রপুরন্দরগৃহে স্বয়ম্।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ।

অনন্তসংহিতায় ঃ—

বৃন্দাবনে সদা কৃষ্ণমানন্দসদনে মুদা
বামে চ রাধিকা দেবী স্থিত্বা রময়তে প্রিয়ে ॥
নবদ্বীপে চ স কৃষ্ণ আদায় হৃদয়ে স্বয়ম্।
গজেন্দ্রগমনাং রাধাং সদা রময়তে মুদা ॥
ললিতাদ্যাশ্চ যাঃ সখ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শিবে।
সেবন্তে নিজরূপেণ বৃন্দারণ্যে চ তৌ সদা ॥
নবদ্বীপে তু তাঃ সখ্যো ভক্তরূপধরাঃ প্রিয়ে।
একাঙ্গং শ্রীগৌরহরিং সেবন্তে সততং মুদা ॥
য এব রাধিকাকৃষ্ণঃ স এব গৌরবিগ্রহঃ।

যচ্চ বৃন্দাবনং দেবি নবদ্বীপঞ্চ তৎ শুভম্ ॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে ভেদবুদ্ধিশ্চ যো নরঃ।
তথৈব রাধিকাকৃষ্ণে শ্রীগৌরাঙ্গে পরাত্মনি ॥
মচ্ছূলপাতনির্ভিন্নদেহঃ সোঽপি নরাধমঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে নন্দমহারাজের প্রতি গর্গমুনি-বাক্য ঃ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুম্।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

কপিলতন্ত্রে ঃ—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং প্রকটিষ্যতি ॥

কুলার্ণবতন্ত্রে, হরপার্ব্বতী-সংবাদে ঃ—

ততঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোঽপি মহানিধিঃ।
হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি ॥

অনন্তসংহিতায় ঃ—

গৌরী শ্রীরাধিকা দেবী হরিঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
একত্বাচ্চ তয়োঃ সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিদুঃ ॥

সাধনোল্লাসতন্ত্রে ঃ—

শচীসুতচ্ছলাৎ কৃষ্ণঃ কলাববতরিষ্যতি,
যা কালী সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা।
ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ।
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ ॥

কৃষ্ণযামলে ঃ—

গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীসুতঃ ॥

ব্রহ্মযামলে ঃ—

কলৌ পূর্ণানন্দস্ত্রিভুবনবিজয়ী গৌরসুতনু-
র্নবদ্বীপে জাতঃ সুরধুনিসমীপে নরহরিঃ।
দদৎ পাপিভ্যঃ সংস্তুতমতির্হরের্নাম সুকৃতং
তরিত্বা পাপাব্ধিং ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ॥

* * * *

বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং
কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসৎস্বর্ণসংসক্তগণ্ডম্।
কেয়ূরাঙ্গদদিব্যরত্নঘটিতং বাহুদ্বয়ে বিভ্রতং
ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্ব্বং হরেঃ॥

বায়ুপুরাণে ভগবদুক্তি ঃ—

কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠে শুদ্ধসত্ত্বে দ্বিজালয়ে।

জৈমিনিভারতে ঃ—

কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ়ঃ সন্ন্যাসরূপধৃক্।

সৌরপুরাণে ঃ—

সুপূজিতঃ সদা গৌরঃ কৃষ্ণো বা বেদবিদ্ দ্বিজঃ।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে ঃ—

অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে।
তদেবাষ্টদলং পদ্মসন্নিভং পরমদ্ভুতম্॥
তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুর ইতীর্য্যতে।
তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ॥

চৈতন্য-উপনিষদে ঃ—

রহস্যং তে বদিষ্যামি "জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলোকাখ্যে ধাম্নি

গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষঃ মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।”

ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতায় ঃ—

সন্ধৌ কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাদ্দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপো বিভুঃ স্মৃতঃ॥

ব্রহ্মপুরাণে ঃ—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥

পদ্মপুরাণে ঃ—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহসৌ মহীতলে।
ভাগীরথ্যাস্তটে ভূয়ো ভবিষ্যতি সনাতনঃ॥

গরুড়পুরাণে ঃ—

শুদ্ধো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

জৈমিনিভারতে ঃ—

ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যরূপধৃক্॥

শিবপুরাণে ঃ—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ঃ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

নৃসিংহপুরাণে ঃ—

সত্যে দৈত্যকুলাদিনাশসময়ে স্ফূর্জ্জন্নরকেশরী

ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ।
গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ॥

আর একটী চুম্বক প্রমাণ বলি—"যুগ প্রবর্ত্তন বা ধর্ম্মসংস্থাপনাদি ভগবানের অংশ কলা বিলাসাদি অবতার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে ; কিন্তু প্রেম বিতরণ স্বয়ং না হইলে কেহই করিতে পারে না।" তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"সন্ত্যবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥" শাস্ত্র এইরূপ বহু বহু প্রমাণ দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূর্ণতমত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমি আর আপনাকে কয়টী বলিব ? আপনি পণ্ডিত, একটু অনুসন্ধান করিলে আপনি আমা হইতে অনেক বেশী বাহির করিতে পারিবেন।

পণ্ডিত মহাশয় বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিতেছিলেন। যেমন বাবাজী মহাশয়ের কথা শেষ হইল, অমনি হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "বাবা ! আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। কারণ গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় প্রমাণের জন্য আমি কখনও কোন শাস্ত্র অনুসন্ধান করি নাই। লোকমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আপনার মুখে প্রমাণাদি শুনিয়া সুখী হইলাম। এইবার আপনি কৃপা করুন। শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান না করিয়া কোনও বিষয়ের স্থির মীমাংসা করিতে যাওয়া ভ্রম মাত্র॥" ইত্যাদি নানারূপ দৈন্যসূচক বাক্য দ্বারা নিজ দাম্ভিকতা পরিহার পূর্ব্বক পণ্ডিত মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। কাব্যতীর্থ প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় প্রমাণাদি পাইয়া পরম প্রীতি সহকারে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণে পূর্ব্ববৎ প্রণাম পূর্ব্বক নিতাইগৌরাঙ্গচরণে ভক্তি প্রার্থনা করতঃ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

একদিন বেলা অনুমান এগারটার সময় ফরিদপুর-নিবাসী বৃন্দাবন দাদা, বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। বাবাজী

মহাশয় উঁহাকে দেখিবামাত্র গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন— "ভাই! এসেছিস্? আয়, আমি অনেক দিন পরিতৃপ্তির সহিত খাই নাই। আজ তোর হাতে খাইয়া শান্তি লাভ করি।" বৃন্দাবন দাদাও আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে নিকটে গিয়া বসিলেন। বাবাজী মহাশয়ের তাৎকালিক অবস্থা ঠিক বালকের ন্যায়। হয় ত একজন কাপড় পরাইয়া দিয়া গেল। ইনি পরমুহূর্ত্তেই তাহা খুলিয়া কাহাকেও দিয়া দিলেন। কোন সময় বলিলেন, "আমি এখনই স্নান করিব।" আবার পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, "না আমি আজ আর স্নান করিব না।" আহারে ত একেবারেই অনিচ্ছা। প্রসাদ পাইতে বসিলে নানারূপ আব্দার— নানারূপ বায়নাক্কা করিতে থাকেন। আজও বৃন্দাবন-দাদাকে নিকটে পাইয়া বলিলেন— "আমার বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, অতি শীঘ্র মহাপ্রসাদ আন।" আদেশ পাইবামাত্র সেবকগণ মহাপ্রসাদ আনিয়া দিলেন। বৃন্দাবনদাদা হাতে তুলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। অল্প কিছু সেবা করিয়াই বালকের ন্যায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন-দাদা নানারূপ প্রবোধবাক্যে সেবা করাইতে লাগিলেন। কখনও বা একটু মিষ্টি কথা, আবার কখনও বা বেশ কড়া কথা বলিয়া স্তোকবাক্যে ভোজন করাইয়া দিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনদাদা যখন একটু কপট শাসন করেন, তখন ইনি বলেন— "আমি কি তোর শিষ্য যে আজ্ঞা পালন করিব?"

বৃন্দাবন। "শিষ্য বই কি? গুরুর আজ্ঞা পালন না করিলে অপরাধ হইবে যে! অতএব আমি যখন যাহা বলিব তাহাই শুনিতে হইবে।" বাবাজী মহাশয় আর কোনই কথা না বলিয়া নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃন্দাবনদাদা যখনই কোন কথা বলেন, অমনি বাবাজী মহাশয় শশব্যস্তে "গুরুদেবের আজ্ঞা" বলিয়া সেইটী করেন। সেবকগণের মনে বড়ই আনন্দ; কারণ যখন যাহার কিছু কার্য্যের অসুবিধা হইল, অমনি বৃন্দাবনদাদাকে দিয়া সেই সমস্ত কার্য্য সাধন করাইয়া লইতে লাগিলেন। বৃন্দাবনদাদাও অতিশয় প্রীতির সহিত ফরিদপুর হইতে নানাবিধ দ্রব্য

আনাইয়া বাবাজী মহাশয়ের সেবা করিতে লাগিলেন। বাবাজী মহাশয়ের প্রতি বৃন্দাবনদাদার প্রীতি-ভক্তি এবং বৃন্দাবনদাদার প্রতি বাবাজী মহাশয়ের স্নেহ ভালোবাসা দেখিয়া জনৈক ভক্ত রামদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা! এই মহাত্মাটিকে ত আমরা আর কখনও বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে দেখি নাই। ইনি কে? এবং কতদিন হইতেই বা ইঁহার সহিত বাবাজী মহাশয়ের মিলন হইয়াছে? ইঁহার কিঞ্চিৎ বিবরণ শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

রামদাদা। ইঁহার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলা। ইঁহার পূর্ব্ব নাম শ্রীযুক্ত সুধন্যকুমার মিত্র। ইনি বড়ই সদাশয় ব্যক্তি। একরকম আমার প্রবর্ত্তাবস্থার গুরু। বহুদিন পূর্ব্বে আমরা একসঙ্গে শ্রীজগদ্বন্ধু প্রভুর সঙ্গে ছিলাম। কোনও কারণে আমরা উভয়েই সে সঙ্গ ছাড়া হই। ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীযুক্ত প্রেমদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট ভেক গ্রহণ করিয়া খুব কঠোর ভজন করিতেছিলেন। হঠাৎ কি কারণে ইঁহার মাথা গরম হইয়া একেবারে পাগলের অবস্থা হয়। এমন কি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন ১৩০৩ সালে যখন বাবাজী মহাশয় পুরী যাইবার মানসে সদলে কলিকাতায় আসেন, সেই সময় একদিন আমরা কয়েকজন বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে নিমতলাঘাটে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা রাস্তার উপর ইনি শয়ন করিয়া আছেন। শরীর অত্যন্ত খারাপ— এমন কি চেনা যায় না। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন,—"কি রে রামদাস! কিছু খেতে দিবি?" কণ্ঠস্বরে আমার সন্দেহ দূর হইল। আমি বাবাজী মহাশয়ের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে বাবাজী মহাশয় অতি আগ্রহের সহিত উঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিলেন। আমরা নানারূপ কৌশলে উঁহাকে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া গিয়া নানারূপ সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। বাবাজী মহাশয় বলিলেন—"উহাকে পুরী লইয়া গিয়া উড়িয়া মঠের

তোড়ানী, জগন্নাথের চরণামৃত ও কুণ্ডের চরণামৃত খাওয়াইলে এবং নরেন্দ্র সরোবরের পাঁক মাথায় দিতে পারিলেই ভাল হইয়া যাইবে।" কয়েকদিন মাত্র আমরা কলিকাতা থাকিয়া সকলে পুরী রওনা হইলাম। ইঁহার অন্য সমস্ত চঞ্চলতা গিয়া একেবারে জড়ের ন্যায় হইলেন। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা নাই। বসিয়া আছেন ত বসিয়াই আছেন। কেহ জোর করিয়া উঠাইয়া দিলে উঠিলেন। কেহ খাওয়াইয়া দিলে খাইলেন। এইরূপ অবস্থাতে পুরী লইয়া যাওয়া হইল। বাবাজী মহাশয়ের আদেশে পূর্ব্বোক্ত-রূপে শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। একদিন বাবাজী মহাশয় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করতঃ বলিলেন— "আর কোনও ভয় নাই, তোমার পাপতাপ অপরাধাদি যাহা কিছু ছিল বা আছে, সমস্ত আমি গ্রহণ করিলাম। তুমি নির্ম্মলভাবে নিতাইচাঁদের গুণগান করিয়া সাধের মনুষ্যজন্ম সফল কর। প্রাণে প্রাণে শ্রীগুরুদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, দাতাশিরোমণি গুরুদেব অভয়দান করিবেন।" বৃন্দাবনদাদাও ব্যাকুল-প্রাণে রোদন করিতে করিতে বাবাজী মহাশয়ের শ্রীচরণতলে পতিত হইলেন। তখন ইনি উঁহাকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন দানে বলিলেন,—"ভয় নাই, যাও নামকীর্ত্তন কর গিয়া।" বৃন্দাবনদাদা যথাবৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। সেই হইতে কিছুদিন একসঙ্গে থাকিয়া ইঁহার আদেশে ফরিদপুর গিয়া একটী ডাক্তারখানা করিয়াছেন। ডাক্তারখানার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ পরোপকার এবং সাধু-বৈষ্ণব সেবার জন্য ব্যয় করিতেছেন। বৈষ্ণবসেবা বলিতে যে কেবল বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রসাদ সেবা করান তাহা নয়। বৈষ্ণব-দিগের ভজনের আনুকূল্য করা, পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতিতে বিশেষ উদ্যোগী; সুতরাং উঁহার প্রতি বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা, উঁহারও বাবাজী মহাশয়ের চরণে বিশেষ ভক্তি-বিশ্বাস।

ভক্তটী বৃন্দাবনদাদার অবস্থা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিতভাবে বাবাজী মহাশয়ের কৃপার জয় দিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন যায় একদিন কুঞ্জবাবুর মা নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিয়াছেন। বাৎসল্যময়ী মায়ের মনের ভাব কি তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী প্রভুই জানেন। আসিবামাত্রই বাবাজী মহাশয় ঠিক পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঁহার কোলে উঠিলেন। মাও পুত্রকে কোলে লইয়া স্বচ্ছন্দে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া পরে ঠিক শিশু সন্তানের ন্যায় কোলের উপর লইয়া বসিলেন। ইনিও পরম সুখে মায়ের স্তনপান করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্! কারণ কুঞ্জবাবুর মাতাঠাকুরাণী অতি বৃদ্ধা, তাঁহার পক্ষে ইঁহাকে কোলে লইয়া ভ্রমণ করা ত দূরের কথা, একস্থানে বসিয়া ইঁহাকে কোলের উপরে রাখাই অসম্ভব। কিন্তু ভাবের রাজ্যে শ্রীযোগমায়ার কৃপায় অলক্ষিতভাবে অসম্ভবও সম্ভব হইল। মা প্রেমাবিষ্টভাবে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ঠিক বালকের ন্যায় বাবাজী মহাশয়ের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন— "ভাব, স্বভাব এবং স্বরূপ এই ত্রিবিধ শরীর। তন্মধ্যে ভাব এবং স্বভাব যদি স্থায়ী হয় তবে স্বরূপ অন্য-প্রকার থাকিলেও কোনও-রূপ বাধা জন্মে না।" দৃষ্টান্ত দেখাইলেন যেমন— "কোন একটী পুরুষ বসিয়া আছে, হঠাৎ তিনটী যুবতী স্ত্রীলোক তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স এবং বেশভূষা কিংবা রূপ-গুণে তিনটীই একপ্রকার। প্রথমটী দ্রুতগতি গিয়া পুরুষটীর কোলে বসিবামাত্র সে বাৎসল্যরসে ডুবিয়া নানাবিধ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী এতই বিহ্বল হইয়া গিয়াছে যে উহার বস্ত্রাদি স্থানচ্যুত হইলেও সে নির্ব্বিকারভাবে পিতার কোলে অবস্থান করিতেছে। মেয়েটী উক্ত ব্যক্তির প্রথম পক্ষের কন্যা। মেয়েটী কোল হইতে নামিতে না নামিতেই অপর একটী যুবতী আসিয়া কোলে বসিবামাত্র উক্ত ব্যক্তি সখ্যরসে নিমগ্ন হইয়া নানারূপ কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় সেও নির্ব্বিকার ভাবে নিঃসঙ্কোচে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। ইনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির কনিষ্ঠা ভগিনী। এই দুইটী যুবতী স্পর্শে যে পুরুষের মনে বিকারের গন্ধমাত্রও

ছিল না, ঠিক সেই সময় অপর যুবতীটীর দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে বিকারী ও কামে অধীর।" তবেই বুঝা গেল বিকার বা নির্ব্বিকারের সহিত স্বরূপের অতি অল্প সম্বন্ধ; কেবল ভাব লইয়াই যত কিছু ব্যবহার।

একদিন ইনি ক্ষৌর হইতে বসিয়া পরামাণিকের হাত হইতে একখানি ক্ষুর লইয়া বাম পায়ের গোছার উপর একটী চিহ্ন ছিল, উক্ত চিহ্নিত স্থান হইতে অনুমান অর্দ্ধপোয়া মাংস তুলিয়া ফেলিলেন। মাংস তুলিবার সময় দর্শকবৃন্দ অত্যন্ত ব্যাকুল; কিন্তু যাঁহার দেহ তিনি নির্ব্বিকার। এমন-ভাবে মাংস তুলিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয় যেন কোনও কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত মূর্ত্তি হইতে কিয়দংশ কাটিয়া লওয়া হইতেছে। খুব রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া কতকগুলি রজ তুলিয়া ক্ষতস্থানে দিবামাত্র রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। যে কয়দিন ঐ ক্ষতস্থান না শুকাইল, সেই কয়দিন প্রত্যহ মোটা রজ হাতে লইয়া খুব ঘসিয়া দিতে লাগিলেন। আবার খেয়ালমত এক একদিন ক্ষৌর হইবার সময় ক্ষুর দিয়া বেশ চাঁচিয়া দিতে লাগিলেন। সুতরাং ক্ষত স্থান শুকান ত দূরের কথা, নিত্যই নূতন হইতে লাগিল। সঙ্গিগণ একদিন অপরাহ্ণ সময় বসিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! গতকল্য প্রাতে দেখিলাম ঘায়ের একপাশ হইতে মাংস পুরিয়া আসিতেছে, কিন্তু যখন আবার ক্ষৌর হইলেন তখন ক্ষুর দিয়া বেশ চৌরস মত কাঁচা মাংস কাটিয়া ফেলিলেন। সুতরাং আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঘা কাঁচা হইয়া উঠিল। এইরূপ ভাব হইতে লাগিলে ও ঘা কি করিয়া শুকাইবে? কিরূপ বুদ্ধি করা যায় কিছুই ত ঠিক করিতে পারিতেছি না।" ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা হইল, সকলেই বিমনাভাবে কীর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। পরদিবস প্রাতে উঠিয়াই দেখেন ঘা একেবারে শুকাইয়া ঠিক পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। এমন কি একটী চিহ্ন ছাড়া আর যে সে স্থানে কখনও ঘা ছিল এরূপ বুঝা গেল না। সকলে দেখিয়া অবাক্!

এইরূপ নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়ী লীলাখেলায় কয়েকদিন কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে মহাপ্রভুর জন্মতিথি অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দশীর দিন সন্ধ্যার সময় বাবাজী মহাশয় নীলরতনকে আদেশ করিলেন,— "কল্য প্রাতে অষ্ট প্রহর নাম আরম্ভ হইবে, তাহার আয়োজন কর।" ইঁহার আদেশমত সমস্ত যোগাড় হইল। দোলপূর্ণিমার দিন প্রাতঃকাল হইতে নাম আরম্ভ হইল। খুব মাতামাতি কীর্ত্তন— সকলেই বিভোর— কাহারই বাহ্যস্মৃতি নাই। এইরূপে কোথা দিয়া যে দিবারাত্র কাটিয়া গেল, কাহারও খেয়াল নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে উঠিয়াই নীলরতনকে বলিলেন,— "হ্যাঁরে নীলু, এখানে কামিনীধানের চিঁড়া পাওয়া যায় ত ?"

নীল। আজ্ঞে! চেষ্টা করিলে মিলিতে পারে।

বাবাজী। তবে তোমার উপর ভার রহিল।

নীল। আজ্ঞে! কয়টী মালসা ভোগ হইবে ?

বাবাজী। ছয়টীর কম নয়।

নীলরতন সেইভাবে যোগাড় করিতে লাগিল। খুব বড় একখানি অয়েল পেন্টিং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-মূর্ত্তি চিত্রপট ছিল, সঙ্গিগণসহ ঐ চিত্রপট এবং একখানি পীচের লাঠী সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করতঃ গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক চিত্রপটখানি ও পীচের লাঠীগাছটী হাতে করিয়া গঙ্গায় নামিলেন। প্রথম একবার নিজে ডুব দিলেন। তৎপর চিত্রপটখানি ও লাঠীগাছটাকে আকণ্ঠ জলে দাঁড় করাইয়া গামছা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিলেন, চিত্রপটখানি শ্রীহীন এবং বিকলাঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যাঁহারা বাবাজী মহাশয়ের প্রভাব অবগত আছেন, তাঁহারা বলিতেছে—"দেখিবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চিত্রপটখানি

অতিশয় উজ্জ্বল হইবে।" বাস্তবিকই তাহাই হইল। গামছা দ্বারা যতই অঙ্গ সম্মার্জ্জন করিয়া দিতেছেন, ততই যেন মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে চিত্রপট স্নান করাইয়া নিজে স্নান করিতে লাগিলেন। এক একবার ডুব দিয়া অনেকক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতেছেন, আর উঠিয়াই বলিতেছেন, "আজ আমার আরোগ্য স্নান। এইদেহে যে সমস্ত রোগ আগমন করিয়াছিলেন, আজ হইতে সকলে স্থানান্তরে গমন করিলেন।" এইরূপে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত গঙ্গায় জলকেলি করিয়া পূর্ব্ববৎ নাম করিতে করিতে বাগানে প্রবেশ করিলেন। এদিকে নীলরতন মালসা ভোগের জোগাড় করিয়াছিল। ইনি নিজেই আসিয়া মালসা ভোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। সেদিনকার মালসা ভোগের অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ বাহির হইতে লাগিল। যিনিই মালসাভোগের প্রসাদ পাইতেছেন, তিনিই অনুভব করিতেছেন বা বলিতেছেন যে আজ মহাপ্রভু প্রত্যক্ষ ভাবে এই ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ মালসাভোগের এরূপ সুঘ্রাণ আমরা আর কখনও অনুভব করি নাই।

একদিন বেলা প্রায় চারিটা এই সময় পুলিনদাদা এবং তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কানাইলাল মল্লিক, বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কানাইবাবুর শরীর খুবই খারাপ। হাঁপানী কাসির প্রকোপে সুস্থভাবে একস্থানে বসিবার ক্ষমতা নাই। উঁহার কষ্ট দেখিয়া অযাচিত কৃপাকারী প্রভুর হৃদয় দ্রবিল, চোখে জল আসিল, গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"বাবা! তোমার কতদিন হইতে এই রোগ হইয়াছে?"

কানাই। আজ্ঞে! অনেক দিন হইল।

বাবাজী। গলায় এ সমস্ত মাদুলী কিসের জন্য ধারণ করিয়াছ?

কানাই। আজ্ঞে! হাঁপানীর মাদুলী।

বাবাজী। কোনও উপকার পাইয়াছ কি?

কানাই। উপকার বিশেষ হউক আর নাই হউক, অপকার হয় নাই।

আমার বিশ্বাস, মাদুলী না থাকিলে আরও বেশী হইত।

বাবাজী। তোমার রোগ ভাল নিয়াই ত কথা, যদি তুমি বেশ সরলপ্রাণে মাদুলীগুলি এবং হাতের ঐ নীলার আংটীটী এই রাধাকুণ্ডের জলে ফেলাইয়া দিতে পার, আমার বিশ্বাস, তবে নিতাইচাঁদ তোমার সমস্ত রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন।

বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া কানাইবাবু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুলিনদাদা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বলিলেন,— "মামা! মনের দ্বিধা বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের আজ্ঞা পালন করুন, অবশ্যই ফল পাইবেন। মহতের কৃপায় অসাধ্য সাধন হইতে পারে। এ ত সামান্য রোগ!" সে স্থানে অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও কানাইবাবুকে নানারূপ বলিতে লাগিলেন। লজ্জার খাতিরেই হউক, বা অনুরোধেই হউক কানাইবাবু হাতের আংটীটী এবং গলার মাদুলী খুলিয়া আরোপিত রাধাকুণ্ডের জলে ফেলিয়া দিলেন বটে; কিন্তু মনটী বেশ প্রসন্ন রহিল না। যতক্ষণ বাবাজী মহাশয়ের নিকট রহিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বেশ সুস্থই রহিলেন। দুর্দ্দৈববশতঃ সঙ্গ ছাড়িয়া বাড়ী যাইবামাত্র অবিশ্বাস-ব্যাধির প্রকোপে শ্বাসের ক্রিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হইতে লাগিল। অবিশ্বাস-ব্যাধির উপসর্গ অনুতাপ আসিয়া পৌঁছিল। পুলিন-দাদাকে ডাকিয়া বলিলেন— "কৈ আমার রোগের ত কিছুই হইল না। আরও তোমাদের কথায় পড়িয়া আমার কতগুলি টাকার মাল অযথা নষ্ট করিলাম। এখন আমার আংটী ও মাদুলী আনিয়া দাও।" পুলিনদাদা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,— "আপনার বিশ্বাস না হইলে ফল পাইবেন কিরূপে? বিশ্বাসে মিলয় বস্তু তর্কে বহুদূর। সাধু মহাত্মাদিগের উপর ভক্তি বা বিশ্বাস না থাকিলে কখনও কি ফললাভ হইতে পারে? আপনি নিজ হস্তে আংটী ও মাদুলী জলে ফেলিয়া দিলেন; এখন আর সে সমস্ত কোথায় পাওয়া যাইবে?" পুলিনদাদার কথা শুনিয়া যদিও কানাইবাবু

নীরব রহিলেন ; কিন্তু উঁহার মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় সাধু-বৈষ্ণবের প্রতি আর সেরূপ শ্রদ্ধা রহিল না। বাবাজী মহাশয় পুলিন দাদার মুখে কানাইবাবুর কথা শুনিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন— "তাই ত কানাই মামা বড়ই মানসিক দুঃখ পাইতেছে, আচ্ছা নিতাইচাঁদের ইচ্ছা।" বলিয়া অন্যান্য কথা বলিতে লাগিলেন। কাহারও আর সেদিকে খেয়াল নাই। কয়েক দিন পরে ঐ স্থান হইতে কাশীপুর রসিকবাবুর বাগান, সেস্থান হইতে দর্জ্জিপাড়া রায়বাহাদুরের বাগান, কুঠিঘাটা, কুলীনগাঁ, শিউড়ি, কাল্না, শান্তিপুর এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রায় দেড়মাস পরে যখন শ্রীধাম পুরী গমন করেন, সেই সময় হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিবার সময় কয়েকটী মাদুলী এবং একটী নীলার আংটী হাতে করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে পুলিনদাদাকে বলিলেন — "পুলিন! দেখ ত এই আংটী এবং মাদুলী কানাই মামার কি না? তাহার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছে, এইগুলি তাহাকে দিবে।" পুলিনদাদা আংটী ও মাদুলী দেখিয়া বিস্মিত ভাবে বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক নানারূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে বাবাজী মহাশয় পুরী গমন করিলেন। পুলিনদাদা, কানাইবাবুর জিনিষগুলি তাঁহাকে দেওয়ায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন— "বাস্তবিকই আমি বাবাজী মহাশয়কে চিনিতে পারি নাই; কারণ আমি নিজ হাতে পুষ্করিণীর মধ্যে অগাধ জলে আংটী ও মাদুলী ফেলিয়া দিয়াছিলাম। প্রায় দেড় মাস পরে কি করিয়া সেই মাদুলী ও আংটী আবার আমাকে ফেরৎ দিলেন! নিশ্চয় ইনি মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। আমি নিজ বুদ্ধিভ্রমে এবং অবিশ্বাসের জন্য প্রাপ্ত রত্ন হারাইলাম। ধিক্ আমার জীবনে! আমি যে বাবাজী মহাশয়ের নির্ম্মল ভজনের পথে কতই কলঙ্ক আরোপ করিয়া নিতাইএর কাছে অপরাধী হইয়াছি, তাহার আর সীমা নাই।" ইত্যাদি নানারূপ আত্মগ্লানিসূচক বাক্য দ্বারা

কানাইবাবু প্রাণে প্রাণে বাবাজী মহাশয়ের নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

একদিন বেলা সাড়ে তিনটার সময় অতীনদাদার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্রনাথ বসু এবং ভবানীবাবু (ভীম ভবানী বলিয়া বিখ্যাত) ইঁহারা দুইজনে বাবাজী মহাশয়ের দর্শনার্থ আগমন করিলেন। যদিও সে সময় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বহু বহু ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন, তথাপি ইঁহারা দুইজনে দণ্ডবৎ করিবামাত্রই যেন বাবাজী মহাশয়ের ইঁহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ পড়িল। বলিলেন— "এস ত বাবা! দুইজনে আমার হাত দুইখানি টিপিয়া দাও ত।" আদেশ পাইবামাত্র উঁহারা দুইজনে হৃষ্টচিত্তে বাবাজী মহাশয়ের হাত টিপিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম পাছে বাবাজী মহাশয়ের হাতে লাগে এই ভয়ে ভবানীবাবু একটু আস্তে আস্তে টিপিতে লাগিলেন। ইনি বলিলেন— "কৈ বাবা! তোমাকে না লোকে কলির ভীম বলে! তোমার গায়ে জোর কৈ? বেশ জোরে টেপ ত!" এবার ভবানীবাবু সাহস পাইয়া জোরে টিপিতে আরম্ভ করিলেন। ইনি কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত নহেন। পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন— "কৈ জোর কৈ?" প্রায় একঘণ্টাকাল ভবানীবাবু প্রাণপণে জোর দিয়া টিপিতেছেন; কিন্তু ইঁহার সহাস্য বদনে সেই এক বুলি "কৈ জোর কৈ?" অমরবাবু এবং ভবানীবাবু উভয়েই অতি বিস্মিতভাবে এক একবার ইঁহার মুখপানে তাকাইতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন— "কি আশ্চর্য্য! এমন মহাপুরুষ ত আমরা আর কখনও দেখি নাই! এক ঘণ্টা সময় প্রাণপণে টিপিয়া একখানি হাতের কিছুই করিতে পারিলাম না!" হঠাৎ ভবানীবাবুর মুখখানি একটু মলিন দেখিয়া বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি বাবা! তোমার কষ্ট হইতেছে?"

ভবানী। আজ্ঞে! অন্য কোনও কষ্ট নহে, আমার পাছার উপর একটা ফোড়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে উহার দরুণ একটু যন্ত্রণা হইতেছে।

বাবাজী। কতদিন হইয়াছে ?

ভবানী। আজ্ঞে! প্রায় দশ বার দিন হইল।

বাবাজী। কৈ দেখি কোথায় হইয়াছে ?

ভবানীবাবু লজ্জিতভাবে অধোবদনে হাত যোড় করিয়া যেন দেখাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বাবাজী মহাশয় আর কিছু না বলিয়া বলিলেন— "আচ্ছা ঐ রাধাকুণ্ডের জলে বেশ করিয়া ধুইয়া আইস ত!" ভবানীবাবু আদেশানুরূপ কার্য্য করিয়া কিঞ্চিৎ শীতল ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করতঃ ইঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক কলিকাতায় রওনা হইলেন। বাগানের বাহিরে যাইতে না যাইতেই ফোঁড়াটী ফাটিয়া বহু পুঁজ রক্ত নির্গত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হওয়ায় হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিয়া যেমন বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবৎ করা, অমনি ইনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন— "কি রে ভবানী! ফোড়াটা ফাটিয়া গেল। যে শান্তিময় প্রভুর কৃপায় অনায়াসে দুঃসহ ভবযন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়, তাঁহার পক্ষে এ আর কত কথা! নাম কর, পরম শান্তি লাভ করিতে পারিবে। যাও একখানি ন্যাকড়া বাঁধিয়া বাসায় যাও।" ভবানীবাবু পুনরায় ইঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক অমরবাবুকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন।

একদিন বেলা অনুমান চারিটার সময় চন্দননগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার নিয়োগী বাবাজী মহাশয়ের দর্শনে আসিয়া যেমন দণ্ডবৎ করিলেন, অমনি ইনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন— "কি রে বসন্ত! আসিয়াছিস্ ? আয়।" বলিয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী উহার মুখের মধ্যে দিলেন। তিনিও আনন্দে বিভোর হইয়া অঙ্গুলিটী চুষিতে লাগিলেন। প্রায় বিশ মিনিট যায়— হঠাৎ বসন্তদাদা মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অশ্রু-কম্প-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারগণ সমকালীন উঁহার দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। উপস্থিত ভক্তগণ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! বসন্তদাদা একেবারে দেহস্মৃতি-রহিত, মাতালের ন্যায় স্খলিত

ভাষায় যে দুই একটী কথা বলিতেছেন, সেও অসম্বদ্ধ প্রলাপের ন্যায় দুর্ব্বোধ। চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ ও ঢুলু ঢুলু। বাবাজী মহাশয় সঙ্গিগণকে নাম করিতে বলিয়া বসন্তদাদাকে আলিঙ্গনদানে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করতঃ বলিলেন— "নিতাইচাঁদের কৃপাদত্ত বস্তু স্থিরভাবে ভোগ কর। নিজে কৃতার্থ হইবে এবং অপরকেও কৃতার্থ করিতে পারিবে।" বলিয়া উঁহার পীঠের উপর বাম হাতে একটী চাপড় মারিয়া বিদায় দিলেন। বসন্তদাদা বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে প্রেমাবিষ্টভাবে চন্দনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎকালে উঁহাকে যে একবার স্পর্শ করিতেছে সেই প্রেমে বিভোর হইয়া যাইতেছে।

বাবাজী মহাশয় এইরূপে প্রায় মাসাবধিকাল কেদারবাবুর বাগানে অবস্থানপূর্ব্বক নানাবিধ ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য মিশ্রিত লীলাখেলার দ্বারা বহুলোকের হৃদয় সংশোধন এবং আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্থ খণ্ড

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যাইবে

১।	চরিত-সুধা (শ্রীল শ্রীমদ্‌রাধারমণচরণ দাস দেবের জীবনী)	প্রতি খণ্ড— ৫'০০ । একত্রে ছয় খণ্ড— ৩০'০০
২।	চরিত মাধুরী (শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের জীবনী)	১ম খণ্ড— ৫'০০ । ২য় খণ্ড— ৪'০০ । ৩য় খণ্ড— ৮'০০
৩।	শ্রীগুরু-কৃপার দান— ৩য় খণ্ড	২৫'০০
৪।	শ্রীমতীললিতা সখীর জীবনী— ২য় খণ্ড	৩'০০
৫।	লীলাশ্রী	৯'০০
৬।	গৌরাঙ্গ চম্পূ	পূর্ব্বার্দ্ধ— ১০'০০ । শেষার্দ্ধ— ১০'০০
৭।	Life of Love	আবাঁধাই— ২'৫০ । বাঁধাই— ৩'০০
৮।	শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরাঙ্গ	১'০০
৯।	কৃপাকণা	১'০০
১০।	শ্রীধর নাটক	২'০০
১১।	শ্রীগুরু-কথাপ্রসঙ্গ	৬'০০
১২।	শ্রীগুরু-কথাপ্রসঙ্গ— প্রথম ভাগ	১৫'০০
১৩।	শ্রীপাদ বাবাজীমহারাজের স্মরণিকা	১৫'০০
১৪।	সঙ্গীতমাধবম্	৩'০০
১৫।	শ্রীশ্রীহরি ভক্তিবিলাস	পূর্ব্বার্দ্ধ— ৩০'০০ । শেষার্দ্ধ— ৩৫'০০
১৬।	প্রেম সহচরী	১০'০০
১৭।	দ্বাদশ ভাষণ	৮'০০
১৮।	গোপীগীত	১২'০০
১৯।	নাম মহিমা	৫'০০

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

শ্রীব্রজগোপাল দাস। শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম। পোঃ— আলমবাজার
কলিকাতা-৩৫ । ফোন নং— ৫২-২১৩৩

শ্রীকানাই দাসবাবাজী । শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ । সমাজবাটী
পোঃ— নবদ্বীপ । জেলা— নদীয়া

বিঃ দ্রঃ— আংশিক ভিক্ষা না পাঠাইলে গ্রন্থ পাঠান হয় না এবং রিপ্লাই কার্ড না পাঠাইলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।